ব্যাহত সখ্য : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার

বিকাশ চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৭

প্রচ্ছদ : অভিজিৎ নাথ

ISBN 978-81-7522-476-6

প্রকাশক কুমকুম ভট্টাচার্য
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭
মুদ্রক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪৩ ওল্ড যশোর রোড। কলকাতা ১৩২

উৎসর্গ

সোমনাথ রায় ও দাশরথি সেনগুপ্ত
করকমলেষু

মুখবন্ধ

আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পর্কে আমার আগ্রহের জন্ম ১৯৯০-এর দশকে— বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ পত্রবিনিময় পড়ার সূত্রে। তখন ভেবেছিলাম, যদুনাথ সরকারের মতো এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু নানা কারণে সেই বিপুল ও দুরূহ কাজে হাত দিতে সাহস করি নি। বেশ কয়েক বছর পর মনে হল, পূর্ণাঙ্গ জীবনী না হোক, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের চিন্তা জগতের সম্পর্ক নিয়েও তো কিছু লেখা যেতে পারে। কবি ও ঐতিহাসিকের চিন্তার বৈপরীত্য সুবিদিত; কিন্তু সাযুজ্যের ক্ষেত্রটিও তো কিছু অপরিসর নয়। সেই উদ্দেশ্যেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে এই দুই ব্যক্তিত্বের চিন্তার ঐক্য ও অনৈক্য নিয়ে রচিত পাঁচটি প্রবন্ধ এই বইয়ে সংকলিত হল। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ২০০৬ থেকে ২০১০, এবং সংকলিত রচনাগুলির দুটি, "শিক্ষার মাধ্যম ও যদুনাথ সরকার" এবং "ব্যাহত সখ্য : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে 'বাংলা' (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০০৭) ও 'কালপ্রতিমা' (এপ্রিল-জুলাই, ২০০৭) পত্রিকায়।

প্রবন্ধগুলি রচনার সময়ে যাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপক সোমনাথ রায়, অধ্যাপক দাশরথি সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক অভ্র ঘোষ। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগার ও আর্কাইভের কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এঁদের সকলের কাছেই আমি অনুগৃহীত।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ কুমকুম ভট্টাচার্যের আগ্রহে এই বই প্রকাশিত হল। তাঁর জন্য রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিকাশ চক্রবর্তী

দ্বারোন্দা

সূচীপত্র

ব্যাহত সখ্য : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার

১৯২৭-এর ২ জুলাই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : "যখন বয়স হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারি নি। এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই চারজনের নাম [মনে] পড়চে। হঠাৎ এক সময়ে অরবিন্দকে নিয়ে অন্তত বাইরের দিক থেকে জগদীশ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। আমার সে একটা সুদীর্ঘ ও সুগভীর দুঃখের ঘটনা।

তারপরে হঠাৎ এক সময়ে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো, যদুবাবুর কাছ থেকে একটা অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ নিষ্ঠুর চিঠি পাই। সে কথাও আপনি জানেন। সেই অবধি তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে আমি সাহস করি নি। তিনিও সম্ভবত আমার কর্মনীতি ও কর্মরীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।"[১]

বন্ধু-বিচ্ছেদের যে তালিকা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তাতে আরো কয়েকটি নাম আমরা যোগ করতে পারি : দীনেশচন্দ্র সেন, উইলিয়াম রোটেনস্টাইন ও এডোয়ার্ড টমসন। বিচ্ছেদের ধরণ ও কারণগুলি অবশ্য সবক্ষেত্রে এক নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ স্বল্পস্থায়ী এবং সাময়িক মতান্তর বা মনান্তরের পর আবার পুনর্মিলন ঘটেছে সহজেই, যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে সাময়িক বিচ্ছেদ অবসানের পরেও আগেকার বন্ধুত্বের উত্তাপ ফিরে আসে নি, যেমন জগদীশচন্দ্র বসু ও উইলিয়াম রোটেনস্টাইন। কারো কারো ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ আর জোড়া লাগে নি, যদিও সৌজন্যের অভাব ঘটে নি কোনো পক্ষেই— যেমন দীনেশচন্দ্র সেন ও এডোয়ার্ড টমসন। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি যদুনাথ সরকারকে ধরছি না, কারণ তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটি বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এই নিবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমি সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

'বন্ধু' কথাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় শব্দ। তাঁর গানে ও কবিতায় শব্দটির অসংখ্য ব্যবহার লক্ষ করলে সন্দেহ থাকে না যে কথাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু সামাজিক সম্পর্কের দ্যোতক নয়, একটি সহজাত মূল্যবোধও। ১৯১২ সালে তাঁর ঐতিহাসিক বিদেশযাত্রায় লন্ডনের মাটিতে পা দেবার কয়েক মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল— আমি একজন

বন্ধুর দেখা পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন... আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয় ... রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।"[২]

আমরা জানি, উদ্দিষ্ট বন্ধুটির নাম উইলিয়াম রোটেনস্টাইন, লন্ডনে পৌঁছবার পরদিনই যাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করেছিলেন এবং ইংলন্ড ও আমেরিকায় এই বাঙালি কবির খ্যাতিবিস্তারে যাঁর ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়। মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, 'বন্ধু' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উচ্ছ্বাস আসলে একটি সাময়িক প্রতিক্রিয়া— নবলব্ধ উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা। আমরা আরো জানি পরবর্তী আটবছর ধরে উভয় পক্ষই এই স্নেহসিক্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁদের চিঠিপত্রে। ১৯২০-২২-এর সাময়িক মতান্তর ও মনান্তরের পর 'রত্ন হইতে জ্যোতি' অবশ্য আর তেমনভাবে 'আপনি বিচ্ছুরিত' হয় নি।[৩]

এই প্রবন্ধের প্রায় তিরিশবছর আগে— বাইশবছর বয়সে— লেখা ও 'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি ছোটো নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্ব সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক ও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। সেখানে তিনি বলেছিলেন : 'বন্ধুত্ব আটপৌরে, ভালোবাসা পোষাকী। বন্ধুত্বের আটপৌরে কাপড়ে দুই-এক জায়গায় ছেঁড়া থাকিলেও চলে, ঈষৎ ময়লা হইলেও হানি নাই, হাঁটুর নীচে না পৌঁছিলেও পরিতে বারণ নাই। গায়ে দিয়া আরাম পাইলেই হইল... বন্ধু আমাদেরই মত দোষে গুণে জড়িত মর্ত্যের মানুষ হইয়া থাক্ এই আমাদের আবশ্যক ... বন্ধুত্বের উঠিবার নামিবার স্থান আছে। কারণ, সে সমস্ত স্থান আটক করিয়া থাকে না।"[৪]

ছেষট্টিবছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা বলেন, তখন তা সেই 'বন্ধুত্বের উঠিবার নামিবার' বৃত্তান্ত, 'দোষে গুণে জড়িত মর্ত্যের মানুষ'-এর বিবরণ। 'প্রবাসী'র শ্রাবণ ১৩১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে তাঁর যে মতান্তর, তাকে বন্ধু-বিচ্ছেদ বলা সংগত হবে না।[৫] রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "রামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুকাল পর্যন্তই আমার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। অথচ তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ গুরুতর বিষয়ে আমার মতবিরোধ ছিল।"[৬]

জগদীশচন্দ্র বসু ও দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু-বিচ্ছেদের উৎস অবশ্য ব্যক্তিগত। জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন বসুকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রতি অরবিন্দের অতিরিক্ত ভালোবাসা জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসুর ভালো লাগে নি। ১৯১০-এর ১১ এপ্রিল অবলা বসু রবীন্দ্রনাথকে জানান যে 'নির্ধারিত কর্ত্তব্যপথ' থেকে

অরবিন্দমোহন যাতে বিচ্যুত না হন সেজন্য 'এখন হইতে... তাহাকে সর্বদা আমাদের নিকটেই রাখিব।' 'রবিজীবনী'-র লেখক প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন : "... জগদীশ-চন্দ্র ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এত একান্ত অনুভব করতেন যে এক্ষেত্রে তাঁর বেদনা ছিল অনেক বেশি। এর পরেও জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি নানা কর্মসূত্রে জড়িত থেকেছেন, কিন্তু পূর্বের ভারহীন সম্পর্ক আর ফিরে আসে নি।"[৭]

প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গেও। ১৯১০ সালের জুন মাসে দীনেশচন্দ্রের পুত্র, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র, অরুণচন্দ্র, গৃহত্যাগ করে গিরিডিতে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই ঘটনার জন্য দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকেই দায়ী করেছিলেন। ১৯১০-এর ২৯ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লেখেন : "আপনি এতকাল আমার যে নিন্দাবাদ করিয়া আসিয়াছেন তাহা আমি নিরুত্তরে শিরোধার্য করিয়াছি। আজ করজোড়ে আপনার নিকট একটি কথা নিবেদন করিব— আপনি বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং সকল বাঙালীর সহিত যোগ দিয়া আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করিতেই ইচ্ছা করি— আপনি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচার করিতেছেন তাহা সমূলক হইলেও আপনার পক্ষে অশোভন হইত কিন্তু অমূলক কুৎসাবাদের দ্বারা আপনি নিজেকেই লাঞ্ছিত করিতেছেন।"[৮]

দীনেশচন্দ্রও তাঁর আত্মজীবনীতে এই বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে লিখেছেন : "সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল— দীর্ঘকাল তাঁহার [রবীন্দ্রনাথ] সঙ্গে আমার পত্রব্যবহার ও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। কিন্তু কখনও আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই— তাঁহার কৃত রাশি রাশি উপকারের কথা বিস্মৃত হই নাই, তাঁহার অপূর্ব সঙ্গ সুখের লোভ মন হইতে দূর করিয়া ফেলি নাই।"[৯] "সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল" এবং সেই সূত্র আর কখনো জোড়া লাগে নি। প্রাসঙ্গিক ঘটনার এগারো বছর পরেও রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন : "আমার ব্যবহারে যদি ক্ষোভ পাইয়া থাকেন আমাকে ক্ষমা করিবেন। একদা যাঁহাদের সহিত বন্ধুতা ছিল তাঁহাদের হাত হইতে আমি অনেক আঘাত পাইয়াছি কিন্তু আমি কখনই প্রকাশ্যে বা গোপনে সে আঘাত ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করি নাই।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ ও উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের মতান্তর ও মনান্তর শুরু হয়েছিল ১৯২০-২১ সালে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। ২৩ এপ্রিল ১৯২১ থেকে শুরু করে ১৯২২-এর ২০ অক্টোবরের মধ্যে লিখিত উভয়পক্ষের নয়টি চিঠিতে এই সাময়িক বিরুদ্ধতার বিবরণ বিধৃত হয়ে আছে।[১১] ১৯৪০ পর্যন্ত উভয়ের পত্রালাপ অবশ্য কখনও বন্ধ হয় নি, কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ১৯২২-এর পরে বন্ধুত্বের উষ্ণতা ক্রমশই কমে এসেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ কবি ও শিল্পী বন্ধুদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা আজীবন অব্যাহত ছিল, তিনি রোটেনস্টাইন নন, তাঁর নাম টমাস স্টার্জ মুর।[১২]

এডোয়ার্ড টমসন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা বিস্তারিতভাবে আমি অন্যত্র

আলোচনা করেছি।[১৩] ১৯২১ সালে প্রকাশিত টমসনের প্রথম বই *Rabindranath Tagore : His Life and Work* পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হন নি। ১৯২৬-এ টমসনের দ্বিতীয় বই, *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* প্রকাশিত হবার পর এই অপ্রসন্নতা বিরক্তি ও প্রায় অসহিষ্ণুতায় পৌঁছয়। সম্পর্কের ফাটল বড়ো করার ব্যাপারে কতিপয় রবীন্দ্র-ভক্তেরও যে একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রায় একবছর পর, শ্রীবাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছদ্ম নামে রবীন্দ্রনাথ টমসনের দ্বিতীয় বইয়ের একটি তীক্ষ্ণ সমালোচনা লেখেন। রচনাটির শিরোনাম ছিল : "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেন্ড টমসনের বহি", এবং প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়, শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায়। ৭ আগস্ট ১৯২৬ থেকে ২৯ মার্চ ১৯২৮ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে কোনো পত্রালাপ হয় নি। ১৯২৮-এর পরেও, ১৯৩৩ পর্যন্ত টমসন-রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময়ের সংখ্যা মাত্র চার। সন্দেহ নেই, বন্ধুত্বের এই বিচ্ছেদ আর কখনো জোড়া লাগে নি।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মনান্তরের বৃত্তান্ত ঈষৎ জটিল। এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২৫ সালে, নবজাত 'শিক্ষাভবন'-এর অধ্যক্ষের পদ থেকে রামানন্দের পদত্যাগের সূত্রে।[১৫] বছর খানেকের মধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হল 'বসুমতী'তে 'নটীর পূজা' এবং 'বিচিত্রা' ও 'সবুজপত্র'-তে রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ রচনাপ্রকাশকে কেন্দ্র করে রামানন্দের ক্ষোভ।[১৬] মাত্র চার মাস পরে আর একটি নতুন বিতর্কের সূচনা হল। রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণকে ঘিরে 'প্রবাসী' আশ্বিন ১৩৩৩ ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার অক্টোবর ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিকূল সম্পাদকীয় মন্তব্যের উত্তরে কবি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন তাঁর ২৫-২৬ অক্টোবর ১৯২৬ তারিখের চিঠিতে।[১৭] আরও নয় মাস পর, ১ জুলাই ১৯২৭ তারিখে লেখা দুটি চিঠিতে (একই দিনে) রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করলেন যে অশোক চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দের পুত্র) নানাভাবে বিশ্বভারতীর ক্ষতি করবার চেষ্টা করছেন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের সাতটি চিঠি ও ১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে লেখা রামানন্দের নয়টি চিঠি এই মনান্তরের মুদ্রিত সাক্ষ্য।[১৮] এই মনান্তর অবশ্য স্থায়ী হয় নি। ১৯২৭-এর পরে এই সাময়িক বিচ্ছেদ সহজেই অবসিত হয়েছিল।

কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে বন্ধু-বিচ্ছেদের জন্য নিজেকেই দায়ী করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১ জুলাই ১৯২৭-এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : "নিশ্চয়ই অবিবেচনাবশত আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করেচি। সকল সময়ে সব দিক চিন্তা করতে পারি নে এ দোষ আমার আছে। সেইজন্যেই সকল দিকেই আমার সংসারের পথ কন্টকিত।"[১৯] পরের দিনই আবার লিখলেন : "আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্ছে, আমার হৃদ্যতা প্রকাশের প্রাচুর্য্যের অভাব।"[২০] কখনো বা বন্ধু-বিচ্ছেদের মূলে দেখেছেন 'সুপরিচিত' লোকেদের হাত। রামানন্দকেই লেখা ১ জুলাই ১৯২৭-এর আরেকটি চিঠিতে বলেছিলেন : "বার বার দেখেছি যখন পরস্পর বোঝাপড়ার একটা কোনো ব্যাঘাত

ঘটে তখন বাইরে থেকে অত্যুক্তি ও মিথ্যা উক্তি কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে। যখন চিত্তরঞ্জন ও দ্বিজেন্দ্রলাল আমার অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন তখন আমার জবানী এমন সকল কথা আমাদের দুই পক্ষের সুপরিচিত লোকে তাঁদের কাছে রটিয়েছিল যার কোনই মূল্য ছিল না। মিথ্যা জনশ্রুতি আপনাদের কানে যে পৌঁচচ্ছে না তাও বলতে পারি নে।"[২১]

একই সময়ে রামানন্দ নিজেও এ-ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে : "আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, কবি- ঋষিরূপে আপনি অসাধারণ মানবচরিত্রজ্ঞ হইলেও লৌকিক ব্যবহারে আপনি কোন্ কোন্ মানুষকে চিনিতে পারেন না এবং তাহাদের মৎলব বুঝিতে পারেন না; কোনো কোনো স্থানে সকল পক্ষের কথা শুনিয়া জানিয়া একটা মত বা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন না, মনে মনে একতরফা ডিক্রী দেন।"[২২]

কিন্তু প্রায়শই নিজেকে ভেবেছেন অকারণে আক্রান্ত। ১৯২১-এর ১৪ অক্টোবর দীনেশচন্দ্র সেন কে যে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেটি আগেই উদ্ধৃত করেছি। ১৯২৬-এর ২৫ অক্টোবর রামানন্দকে বলেছিলেন : "জীবনে আত্মীয়তার বিকার বন্ধুত্বের বিপর্যয় বিনা কারণেই বার বার ঘটেছে— চুপ করেই সহ্য করেছি। এবারেও প্রতিবাদ করব না..."[২৩] দুবছর পরে রামানন্দকে আবার লিখেছিলেন : "ব্যক্তিগতভাবে যত অন্যায় আঘাত আমি সহ্য করেছি এমন আজকের দিনে আমার দেশের কোনো খ্যাতিমান লোককেই সহ্য করতে হয় নি। আমি কখনো তার প্রতিবাদ করি নি।"[২৪]

কিন্তু চুপ করে সহ্য তিনি কখনই করেন নি। যে-দুটি চিঠির উপান্তে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন, সেই চিঠি দুটিই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর অব্যর্থ শরসন্ধানের প্রমাণ। 'স্তুতি নিন্দার জ্বরে' প্রায়শ কম্পিত রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাঘাতও একটি দর্শনীয় শিল্প— অভ্রান্ত শব্দচয়ন, নিপুন এবং শানিত বাক্যবিন্যাস ও তীক্ষ্ণ পরিশীলিত শ্লেষোক্তির সাহায্যে তাঁর প্রতিপক্ষকে অতি সহজেই তিনি পরাভূত করতে পারেন।

২.

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্য এতই বেশি, তাঁদের স্বভাব ও জীবনচর্যার ব্যবধান এতই দুর্লঙ্ঘ্য যে এই কবি ও ঐতিহাসিকের দুই দশকব্যাপী সখ্যতাই আমাকে অবাক করে, তাদের বিচ্ছেদ নয়। রবীন্দ্রনাথ বলতেই এক রাজকীয় ব্যক্তিত্বের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে— বাকপটু, কৌতুকপ্রিয়, পরিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, জনসভায় অমোঘ আকর্ষণ, অবিরত সৃজনশীল, ঈর্ষণীয়ভাবে সম্ভ্রান্ত ও রুচিশীল, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিচলিত, অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ও আতিথেয়তায় উদার।

যদুনাথ, ঠিক এর বিপরীত৮ বাঙালির কাছে যদুনাথ জনপ্রিয় ছিলেন না— দৈনন্দিন জীবনে প্রায় অসামাজিক, অস্বাভাবিকরূপে স্বল্পবাক, সাধারণ আলাপচারিতায়

পরাঙ্মুখ, অথবা কালক্ষেপের ভয়ে সন্ত্রস্ত, বন্ধু নির্বাচনে অতি সতর্ক, ছাত্র ও গবেষক ছাড়া অতিথি সমাগমে বিরক্ত, নিরত পাঠ-নিবিষ্ট এবং গ্রন্থলোকের বাইরে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে প্রায় নিস্পৃহ। সাহানা দেবী জানিয়েছেন : "হাস্য পরিহাস ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে ভাবাই যায় না। কি সব অদ্ভুত মার্জিত সরস রসিকতা, উপমা, আর সে সব বলার অননুকরণীয় সেই ভঙ্গী— যে সবের সত্যই তুলনা মেলা ভার। স্বচক্ষে না দেখলে বলে বোঝানো যায় না। বোঝবার জিনিসও নয়। তাছাড়া এমনিতেই ওঁর কথাবার্তা ছিল অসম্ভব চিত্তাকর্ষক, যা কিছু বলতেন আলাপ আলোচনা, সবই এমন করে বলতেন আর সে বলা হত এতই সরেশ, এত উচ্চাঙ্গের আর এমনই একটা বৈশিষ্ট্যে ভরা যে, সবের মধ্যে সর্বদাই পাওয়া যেত ওঁর 'জিনিয়াস'এর নানাভাবের পরিচয়, নানা নমুনা। কথায় কথায় অবলীলাক্রমে যে ধরনের কৌতুক, যে ধরনের রসিকতা উনি হরদম করতেন তার অজস্রতা দেখে আর সে সবে ওঁর তৎপরতার অমন 'অনায়াসলীলা' দেখে অবাক না হয়ে পারা যেত না।"[২৫]

পক্ষান্তরে, যদুনাথের ঘনিষ্ঠতম ছাত্র, ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন : "Jadunath, they say, is a misanthrope, a melancholy recluse, who has preferred books to men all through his life. It will be unfair to dismiss this indictment as born of malice, though it might be an ex-parte decree against one who has kept his heart a sealed book with studious effort... his love of men is a closely guarded secret, whereas his love of books borders on a passion..."[২৬] অথবা "Few people, so goes our impression, have ever seen or heard Jadunath in his lighter veins."[২৭]

আরো একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, নীহাররঞ্জন রায়— যিনি যদুনাথকে চিনতেন ১৯২৬ সাল থেকে এবং যদুনাথের জীবনের শেষ বারো-চোদ্দ বছর যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন— যদুনাথ সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্যও এক্ষেত্রে মূল্যবান : "আচার্য যদুনাথের একটি মূর্তি আছে যাঁরা তাকে চিনতেন তাঁদের মানসচক্ষে। সে মূর্তিটি নিয়মে-সংযমে শাসিত বজ্রদৃঢ় একটি পুরুষের, ঋজু, অনমনীয় যাঁর ব্যক্তিত্ব, স্পষ্ট ও বিরলালংকার যাঁর বাক্‌ভঙ্গি, অতি পরিমিত যাঁর ভাষণ, পিউরিটান যাঁর চরিত্র, কঠোর রুটিনাবদ্ধ যাঁর জীবনচর্যা, সুখে যিনি বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা।"[২৮]

দুঃখের কথা এই যে আধুনিক প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালিদের প্রায় কেউই আচার্য যদুনাথ সম্পর্কে উৎসাহী নন। মস্তবড়ো ঐতিহাসিক ছিলেন তিনি— একথা অবশ্য সুবিদিত। কিন্তু কেমন ছিল তাঁর জীবনযাত্রা, তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস, ইতিহাস-চর্চার বাইরে তাঁর চিন্তার জগৎ, তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী— এ-সব বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। অবশ্যই তার প্রধান কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর দীর্ঘ আশিবছরের জীবনের প্রায় প্রত্যেক দিনের বিবরণ মোটামুটিভাবে আমাদের

গোচরে, অসংখ্য রচনার মাধ্যমে তাঁর চিন্তা ও অনুভবের জগৎ, তাঁর অভ্যাস ও স্বভাব, তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী ও আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে বিপুল তথ্য আমাদের করায়ত্তে ও প্রায় ব্যবসায়িক স্তরে চর্চার বিষয়, আচার্য যদুনাথের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটে নি। এক বিশেষ অর্থে তিনি ছিলেন প্রবাসী বাঙালি। কোনো আত্মজীবনী লেখেন নি তিনি। ১৯৪৮-এর ১২ অক্টোবর কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে 'আমার জীবনের তন্ত্র'[২৯] নামে যে রচনাটি পাঠ করেছিলেন তিনি, তাতে নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি। রচনাটি এক ভিকটোরিয়ান পিতার প্রতি তাঁর ভিকটোরিয়ান পুত্রের শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে নিষ্ঠা, সততা ও কঠিন পরিশ্রম বিষয়ে পরামর্শ।

কোনো তথ্যবহুল প্রামাণিক জীবনচরিত এখনো লেখা হয় নি যদুনাথের।[৩০] তাঁর বন্ধু সংখ্যাও ছিল নিদারুণভাবে সীমিত। পাটনায় প্রায় তিন দশক ধরে বাস করেছেন যদুনাথ, অথচ আইনজীবি মথুরানাথ সিংহ ছাড়া আর কারো সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল বলে শোনা যায় না। কলকাতায় অবশ্য তাঁর বন্ধুতা ছিল রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের মুদ্রিত হদিশ বিশেষ পাওয়া যায় না। আর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পত্রবিনিময় শোচনীয়রূপে খণ্ডিত।[৩১] ১৯৫২ সালে যদুনাথ সুশীল রায়কে বলেছিলেন: "দেশীয় বন্ধু আমার অসংখ্য, তাঁদের মধ্যে দুইজনের মাত্র নাম করব, প্রথম গোবিন্দ সখারাম শরদেশাই... দ্বিতীয়, শিভালিয়ার পাণ্ডুরঙ্গ স পিছুলেন্‌কর।"[৩২] কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত যদুনাথ-সংগ্রহে সে সহস্রাধিক চিঠি রয়েছে তার অধিকাংশই কিন্তু শুধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময়। এই সংগ্রহে যদুনাথের চিঠিগুলির প্রায় আদ্যপান্ত জুড়ে রয়েছে শুধু কাজের কথা, গবেষণার পরিকল্পনা, গবেষণা-সূত্রে ভ্রমণের সূচি, দুষ্প্রাপ্য বই ও পাণ্ডুলিপির সন্ধান, বিভিন্ন ঐতিহাসিক অধিবেশনের কর্মসূচি এবং আশু প্রাকাশ্য বইয়ের কথা। কোনো কোনো চিঠিতে অবশ্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও এসেছে, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় এতই কম, যদুনাথ সেখানে এতই মিতভাষী যে মনে হয় ব্যক্তিগত মানুষটিকে প্রকাশ্যে আনতে তিনি সর্বদাই কুণ্ঠিত। যা এই চিঠিগুলিতে পাওয়া যাবে না তা হল রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের ঐশ্বর্য, কল্পনার উল্লাস বা শিল্পের সৌকর্য।

১৯৫১ সালের ১৪ মার্চ যদুনাথ সখারাম সরদেশাইকে লিখেছিলেন : "All my diaries since my college days (1889 onwards) have been preserved, except the one for 1926 which was lost in changing houses..."[৩৩] এখানেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দুস্তর ব্যবধান। হারুনা-না-মারু জাহাজে বসে ১৯২৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগতে চায় না। আগলাতে চায়।" তিনটি অনুচ্ছেদ পর আবার লিখলেন : "আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে

আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।"[৩৪] যদুনাথের ডায়ারির খণ্ডগুলি অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু যদি পাওয়া যেত, তবে সেগুলিতে 'সমস্তই কুড়িয়ে কুড়িয়ে' রাখার চেষ্টা দেখা যেত— এ কথা যেমন সত্যি, 'নিজের স্বাক্ষরে নিজের জীবনের প্রতিবাদ' যে সেগুলি হত না— সে কথাও তেমনি নিশ্চিত।

বিরলবন্ধু হলেও যদুনাথের গুণমুগ্ধ ছাত্র ও অনুরাগীর অভাব ছিল না। কিন্তু এঁদের মধ্যে স্বল্প কয়েকজনই তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন এবং সেই স্বল্প কয়েকজনের— যাঁদের কেউই আর বেঁচে নেই— মুদ্রিত স্মৃতিচারণই ব্যক্তি যদুনাথ সম্পর্কে আমাদের প্রধান অবলম্বন। এঁদের সকলের স্মৃতিচারণ থেকে ভেসে ওঠে এক স্বল্পবাক, গম্ভীর ও অনাড়ম্বর জ্ঞানতাপসের ছবি— যাঁর নিয়মানুবর্তিতা প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল এবং যাঁর জীবনযাপনের সারল্য তাঁর অগণিত ছাত্র, সহকর্মী ও অনুরাগীদের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯১৭-১৮ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনাথের কনিষ্ঠ সহকর্মী ও পরবর্তীকালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন : "Sir Jadunath's well-known simplicity which borders on austerity once drew from me in the early days of our acquaintance the rather pert remark that Aurangzeb was a good subject for study and research, but a bad model for life; the great man frowned on me for a second, and then just smiled."[৩৫]

অনাড়ম্বর যদুনাথের কথা বলেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়ও : "মৃদুভাষী মানুষ তিনি, প্রকৃতি গম্ভীর বলে মনে হয়। কোনোরকম 'পোজ' বা ভঙ্গিধারণের চেষ্টা নেই। চেহারা ও সাজপোষাক এত সাদাসিদা যে, কেউ বুঝতেই পারে না তিনি কত বড়ো পণ্ডিত ও অনন্যসাধারণ মানুষ। জনতার ভিতরে তিনি অনায়াসেই হারিয়ে যেতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করা যায়।"[৩৬] এবং নীহাররঞ্জন রায় : "ঐতিহাসিক যদুনাথ, পণ্ডিত যদুনাথ, মনীষী যদুনাথ কিছুটা দূরের মানুষ যিনি বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্র, ঐতিহাসিক গবেষণায় জ্যেষ্ঠাগ্রজ হিসাবে যিনি নমস্য, যাঁর রচিত গ্রন্থাদি আরো বহু বৎসর অধীত হবে, সযত্নে ও সাগ্রহে। কিন্তু, আর এক যদুনাথ ছিলেন যাঁকে আমি জেনেছিলাম— যিনি চলনে বলনে ছিলেন একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী, যিনি শ্রীমানী মার্কেটে বাজার করে বাজারের থলে হাতে নিয়ে সুকিয়া স্ট্রীট ধরে হেঁটে হেঁটে বাদুড় বাগানের বাড়িতে ফিরতেন— তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য...।"[৩৭] দৈনন্দিন জীবনের এই আশ্চর্য সরলতা সত্ত্বেও যদুনাথ কিন্তু নিজেকে সযত্নে ঘিরে রেখেছিলেন এক দুর্ভেদ্য নিঃসঙ্গতার আবরণে। কালিকারঞ্জন কানুনগোর কথায় : "Jadunath suffers from a sort of lofty loneliness of spirit, which is his own creation."[৩৮]

কিন্তু নিঃসঙ্গতা তো রবীন্দ্রনাথেরও সৃষ্টির উৎস। ১৯২৫-এর ১২ ফেব্রুয়ারি

তাঁর 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি' তে লিখেছিলেন : "জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৩৯] বাক্যটি উদ্ধৃত করে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন— "এক হিসেবে, এতো শিল্পীমাত্রেরই ভাগ্য, ভিতরে ভিতরে এই নির্জন নিঃসঙ্গতা। হয়তো আমরা সব সময়ে মনে রাখি না যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই একলা সাগরে ভাসমান। তাঁর ব্যাপৃত মূর্তি, কাজেকর্মে তাঁর চঞ্চল পরিচয় এতটাই আমাদের চিত্ত অধিকার করে থাকে যে সহসা আমরা দেখতে পাই না ভিড় থেকে তাঁর পালিয়ে যাবার না-নৌকোটিকে, আমরা জানতে পাই না যে এই নির্জন ভেলাটি সব সময়েই চলছে তাঁর রচনাজীবনের গোপনে গোপনে।"[৪০]

যদুনাথের নিঃসঙ্গতার চেহারা কিন্তু আলাদা। সযত্নে এই নিঃসঙ্গতা নির্মাণ করেছিলেন তিনি নিজে, আরোপ করেছিলেন তাঁর জীবনচর্যার ওপর। "As regards his social life", বলেছেন তাঁর অনুগত শিষ্য, কালিকারঞ্জন, "he himself tells us that 'no gentleman twice crossed his threshold when he was engaged in writing the History of Aurangzib.' Though he was held in highest esteem by all, young and old, and saluted from afar, nobody came to his house twice. This is no exaggeration; because what I have seen of him in later years convinced me that a call at Jadunath's in the morning except under engagement was uninviting if not a risk."[৪১]

নীহাররঞ্জন রায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখেছেন যদুনাথের। বলেছেন— "... নিয়মানুবর্তিতায়, সময়নিষ্ঠায়, স্পষ্টভাষণে, চরিত্রের দার্ঢ্যে, ব্যক্তিত্বের গরিমায় [যদুনাথ] 'ছিলেন একান্তই উনিশ শতকীয় ইংরাজ।"[৪২] আর রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে দেখেছেন নানা বৈপরীত্যের মাঝে, 'খ্যাত অখ্যাত/ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিলনের মাঝে'— বলেছেন: "আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না।"[৪৩] একজন গভীর অর্থে দ্বন্দ্বদীর্ণ রোম্যান্টিক, আর অন্যজন নিষ্ঠাবান ভিকটোরিয়ান।

৩.

তবু একটা যোগসূত্র ছিল কোথাও নিশ্চয়ই এবং সেই সূত্র হল সৃষ্টি ও নির্মাণের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক— যাকে আমরা বলতে পারি সৃজনীশক্তির প্লাবন ও অস্থিরতা এবং পরিশ্রমী নির্মাণের সংগতির সম্পর্ক— খুব স্পষ্ট করে না হলেও আমরা লক্ষ করব রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের জীবনব্যাপী যোগাযোগে, এমন-কি দু-একটি সাযুজ্যের ক্ষেত্রেও। এমনই দুটি সাযুজ্যের ক্ষেত্র হল রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের স্বদেশ-ভাবনা ও তাঁদের ইতিহাস চিন্তা। কিন্তু যেহেতু দুটি প্রসঙ্গই বিস্তারিত আলোচনা ও অনুধাবনযোগ্য, তাই বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত করব না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের প্রথম পরিচয় কবে হয়েছিল আমাদের নিশ্চিত করে জানা নেই। অনুমান করা অসংগত হবে না যে, এই পরিচয়ের যোজক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অথবা জগদীশচন্দ্র বসু, খুব সম্ভব ১৯০২-এর কাছাকাছি কোনো সময়ে। যদুনাথ তখন পাটনা কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সদ্য তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছেন। যদুনাথের পিতা, রাজকুমার সরকার অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনতেন এবং যদুনাথ তাঁর বাল্যবয়সে পিতার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছেন।[৪৪] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়েছিল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যদুনাথের আগ্রহের প্রথম নিদর্শন ইডেন হস্টেলের সুহৃদ সমিতির পত্রিকা 'সুহৃদ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, "The New Leaven in Bengal (An Analysis of Babu Rabindranath Tagore's Short Stories)।" প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৩০১ বঙ্গাব্দ [১৮৯৪], যদুনাথ তখন সদ্য এম. এ. পাশ করে তদানীন্তন রিপন কলেজে অধ্যাপনারত।

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের সাক্ষাতের প্রথম মুদ্রিত বিবরণ পাওয়া যায় যদুনাথেরই দুটি রচনায়, "Rabindranath Tagore and Sister Nivedita" এবং "Sister Nivedita as I knew her" শীর্ষক প্রবন্ধে।[৪৫] ১৯০৪ সালের ৮ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে বোধগয়ার উদ্দেশে রওনা হন। ভ্রমণের অন্যান্য সঙ্গীরা ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, আনন্দমোহন বসুর দুই কন্যা, ত্রিপুরার মহারাজকুমার ও তাঁর শিক্ষক, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য।[৪৬] খুব সম্ভব জগদীশচন্দ্রের আমন্ত্রণে পাটনা থেকে এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন যদুনাথ। যদুনাথ তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, বোধগয়ার সন্নিকটে বুদ্ধ-শিষ্যা সুজাতার গ্রাম দেখে ও ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নিবেদিতা যখন আক্ষেপ করছিলেন, যদুনাথ তখন নিবেদিতাকে বলেন : "I do not despair. We had, certainly, reason for despondency, but— *Rabindranath has been the saviour of Bengal.* The poet was walking just behind us and overheard my remark. Then I explained at great length to Sister Nivedita, by extempore translations of Rabindranath's writings, how he had infused a new spirit into Bengali literature and through literature into the hearts of the rising generation of Bengal."[৪৭] রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও আস্থা যদুনাথ আমৃত্যু পোষণ করেছেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্র-রচনা থেকে যে তাৎক্ষণিক তর্জমার কথা যদুনাথ বলেছেন, তার মধ্যে ছিল 'কথা ও কাহিনী'র দুটি গাথার অনুবাদ।[৪৮] দুটি গাথা ছাড়া 'কথা ও কাহিনী' থেকে আর কোনো কবিতার ইংরেজি অনুবাদ অবশ্য যদুনাথ করেন নি; কিন্তু ১৯১০ থেকে ১৯১৩-র মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের তেরোটি প্রবন্ধের ও চারটি ছোটো গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায়।

১৯১৪ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে আর কোনো অনুবাদ পাওয়া যায় নি। ১৯২৭-এ রবীন্দ্রনাথের মালয়, জাভা, বালি ও শ্যাম যাত্রার প্রাক্কালে, 'বৃহত্তর ভারত-পরিষদ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় কবি যে বক্তৃতা দেন (৬ জুলাই ১৯২৭), তার যদুনাথ-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার আগস্ট ১৯২৭ সংখ্যায়।[৪৯] যদুনাথের শেষ অনুবাদ 'কথা ও কাহিনী'র পূর্বোক্ত দুটি কবিতা।

অনুবাদ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলায়। প্রথম প্রবন্ধ '"সোনার তরী"র ব্যাখ্যা' রচিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "কাব্যে অভিব্যক্তি" ('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩১৩)-র উত্তরে এবং প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তেই, অগ্রহায়ণ ১৩১৩ সংখ্যায়। দ্বিতীয় মুদ্রিত রচনা, "দুই রকম কবি— হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" ('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩১৪) প্রসঙ্গে আদিত্য ওহ্‌দেদার জানিয়েছেন: "লেখাটি যদিও ১৩১৪ সালে ছাপা, আসলে কিন্তু এটি রচিত হয় ১৩০৯ সালে। এই তারিখ খেয়াল রেখে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার প্রথম দুই দশকের ফসল লক্ষ্য করে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হেমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে চেয়েছেন... স্পষ্ট করে বলেছেন... রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিস্বিক। তাতে আছে সূক্ষ্মভাবের প্রকাশ ও বিশ্লেষণ। হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যে যে সব ভাব প্রকাশ করেছেন তা অতি সরল ও সনাতন।"[৫০] শেষ প্রবন্ধ "পদ্য আর গদ্য" ('পূজারিণী' কবিতার পাঠভেদ সম্পর্কে আলোচনা) লিখেছিলেন, 'প্রবাসী'র চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যায়। আর ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা তিন। প্রথম দুটি রচনা, "New Leaven in Bengal" (১৮৯৪) ও "Tagore's Ballads" (১৯৩১, দ্র. পাটী ৪৮)-এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। শেষ রচনা, "Rabindranath Tagore : An Analysis" লিখেছিলেন মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৯৫৫-তে।[৫১] এর সঙ্গে যোগ করা দরকার যদুনাথ-কৃত রবীন্দ্রনাথের চারটি বই এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়'-এর পুস্তক সমালোচনা।[৫২]

১৯১০ থেকে ১৯১৯-এই নয় বছরে কবি ও ঐতিহাসিক যতটা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেন আর কখনো তা আসেন নি। এই নয় বছরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন— ব্যস্ততা, উত্তেজনা ও ভক্তজনের স্তুতিবাদে পরিশ্রান্ত, খানিকটা বিভ্রান্তও।[৫৩] ব্যস্ততা ও উত্তেজনা অবশ্য শুরু হয়েছিল কবির ১৯১২ সালে বিলেতযাত্রার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এবং তুঙ্গে উঠল নোবেল পুরস্কার পাবার পর। পুরস্কার ঘোষিত হবার একমাস পরে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন : "I am worn out writing letters, distributing thanks by handfuls and receiving visitors. I cannot tell you how unsuitable this sudden eruption of honour is to a man of my temperament."[৫৪] মাসখানেক পর, ১৩ জানুয়ারি ১৯১৪-তে যদুনাথকে লিখলেন, "সম্মান আমার পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে।"[৫৫] আরো প্রায় দেড় বছর পর খ্যাতিক্লান্ত কবি রোটেনস্টাইনকে লিখলেন, "A spirit of restlessness is upon

me and I have been longing to get away somewhere." তিন মাস পর 'বলাকা'র কবি আবার লিখলেন, "The migratory impulse is in my wings now."[৫৭] একই সময়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখেছিলেন : "...আজ আমার যে ফল ফলাবার দিন তার জন্য বিরলতার দরকার। আমার মন আজ নিজের কাছ থেকে নিজে পালাতে চাচ্ছে— তোমাদের কাছ থেকে নয়।"[৫৮]

যে বিরলতার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলেন কবি, সেই বিরলতাকেই তখন প্রায় অবিশ্বাস্য পরিশ্রমে কাজে লাগাচ্ছিলেন ঐতিহাসিক, ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর ইতিহাস নির্মাণে— পাটনার বাড়িতে স্বেচ্ছানির্বাসনে। কখনো-বা অনাবিস্কৃত দলিল ও পত্রের সন্ধানে মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ পার্বত্যাঞ্চলে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরছিলেন তিনি। আর এইভাবেই সংগৃহীত হয়েছিল ঔরঙ্গজেব ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের পাঁচ হাজারেরও বেশি চিঠিপত্র।[৫৯] যদুনাথের দীর্ঘ গবেষণার ফল *History of Aurangzib*-এর প্রথম দুটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে, তৃতীয় খণ্ড ১৯১৬-তে, চতুর্থ খন্ড ১৯১৯ ও পঞ্চম খন্ড ১৯২৪ সালে। *Shivaji and His Times* প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এর জুলাই মাসে।

গবেষণার কাজে নিমজ্জিত থাকলেও যদুনাথ কিন্তু রবীন্দ্র-সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে থাকেন নি। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার (১৫ ফেব্রুয়ারি) নোট নিয়েছিলেন যদুনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই নোটের ওপর নির্ভর করে খগেন্দ্রনাথ মিত্র যে রচনাটি তৈরি করেন সেটিই "ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা" নামে 'প্রবাসী'র চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এক মাস পরেই ১৯১০-এর মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন যদুনাথ। সম্ভবত শান্তিনিকেতনে এটাই তাঁর প্রথম আগমন। বস্তুত, ১৯১০ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে অন্তত চারবার শান্তিনিকেতনে যদুনাথের উপস্থিতির বিবরণ পাই আমরা— একবার, ১৯১২-র ডিসেম্বরে, কবির অনুপস্থিতিতেই। প্রতিবারই তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। ১৯১২-র ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে তাঁর তৃতীয়বার অবস্থানের সময়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-জীবনীকার) 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প'-এর ভূমিকা লিখে দেন। ১৯১৩-তে যদুনাথের পরামর্শেই মারাঠি ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামকান্ত ছাত্ররূপে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা— বিশেষত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান— যে যদুনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে "The Vernacular Medium : Views of an Old Teacher" নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে।[৬০] একমাস আগেই স্যাডলার কমিশন-প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেবার জন্য যদুনাথের পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৬১] একটি স্বল্পজ্ঞাত তথ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে যদুনাথ লিখেছিলেন: "I once discoursed on the Renaissance to the B.A. students of our college; the language used was English, and on examining their notebooks I found that only two of my pupils— who were upto the Honours standard— had taken down an intelligent and useful summary of my lecture in English. Sometime afterwards, I spoke on the same subject, but in Bengali, to the boys of Rabindranath's school at Bolpur, and though my second audience was very much younger than my first, they wrote excellent connected reports of my discourse, in their mother tongue."[৬২] ১৯১৩-র পর যদুনাথ সম্ভবত আর কখনো শান্তিনিকেতনে আসেন নি।*

রবীন্দ্রনাথও যদুনাথের সঙ্গে তাঁর সখ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ১৯১১ সালে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'অচলায়তন' নাটকের উৎসর্গপত্রে। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন: "প্রবাসীর আশ্বিন (১৩১৮) সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতেই রচনাটি উৎসর্গ করা হয় যদুনাথ সরকারের নামে... কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী বৎসরে 2 August 1912 [শুক্রবার ১৭ শ্রাবণ ১৩১৯] নাটকটি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন উৎসর্গ-পত্রটি মুদ্রিত হয়নি... রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ডে [আষাঢ় ১৩৪৯] ও স্বতন্ত্র সংস্করণে উৎসর্গ-পত্রটি পত্রিকা থেকে উদ্ধার করে সংযোজিত হয়।"[৬৩]

১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন Home University Library ও Cambridge Manuals of Science and Literature-এর আদর্শে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ-এর পরিকল্পনা করছিলেন তখন যদুনাথকেও যুক্ত করেছিলেন এই উদ্যোগের সঙ্গে। 'প্রবাসী'র শ্রাবণ ১৩২৪ সংখ্যায় এই প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে যদুনাথ 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ'-এর সম্ভাব্য লেখকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ, ছয়টি বিষয় বিভাগ এবং ইতিহাস বিভাগের জন্য বিশদ বিষয়সূচি সম্বলিত একটি ভূমিকা প্রকাশ করেন।[৬৪] সম্ভাব্য লেখকদের জন্য মুদ্রিত নির্দেশগুলি থেকে তরুণ গবেষকেরা এখনো কয়েকটা জরুরি সূত্র শিখে নিতে পারেন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা (তিনিই এই পরিকল্পনার প্রস্তাবিত প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কার্য-নির্বাহক ছিলেন) অবশ্য তখন বাস্তবায়িত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পর, ১৯৪৪ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। যদুনাথ তখন জীবিত ও কর্মশীল। কিন্তু এই উদ্যোগের সঙ্গে তিনি আর যুক্ত ছিলেন না।

* এই প্রবন্ধ লেখা হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় আমাকে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯৪৬ সালে যদুনাথ একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং আম্রকুঞ্জে একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় শান্তিপ্রিয় উপস্থিত ছিলেন।

৪.

আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ পত্রবিনিময় শোচনীয়রূপে খণ্ডিত। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত, পুলিনবিহারী সেন সংগ্রহে যে-কটি চিঠি রয়েছে, তার সবগুলিই যদুনাথ স্বয়ং টীকা-সহ ও বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে, প্রকাশ করেছিলেন কবির মৃত্যুর চার বছর পর, 'প্রবাসী'র ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্যায়। ফাল্গুন সংখ্যার শীর্ষক ছিল "রবীন্দ্রনাথ, সি.এফ. এন্ড্রুজ ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পত্রাবলী" এবং চৈত্র সংখ্যার শীর্ষক "অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের পত্র"। মুখ্যত এই মুদ্রিত চিঠিগুলির উপর নির্ভর করেই অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে 'চিঠিপত্র' ১৫ প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। এতে রয়েছে ১৯০৫[৬৫] থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে যদুনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উনিশটি চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, "রবীন্দ্র-যদুনাথ প্রসঙ্গ" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত যদুনাথকে লেখা সি.এফ. অ্যান্ড্রুজের একটি পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের একটি সরকারি অনুরোধ পত্র এবং রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ পত্রপরিচিতি অংশে উদ্ধৃত যদুনাথকে লেখা অ্যান্ড্রুজের একটি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের দুটি— মোট তিনটি চিঠি। এছাড়া রয়েছে যদুনাথ-কৃত রবীন্দ্র-অনুবাদের একটি তালিকা, যেটি যদুনাথ নিজেই প্রকাশ করেছিলেন 'প্রবাসী'র ফাল্গুন (১৩৫২) সংখ্যায়।

আশ্চর্যের কথা এই যে, চারটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের আর কোনো চিঠি রক্ষিত হয় নি রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহে, অথচ চিঠিগুলির প্রাপক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং সেই সূত্রে সেগুলি রবীন্দ্র-ভবনেই থাকার কথা ছিল। আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ২ জুন ১৯২২-এর পর দীর্ঘ পাঁচ বছর উভয়ের মধ্যে কোনো পত্রবিনিময় হয় নি। ১৯২২-এর পরবর্তী চারটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যথাক্রমে ৩০ নভেম্বর ১৯২৭, ১০ জানুয়ারি ১৯৩১, ১১ জুন ১৯৩৩ ও ২৬ এপ্রিল ১৯৩৪ তারিখে। আর যদুনাথের যে চারটি চিঠি 'চিঠিপত্র' ১৫তে মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলির তারিখ হল যথাক্রমে ৩১ মে ১৯২২, ১০ জানুয়ারি ১৯৩১, ৮ জুন ১৯৩৩ ও ২ ভাদ্র ১৩৪৭।

'চিঠিপত্র' ১৫-তে মুদ্রিত রবীন্দ্র-যদুনাথ পত্রাবলী অনুধাবন করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ১৯২১-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত কবি ও ঐতিহাসিকের বন্ধুতায় কোনো ছেদ পড়ে নি। মনান্তর ও তজ্জনিত বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয় ১৯২২ সালে— ৩১ মে ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের চিঠি ও ২ জুন ১৯২২-এ লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরের পর থেকে। ১৯২১-এর ১৬ জুলাই রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের শেষে দেশে ফিরে আসেন। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান রচনা নিয়ে কবি তখন মগ্ন ও ব্যস্ত। আর তখন যদুনাথ কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করছেন। ১৯২১-এর ৭ অগস্ট রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন: "দেশে ফিরে এসে অবধি আপনাকে দেখবার জন্যে একান্তমনে কামনা করেচি। কটকে অপনাকে পত্র লিখতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে আপনার পত্র এবং বই কয়টি পাওয়া

গেল। কবে দেখা হবে? যদি ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে আপনার আসবার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে তাহলে সময় পেলে আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাই।"[৬৬]

সাক্ষাতের জন্য এই ব্যাকুলতার একটি কারণ নিশ্চয়ই ছিল বিশ্বভারতী সম্পর্কে আলোচনা, দ্বিতীয় কারণ, সিলভ্যাঁ লেভির শান্তিনিকেতনে আসন্ন আগমন (লেভি আশ্রমে আসেন ১০ নভেম্বর, ১৯২১)। কাছাকাছি কোনো সময়ে একটি তারিখহীন চিঠিতে অ্যান্ড্রুজ যদুনাথকে লেখেন: "The Poet has asked me to write to you and ask you if it would be possible for you to come to Calcutta towards the end of this week... He has very much that he wishes to talk over with you."[৬৭] এই দুটি চিঠির কোনোটারই যদুনাথ প্রদত্ত উত্তর রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহে নেই।

ছয় মাস পর, ১৯২২-এর ২১ মে, যদুনাথ সরকারকে বিশ্বভারতীর সংসদ (Governing Body)-এর সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দেন রবীন্দ্রনাথ।[৬৮] ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১-এ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন: "ঐ দিন [২৩ ডিসেম্বর] বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত ও বিশ্বভারতী পরিচালনার জন্য সংবিধানের খসড়া পেশ ও গৃহীত হয়।"[৬৯] রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তকুমার মহলানবিশের ১৮ ডিসেম্বর ১৯২১-এর চিঠি অনুধাবন করলে অনুমান করা যেতে পারে যে, বিশ্বভারতী পরিষদের উক্ত সভায় নির্মীয়মান সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং সেই খসড়ায় সংসদের সদস্য হিসেবে যদুনাথের নামও প্রস্তাবিত হয় তাঁর সম্মতি ছাড়াই।[৭০] পূর্ণাঙ্গ সংবিধান ছাপা হয়েছিল খুব সম্ভব ১৯২২-এর মে মাসে এবং ১৬ মে মুদ্রিত সংবিধানটি রেজিস্ট্রি করা হয়। মুদ্রিত সংবিধানেও সংসদের সদস্য হিসেবে যদুনাথ তালিকাভুক্ত ছিলেন।[৭১]

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যদুনাথ ৩১ মে ১৯২২-এ যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন ও ২ জুন ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথের উত্তর— এই দুটি চিঠি নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি চিঠিরই মূল পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহে রক্ষিত রয়েছে। যদুনাথের স্বহস্তে লিখিত ষোলো পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ চিঠির ও রবীন্দ্রনাথের ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রের তাত্ত্বিক পটভূমি এতই বিস্তৃত যে তার যথাযোগ্য আলোচনা করার অবকাশ বক্ষ্যমান প্রবন্ধে নেই। এই প্রসঙ্গে আমি শুধু কয়েকটি কথা বলতে চাই।

বিশ্বভারতী সংসদের সদস্যপদ প্রত্যাখানের দুটি কারণ দেখিয়েছিলেন যদুনাথ। প্রথমত, "আমি এখন দূরে থাকি, এবং আর কয়েক বৎসর পরে পেন্সন লইয়া নিম্ন বঙ্গে বাস না করিবার ইচ্ছা। সুতরাং শান্তিনিকেতনের কার্যের তত্ত্বাবধান করা, নূতন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব... যেখানে কাজ করিতে পারিব না, সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা অমি নিজের পক্ষে লজ্জাকর ব্যবহার এবং ঐ সংস্থানের প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করি।"[৭২] দ্বিতীয় কারণটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদুনাথ লিখেছিলেন: "পূর্বের যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি

তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রদের দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত হইয়া, পরে তাহারা মামুলী কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্ক সংসারের উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত ... কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি বৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই (১) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং উচ্চ প্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা intellectual discipline and exact knowledge, পূর্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমন্ডলী এবং (৩) শিক্ষায় পরিপক্ক চরিত্রবান একনিষ্ঠ নেতা একজন।"[৭৩]

শান্তিনিকেতনে যদুনাথ দেখেছিলেন গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব: "বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাইস্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ পন্ডিত ও মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে ৩য় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগ) বেশ কার্যকর হইবে— যদি ছাত্র আসে। কিন্তু ২য় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের ৪টি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই।"[৭৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যদুনাথের এই চিঠির তিনবছর পরে বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫-এর জুলাই মাসে। এ ছাড়াও যদুনাথের মনে হয়েছিল— "... বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge কে, intellectual discipline কে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্কমস্তিষ্ক 'বিশ্বমানবের শত্রু', মেকি পন্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে।"[৭৫] হয়তো কোনো প্রমাণও পেয়েছিলেন যদুনাথ; তাঁর উক্তি শুধু অনুমান-নির্ভর বলে মনে হয় না।

যদুনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২ জুন ১৯২২-এর চিঠিকে অবশ্য যদুনাথের পত্রের উত্তর বলা যায় না। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে নিজেকে ভাবছেন আক্রান্ত, যদুনাথের সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মতিকে ভেবেছেন তাঁর প্রতি বিরুদ্ধতা: "আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে কোনো কারণে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সেজন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়াছি এবং সেইজন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সংকোচ বোধ করিয়াছিলাম।"[৭৬] পত্রের শেষাংশে লিখেছেন: "আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত ও বিস্মিত চিত্তে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। আপনার মনে আমি ক্ষোভের কোন্ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার এরূপ বিরুদ্ধতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না।"[৭৭] আর শেষ অনুচ্ছেদে লিখলেন: "আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন... কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব।"[৭৮]

একই তারিখে (২ জুন ১৯২২) রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশকে লিখলেন:

"যদুনাথ সরকার মহাশয়ের একখানি দীর্ঘ পত্র পেয়েছি। তার সারমর্ম এই যে তিনি বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করতে অসম্মত। সমস্ত চিঠিটা দেখলে বুঝতে পারতে একটা প্রবল প্রতিকূলতা এর মধ্যে আছে। অথচ যদুবাবুকে চিরদিনই অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে এসেছি এবং এখনো করি। আমি কিছুই বুঝতে পারিনে— আমার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য আমার সুহৃদরা আমার বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ান ... যদুবাবুর মধ্যে খুব একটি সত্য আছে— তিনি আমাকে অনাদর করলেও আমি তাঁকে করতে পারিনে— সেইজন্যই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়ে আমি এমন ব্যথা বোধ করছি। যাই হোক, ওঁর নামটা কেটে দিতে হবে।"[৭৯]

যদুনাথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে 'অনাদর' কখনো করেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন: "আমার ব্যক্তিগত প্রভাবকেই হয়ত আপনি দোষ দিতে চান"— তখন সেই উক্তিটি যদুনাথের ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নয়। মনোযোগ সহকারে পড়লে আমরা লক্ষ করব যে যদুনাথের দীর্ঘ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা কোথাও প্রকাশ পায় নি। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের মননশীলতাকে বোলপুরের 'বায়ু' থেকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন: "আপনি যখন পদ্যে ধর্মব্যাখ্যানে বা গল্পে বেদান্তের নির্যাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। আমি তাহা পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লই। কারণ আপনার যুক্তি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট, ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়; আর আমি জানি যে আপনি নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তবে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন।" আর এই চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন: "...দেড়শত বৎসর ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে বঙ্গমাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন। আর দুইশত বৎসরেও তাঁহার দ্বিতীয় আসিবেন না, আমার বিশ্বাস।"[৮০]

বস্তুত, যদুনাথের দীর্ঘ পত্রের পেছনে স্পষ্টতই এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরের পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা। আরো লক্ষণীয় যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা দুটি কোনো ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক প্রতিক্রিয়া নয়— এদের পশ্চাদপটে রয়েছে ভিক্টোরিয় ইংলন্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিতর্কের দীর্ঘ অর্ধশতকের ইতিহাস। আগেই বলেছি সেই ইতিহাস আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে "শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা।"[৮১] আর যদুনাথের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ, হেনরি নিউম্যানের মতো, বিদ্যার বিতরণ।[৮২]

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁর চিঠিতে (২ জুন ১৯২২) বিশ্বভারতীর সদস্যপদ থেকে যদুনাথের নাম 'প্রত্যাহরণ' করে নেওয়ার কথা লিখেছিলেন ও প্রশান্তচন্দ্রকেও একই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবু পরবর্তী সাত মাসের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় নি। ২ জুলাই ১৯২২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে

আবার লিখলেন: "রামানন্দবাবুকে কি যদুবাবুর চিঠি ও আমার উত্তরটা দেখিয়েচ? যদুবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কি?"[৮৩] বিশ্বভারতী সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালের ২৩ জুলাই এবং চতুর্থ অধিবেশন ১৮ নভেম্বর ১৯২২ তারিখে। উভয় অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং উভয় অধিবেশনের প্রতিবেদনেই সদস্য হিসেবে যদুনাথের নাম পাওয়া যায়। যদুনাথের পদত্যাগ গৃহীত হয়েছিল ১৯২৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী সংসদের প্রথম অধিবেশনে।[৮৪]

জুন ১৯২২ থেকে নভেম্বর ১৯২৭-এর মধ্যে কবি ও ঐতিহাসিকের কোনো পত্রালাপ পাওয়া যায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ-প্রসঙ্গ থেকে দূরে থাকেন নি। ১৯২৬-এর ১৫ অক্টোবর তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যদুনাথের ৩১ মে ১৯২২-এর চিঠির কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৮৫] ১৯২৭-এর ২ জুলাই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেই চিঠিতে যদুনাথের 'অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ নিষ্ঠুর চিঠি'র কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সেই অবধি তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে আমি সাহস করি নি।" এই চিঠির চারদিন পর 'দ্বীপময়-ভারত' যাত্রা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ' যে সভা আহ্বান করেছিলেন, তাতে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য, যদুনাথ সরকার। ৬ জুলাই ১৯২৭-এর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে: "শ্রীযুত যদুনাথ সরকার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন, আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে অদ্য এই স্থানে ভারতের মহান সভ্যতার রাজদূত ও এশিয়ার মর্মবাণী প্রচারককে আশীর্বাদ করিবার জন্য প্রাচীন ভারতের ঋষি ও জ্ঞানীগণের অশরীরী আত্মা আমাদের সাথে রহিয়াছেন। প্রাচীন ভারত সুদূর প্রাচ্যে ঐক্য ও মানবতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বাণীকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বর্তমান জগতে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছেন? প্রাচীন দেশের ঋষিদের যদি কোনো প্রাণবান বংশধর আজিও বাঁচিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ..."[৮৬]

চার মাস পর, দীর্ঘ পাঁচ বছরের নীরবতা ভঙ্গ করে, ৩০ নভেম্বর ১৯২৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রুশদেশীয় পণ্ডিত এল.বগদানফের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি ভাষার অধ্যাপক পদের জন্য উপাচার্য যদুনাথকে একটি অনুরোধপত্র লেখেন।[৮৭] ঘটনাটি কৌতুকাবহ। বগদানফ ১৯২৩ সালে ফার্সি, ফরাসি ও ইসলামি বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর অদ্ভুত জীবনযাত্রার জন্য মানুষটি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রশান্তচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে-ছিলেন: "বগ্‌দানভ্‌কে স্থায়ীভাবে রাখতে আমার মত নেই।"[৮৮] ১৯৩০ সালে এই অতিথি অধ্যাপককে বিশ্বভারতী থেকে কর্মচ্যুত করা হয়।

৫.

২ জুন ১৯২২-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন: "আপনি বলিয়াছেন, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge ঘৃণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ জ্ঞানের শিক্ষক ও সাধকগণকে 'হৃদয়হীন, শুষ্কমস্তিষ্ক, বিশ্বমানবের শত্রু' বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয়... কিন্তু এ কথার আপনি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?"[৮৯] ছ' বছর পর, রবীন্দ্রনাথ নিজের সাক্ষেই তার প্রমাণ দিলেন— এবং অকাতরে — ৭ অক্টোবর ১৯২৮ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে। চিঠিটির প্রায় আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে যদুনাথ প্রসঙ্গ এবং কারো সম্পর্কে এরকম অকুণ্ঠ শ্লেষ ও নিন্দাবাদ সম্বলিত কোনো চিঠি অন্য আর-একজনকে রবীন্দ্রনাথ কখনো লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। চিঠিটি শুরু হয় এইভাবে: "যদুনাথ সরকার মহাশয় মৃত যুগের কাহিনী নিয়ে কারবার করেন— টুকরো খবর জোড়াতাড়া দেওয়াই তাঁর অভ্যস্ত। তিনি পণ্ডিত, সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করে তাতেই তিনি তৃপ্তি পান— মরা জিনিষ দিয়ে এমন করে ম্যুজিয়ম সাজানো চলে... তিনি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অবধি চিরকাল ছেলে-পড়ানো ব্যবসাতেই এতকাল কাটিয়েছেন। অর্থাৎ বাঁধা নিয়মের পুনরাবৃত্তি করেছেন ও উপরওয়ালাদের হুকুম মেনে চলেছেন। সেইজন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি মৃত পদার্থের মতোই ব্যবহার করেছেন: নিজের চিত্ত থেকে তাকে কিছুই দিতে পারেন নি, বরঞ্চ তার ক্ষয় সাধন করেছেন।"[৯০] এর পরেই হঠাৎ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন: "আশু মুখুজ্জে মশায়ের মনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব রূপ ছিল— বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তিনি পণ্ডিতী করেন নি, সৃষ্টিকর্তারূপে তার অন্তরের থেকে তার প্রাণশক্তিকে নব নব বিকাশের মধ্যে উদ্ভাসিত করতে প্রবৃত্ত ছিলেন... পাণ্ডিত্যাভিমানীর জড় হস্তে প্রাণের অবমাননা এবং হুকুমের তামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গর্হিত... সৌভাগ্যক্রমে মুখুজ্জে মশায় কেবলমাত্র পণ্ডিত ছিলেন না, নির্ভীক চিত্তশক্তির বলে পুরাতনের মধ্যে নতুনের উদ্বোধন করতে পারতেন... পণ্ডিত সরকার মশায় শাস্ত্র মিলিয়ে এবং সর্বদা উপরওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতার কাজ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কোনো কূলই রক্ষা করতে পারেন নি।"[৯১]

এই চিঠিতে শ্লেষার্থে 'পন্ডিত', 'পান্ডিত্য' শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন অন্তত দশবার। যদুনাথের পান্ডিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিহাস নিঃশব্দে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু উপাচার্য হিসেবে আশুতোষের সঙ্গে যদুনাথের প্রতি- তুলনা আমাদের কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের তর্কাতীত অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন। আর যদুনাথ উপাচার্য পদে যোগ দেন ২৪ আগস্ট ১৯২৬, তাঁর কার্যকাল ছিল মাত্র দুবছর। ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে তিনি অবসর নেন; দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি আর এই দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হন নি। সেই দুবছরও যে যদুনাথকে আশুতোষ-অনুগামীদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যে

কাজ করতে হয়েছে, সে-কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। এই চিঠির এক বছর আগে তিনি নিজেই যদুনাথকে লিখেছিলেন: "আপনি নানা উপদ্রবের মধ্যে আছেন শুনেচি— নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারবেন..."[৯২] মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে যদুনাথ যোগেশচন্দ্র বাগলকে বলেছিলেন: "আমি দুবছর ভাইসচ্যান্সেলার ছিলাম। এডমিনিস্ট্রেশানের দিকে কিছু কিছু সংস্কার করতে পেরেছি। শিক্ষার সংস্কার কিছুই করতে পারি নি। তখন আমার কাজে খুব বাধা পেয়েছি।"[৯৩]

এই প্রতিকূলতার কথা সবিস্তারে লিখেছেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর আত্মজীবনীতে এবং সুকুমার সেন তাঁর স্মৃতি চারণে।[৯৪] সেই সময়কার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র দিলীপকুমার সান্যালের সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "বস্তুত উপাচার্য পদে বৃত থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দল তাঁহার [যদুনাথের] সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহা এক ধরনের বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব। কাহারও মন যোগাইবার জন্য স্বধর্ম-ভ্রষ্ট হওয়া যদুনাথের কোষ্ঠীতে ছিল না। যদুনাথ খদ্দর পরিতেন না, গলাবাজি করিয়া ইংরাজকে গালাগালিও দিতেন না... এমন অনেকে তাঁহাকে সরকারের খয়ের খাঁ বলিয়াছে যাহারা খয়ের খাঁ-গিরি করিয়াই নিজেদের জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করে।"[৯৫] রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে যদুনাথ-বিদ্বেষ যেমন আমাদের বিভ্রান্ত করে, তাঁর আশুতোষ-প্রীতিও তেমনি অস্বস্তিকর মনে হয়— বিশেষত যখন আমরা জানতে পারি যে, ১৯১৭ সালের ৯ অক্টোবর আশুতোষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিল্পী মুকুল দে-কে বলেছিলেন: "ও বাঘের ভিতরে অনেক মিথ্যে আছে রে। একবার গানের জন্য চেষ্টা হয়েছিল, ওরা তা ফাঁসিয়ে দিলে। ও মুখেই বলেছে। মনে বলেনি।"[৯৬] আর ১৯২২-এ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে বলেছিলেন: "যদুবাবুর মধ্যে খুব একটি সত্য আছে—"[৯৭]

রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ পত্রাবলির (চিঠিপত্র ১২) সম্পাদক জানিয়েছেন যে, ১৯২৮-এর মার্চ মাসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনাথের Sir William Mayer স্মারক বক্তৃতার একটি বিশেষ মন্তব্যই উক্ত চিঠিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উষ্মার উপস্থিত কারণ।[৯৮] যদুনাথের উপরোক্ত বক্তৃতা ১৯২৮ সালেই *India Through the Ages* নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের উল্লেখ সম্পাদক করেছেন, সেটি এইরকম: "The latest form of the Hindu revival we owe to Rabindranath Tagore. It is a very close but unconscious copy of the movement which began in Russia in the 19th century, the very language of the Slavonic leaders being repeated by the Indian poet... This latest form of Indian thought is based entirely on a new interpretation of our ancient Upanishads under the unconscious influence of Christianity."[৯৯]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উক্ত চিঠিতে বলেছিলেন: "পণ্ডিত সরকার মশায় বলেন, আত্ম-অগোচর অনুকরণের পথ বেয়ে আমি কিছু উপনিষদ কিছু খৃস্টানী মিলিয়ে একটা

জোড়াতাড়া বিদ্যায়তন তৈরি করেছি। আমি যা করেছি তা বর্তমান যুগেই আছে, আওরঙ্গজেবের যুগে নয়..."[১০০] কিন্তু যদুনাথের মন্তব্যে কোথাও রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের উল্লেখ নেই, তাঁর প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'অনুষ্ঠিত কর্ম' নয়, আধুনিক ভারতীয় মানসের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননের জগৎ। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন নি যে যদুনাথের উপরোক্ত মন্তব্যের পরের পংক্তিগুলি হল: "It is incorrect to call it a Hindu revival. It is really a cosmopolitan movement which aims at bringing all humanity together, and hence the Eastern poet's appeal has found a response in some of the noblest hearts of the west."[১০১]

ধরেই নেওয়া যায় যে, রামানন্দ এই চিঠির কথা যদুনাথকে জানান নি। তিন দিন পর রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখলেন: "সেদিন যদুবাবুর সমালোচনা সম্বন্ধে আপনাকে একটা দীর্ঘ পত্র লিখেছি। সেটা কি পান নি? আপনার আজকের পত্রে তার উল্লেখ নেই কেন ঠিক বুঝতে পারলুম না।"[১০২] ঠিক পরদিন, ১১ অক্টোবর, আবার লিখলেন: "সেদিন যদুবাবুর সম্বন্ধে চিঠিখানা লেখার পরেই মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। আমার শরীর ক্লান্ত এবং মন নানা প্রকার দুর্যোগে এত অত্যন্ত উত্তেজিত যে এই ব্যথিত অবস্থায় ছোটো আঘাতও বড়ো হয়ে ওঠে— এখন শান্তভাবে বিচার করা কঠিন। কিন্তু মনের মধ্যে নিয়তই এই কথাটা জেগেছিল যে ঐ চিঠি আমার যোগ্য হয়নি। আপনি ওটা ছাপতে চান না শুনে আমি আরাম বোধ করলুম।"[১০৩]

'চিঠিটি তাঁর যোগ্য হয় নি'— মনে করলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই চিঠির একটি প্রতিলিপি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। মাস তিনেক পর প্রশান্তচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখলেন: "অপূর্বের (অপূর্ব চন্দ) সঙ্গে দেখা হলে বলো, যদু সরকার সম্বন্ধে আমার চিঠির কপিটা যেন নিশ্চয় ফিরিয়ে দেয়— সেটা এখান থেকে নিয়ে গেছে— কিন্তু সেটা এখানেই থাকা চাই।"[১০৪]

১৯২৮-এর পর রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের পত্রবিনিময়ের সংখ্যা মাত্র ছয়। চিঠিগুলি একেবারেই বিশেষত্বহীন, একান্তই সৌজন্যমূলক এবং রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ সম্পর্কের খতিয়ানের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ চিঠি লিখেছিলেন ১৯৩৪-এর ২৬ এপ্রিল— প্রসঙ্গ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্র সম্পর্কে সম্মতি জ্ঞাপন। আর যদুনাথ তাঁর শেষ চিঠি লেখেন ১৯৪০-এর আগস্ট মাসে— হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ চেয়ে।

৬.

ইতিমধ্যে 'কথা ও কাহিনী'র দুটি গাথার ইংরেজি অনুবাদ সম্বলিত নিবন্ধ "Tagore's Ballads" প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩১ সালে। এই রচনাটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আর রবীন্দ্রনাথের ৭০বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপনের বিপুল আয়োজনের সূত্রপাতও এই সময়ে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সপ্তাহ-ব্যাপী

জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয়েছিল ৮ মে ১৯৩১-এর আনন্দবাজার পত্রিকায়, তাতে যদুনাথ সরকারের নাম থাকলেও, এই সূত্রে গঠিত পরবর্তী কোনো সমিতি বা উপ-সমিতিতে যদুনাথের নাম পাওয়া যায় না।[১০৫] ৮ মে তারিখেই কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে যে অধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই সভায় জয়ন্তী-উৎসব পালনের জন্য জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতি করে তিরানব্বই জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। যদুনাথের নাম সেই তালিকায় ছিল না।[১০৬] যদুনাথ অবশ্য পাটনায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখে রামমোহন রায় সেমিনারি হলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "কবি মানুষের মনকে সমস্ত প্রকারে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন সফল হয় নাই, এবং তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জন্য সংকীর্ণ জাতি প্রেম নহে, পরন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্বই তাঁহার লক্ষ্য।"[১০৭]

এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *The Golden Book of Tagore*-এ[১০৮] যদুনাথের কোনো লেখা স্থান পায় নি। এই বিপুল গ্রন্থে আঠাশজন বাঙালি বিদ্বজ্জনের রচনা সংকলিত হয়েছে— প্রবীণতম বিপিনচন্দ্র পাল থেকে কনিষ্ঠতম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত। অথচ যদুনাথ অনুপস্থিত। ঘটনাটি কৌতূহলোদ্দীপক, রবীন্দ্র-ভবন সংগ্রহে (The Golden Book of Tagore File) আমি যদুনাথের এই বিস্ময়কর অনুপস্থিতির কোনো কারণ খুঁজে পাই নি।[১০৮] ১৯৩১-এর ২৪ নভেম্বর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যদুনাথকে লিখেছিলেন : "রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে বহি প্রকাশিত হইবে, তাহার জন্য আপনার একটি লেখা পাইবার নিমিত্ত চিঠি আপনার নিকট পৌঁছিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু খামের উপর আপনার নাম ও ঠিকানা আমি বহুপূর্বে লিখিয়া দিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। কালিদাস আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বিলম্বে, সেক্রেটারির কাজের ভার লইয়াছে। তাহাকেও আমি আপনাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছিলাম। স্বাস্থ্যভঙ্গবশত আমি স্বয়ং তাগিদ দিতে পারি নাই। প্রথম চিঠির মুসাবিদা ও স্বাক্ষর আমার নিজের। আপনার একটি লেখা না পাইলে বহিখানি অঙ্গহীন থাকিবে। অধিকন্তু সর্বসাধারণ আমাকে দোষী করিবে। অতএব আপনি যদি একটি ছোটো ইংরেজী লেখা Golden Book of Tagore-এর জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে অনুগৃহীত ও উপকৃত হই।" উল্লেখ্য যে *Golden Book of Tagore* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১-এর ডিসেম্বর মাসে, আর রামানন্দ যদুনাথকে এই চিঠি লিখেছেন ২৪ নভেম্বর, ১৯৩১-এ। বারোদিন পর, রামানন্দ ১৯৩১-এর ৬ ডিসেম্বর তারিখে যদুনাথকে আবার লিখলেন: "আমাকে জানাইবার জন্য ব্রজেন্দ্রবাবুকে [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়াছি। আপনার বিবেচনায় সন্তোষজনক না হইলেও অন্তত একটি প্যারাগ্রাফ আপনি পাঠাইয়া দিলে

বাধিত হইব। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি পাটনার রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে ১৬ই যাহা পড়িবেন, তাহা ভালোই হইবে। তাহারই একটি... দরকার হইলে গোড়া ও শেষের দিকে প্রবন্ধের মতো করিয়া দিয়া কালিদাসকে কিংবা আমাকে সত্বর পাঠাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। বহিখানির গোড়ার কয়েক ফর্মা ... ছাপা হইবার কথা। আমাদিগকেও প্রেস অতঃপর তাড়া দিবে।"[১০৯] স্পষ্টতই রামানন্দের এই বহু বিলম্বিত অনুরোধ যদুনাথের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

১৯৩৪-এর পর রবীন্দ্রনাথ আর কখনো ফিরে আসেন নি যদুনাথ প্রসঙ্গে। কিন্তু যদুনাথ আবার ফিরে এলেন রবীন্দ্র প্রসঙ্গে ৮ মে ১৯৪১-এ। কবির আশিতম জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে যদুনাথ তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: "রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার গৌরবের জিনিষ শুধু নন, পরম সৌভাগ্যের বস্তুও বটে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছিলেন শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত কর্মযজ্ঞের— যেখানে অবিরত সৃষ্টিশীল কবি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন নির্মাণকার্যে, 'সরকারী সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া' গ্রাম উন্নয়নের কাজে।[১১০] ৯ মে (১৯৪১) কলকাতা আর্ট সোসাইটি আয়োজিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানেও পৌরোহিত্য করেছিলেন যদুনাথ; সেখানেও তিনি স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়, জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা: "শুধু সাহিত্যই নয়, জাতীয় জীবনের প্রত্যেক দিকই রবীন্দ্র-প্রতিভা স্পর্শে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে।"[১১১]

চার মাস পর, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আয়োজিত স্মরণ সভায় অন্য অনেকের সঙ্গে যদুনাথও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সেই শ্রদ্ধাঞ্জলিতেও যদুনাথ বিশেষ করে বললেন জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের ও তাঁর স্বদেশ-নির্মাণের প্রচেষ্টার কথা: "রবীন্দ্রনাথ চরিত্র গড়িয়া তুলিবার মন্ত্র দিলেন... এই দেশ উদ্ধারের ভিত্তি অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র গঠন তিনি অনেক আগেই আরম্ভ করিয়াছিলেন... আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের উক্তি যে মহাপুরুষদের হৃদয় কুসুমের মত কোমল অথচ বজ্রের মত কঠিন তাহা এই আধুনিক কবি সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য... আর পরবর্তীযুগে তিনিই তাঁহার বাণী এক ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন— 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।" আর শ্রদ্ধাঞ্জলির শেষে বলেছিলেন: "আমাদের সম্মুখ হইতে দৃশ্যমান রবি অস্ত গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া বাঙ্গালী জাতি যদি এই চিত্তবল সাধনা করে, যদি তাহা কখনই না হারায়, তবেই রবীন্দ্রস্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে, তাহার নিকট মর্ম্মর বা পিত্তল মূর্তি ব্যর্থ নশ্বর ব্যঙ্গ মাত্র।"[১১২]

সাঁইত্রিশ বছর আগে ১৯০৪ সালে বোধগয়ায় বিমর্ষ নিবেদিতাকে যদুনাথ একই কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভরসা— তাঁর আত্মত্যাগ ও নিরলস সাধনার মন্ত্র বাংলাদেশের নব প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, যদুনাথ রবীন্দ্র-মানসের যে বৈশিষ্ট্যগুলি বারবার উল্লেখ করছেন সেগুলি লক্ষণীয়রূপে ভিক্টোরিয়ান, উনবিংশ

শতকের শেষার্ধে শিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙালির শঙ্কিত মূল্যবোধ— অন্তত ভিকটোরিয়ান বর্ণালীর এক প্রান্ত।

বর্ণালীর অন্য প্রান্ত তিনি স্পর্শ করলেন 'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন ১৩৪৮ [১৯৪১] সংখ্যায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের একটি দান" প্রবন্ধে : "রবীন্দ্রনাথ কখনো জনতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নেতৃত্ব লোভে হুঙ্কার— অর্থাৎ বীণার সপ্তমে চড়া সুর বাদন— করেন নাই; এরূপ ধস্তাধস্তি-কাজের পক্ষে তাঁহার আন্তরিক অসামর্থ্য ছিল। যে দাঁড়িপাল্লায় মণে মণে কয়লা ওজন হয়, তাহার কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা গৃহের কেমিক্যাল ব্যালান্সে করিতে পারে না।" অথবা, "রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম আনিয়া দেন, এবং যাহার অনুশীলনে কেহই এ পর্যন্ত সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তাহার ইংরাজী নাম— refined delicacy, এবং তাহার বিপরীতটির নাম— vulgarity of taste." চারটি অনুচ্ছেদ পরে যদুনাথ আবার লিখলেন : "চারদিক দেখিয়া বহুজনের সহিত মিশিয়া (অথচ এক হইতে না পারিয়া), মর্ম্মপীড়িত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে সেই মার্জ্জিত রুচি, সেই আত্মসংযত মিহি সুর চালাইবার চেষ্টা করেন।"[১১৩] আমাদের মনে পড়বে ম্যাথু আরনলডের সেই বহু আলোচিত 'sweetness and light'-এর কথা, 'culture and anarchy'র বৈপরীত্য।

মৃত্যুর তিন বছর আগে, ১৯৫৫-তে ঐতিহাসিক যদুনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন "Rabindranath Tagore : An Analysis" নামক প্রবন্ধে। তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিশীল জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা প্রয়োজন; যদুনাথ এই পর্যায়গুলির নাম দিয়েছিলেন : 'ages of sound, sentiment, thought and soul'। যদুনাথের মতে এই চারটি পর্যায় পরস্পর অন্বিত এবং পর্যায়গুলি অবিচ্ছিন্নভাবে বিকশিত হয়েছিল ১৯১৫ সাল পর্যন্ত— "Thereafter he, no doubt, wrote volume after volume but they reflected only the after-glow, when the sum had already set." তাঁর মূল্যায়নে যদুনাথ স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়কে: "because he produced at this time more prose than poetry and that prose was of the highest value in respect of its contents. I still maintain that it marks the perfect flowering of his genius, though he himself was not satisfied with what he wrote, but mourned that his *best* had not yet been given to the world." যদুনাথ বলেছেন এই গদ্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "an attempt to preach the eternal verities to a world that had lost its soul in the blind worship of Mammon."[১১৪] বলাই বাহুল্য, যদনাথের রবীন্দ্র-মূল্যায়ন আমাদের অনেকের কাছেই গ্রাহ্য হবে না। সেটা অন্য কথা। আমার কাছে যা প্রাসঙ্গিক তা এই যে, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে যদুনাথ যে-সব সূত্র ব্যবহার করেছেন সেগুলি অভ্রান্তভাবে ভিকটোরিয়— কারলাইল ও আরনলডের। সন্দেহ নেই, 'জন্ম রোম্যানটিক' রবীন্দ্রনাথ— যাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্ভারকে বুদ্ধদেব

বসু বলেছিলেন "গহনের সন্ধানী, মানবাত্মার বদ্ধমূল বেদনার দ্বারা স্পন্দমান"[১১৫] —সেই রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথ কোনোদিন চেনবার চেষ্টা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলায় যদুনাথ তাঁর অন্যতম শেষ লেখা লিখেছিলেন ১৩৬২'র মাঘ মাসে। রচনাটির নাম "রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত", প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় এবং উপলক্ষ ছিল বিশ্বভারতীর 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-বিষয় প্রবন্ধের সংকলন : 'ইতিহাস'। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে যদুনাথই বোধকরি প্রথম, যিনি রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তাকে 'ইতিহাসের দর্শন' আখ্যা দিয়েছিলেন : "কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই সংগ্রহে ['ইতিহাস'] অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কাহিনী অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনা এবং বাহ্য তথ্য নির্ধারণ নাই, আছে 'philosophy of history' এবং সেইজন্য যখন (১৯১৩ সালে) অমি তাঁহার প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করি, তখন ইহার যথার্থ নাম দিয়াছিলাম 'My Intepretation of Indian History'। এই সংগ্রহ গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্য অথবা ইতিহাস-শাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতি (methodology) সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু পাঠক রবীন্দ্রনাথকে আরো একান্তভাবে চিনিতে এবং কবির হৃদয় স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন।"[১১৬]

যদুনাথ বলেছিলেন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস এখনও লেখা হয় নি, "সে কার্য্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পথ দেখাইবে।" পরিশেষে, ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উদ্ধার করে যদুনাথ শিক্ষায়তনগুলির সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিকদের উদ্দেশে বলেছিলেন : "আমরা পেশাদার ঐতিহাসিকগণ যেন তাঁহার আর একটি কথা... না ভুলি। ১৯০৫ সনে তিনি লেখেন : 'ইতিহাসকে কেবল জ্ঞান নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবে তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেকদিন হইতে চলিত আছে। আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক।' এই বীজের সুপষ্ট ফল তাঁহার পদ্যে 'কথা ও কাহিনী' নয় কি?"[১১৭]

এই নিবন্ধের উপসংহারে যদুনাথ আক্ষেপ করেছিলেন : "এই বিভাগের রবীন্দ্র চিন্তাগুচ্ছ পাইয়া একটি কথা আর মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তাঁহার অমূল্য গানগুলি— অন্তত ব্রহ্মসংগীত ও জাতীয় সংগীতগুলি— সব একত্র করিয়া এক সস্তা পুস্তকের আকারে ছাপান হয় না কেন?"[১১৮] তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'গীতবিতান' অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল অনেক আগেই, পৌষ ১৩৫২-তে এবং পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল আশ্বিন ১৩৫৪ ও আশ্বিন ১৩৫৭ সনে। স্পষ্টতই, নিবন্ধ রচনার সময়ে যদুনাথ এই তথ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। নিবন্ধের শেষে একটি 'সংযোজন'-এ যদুনাথ সে-কথা আমাদের জানিয়েছেন।

তিনবছর পর, ১৯৫৮-এর ১৯ মে রাতে অষ্টআশি বছর বয়সে এই দৃঢ় চরিত্র ও আজীবন আদর্শনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা, সুধা, যদুনাথের শয্যার পাশে পেয়েছিলেন দুটি বই। একটির নাম 'আইভ্যান্‌ হো'। অপরটি 'ব্রহ্মসংগীত'।[১১৯]

সূত্রনির্দেশ

১. 'চিঠিপত্র' ১২, সম্পাদনা : ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী, ১৯৮৬; পৃ. ১০৭।

২. 'ভারতী', কার্তিক, ১৩১৯। দ্র. "বন্ধু", 'পথের সঞ্চয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, বিশ্বভারতী, ১৯৭৭; পৃ. ৪১৭-১৮। পরবর্তী উল্লেখে, রর ও খণ্ড সংখ্যা।

৩. দ্র. *Imperfect Encounter : Letters of William Rothenstein and Rabindranath Tagore, 1911-1941,* ed., with an Introduction and Notes by Mary M. Lago, Cambridge, Massachusetts : Harvard UP, 1972; pp. 283-297. পরবর্তী উল্লেখে, Lago।

৪. "বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা", 'ভারতী', ফাল্গুন, ১২৮৮। দ্র. "বিবিধ প্রসঙ্গ", রর : অচলিত সংগ্রহ ১, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪; পৃ. ৩৬১।

৫. দ্র. "গ্রন্থপরিচয়", রর ১০, বিশ্বভারতী, ১৯৭১, টীকা ১৫; পৃ. ৬৬৭-৬৮।

৬. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ, ২ জুলাই, ১৯২৭, 'চিঠিপত্র' ১২, বিশ্বভারতী, ১৯৮৬; পৃ. ১০৮।

৭. 'রবিজীবনী', খণ্ড ৬, কলকাতা, ১৯৯৪; পৃ. ১৯৯-২০০।

৮. 'চিঠিপত্র' ১০, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫; পৃ. ৪৭।

৯. 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য', কলকাতা, ১৩৭৬; পৃ. ২০৪।

১০. দীনেশচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথ, ১৪ অক্টোবর, ১৯২১। 'চিঠিপত্র' ১০; পৃ. ৫৮।

১১. দ্র. Lago; p. 280-297।

১২. দ্র. Sturge Moore to Rabindranath, 1913-1935 in Bikash Chakravarty, ed., *Poets to a Poet , 1912-1940. Letters from Robert Bridges. Ernest Rhys, W. B. Yeats, Thomas Sturge Moore, R. C. Trevelyan and Ezra Pound to Rabindranath Tagore,* Visva-Bharati, 1998; pp. 181-252।

১৩. বিকাশ চক্রবর্তী, "টমসন ও রবীন্দ্রনাথ", বিশ্বভারতী পত্রিকা (নবপর্যায়), বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০২; পৃ. ২৭-৪৭।

১৪. টমসন-রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়ের জন্য দ্র. Uma Dasgupta, ed., *A Difficult Friendship : Letters of Edward Thompson and Rabindranath,* OUP, 2003।

১৫. ১৯২৫ সালে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগকে একটি কলেজে পরিণত করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় 'শিক্ষাভবন'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষাভবন'-এর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পদত্যাগ প্রসঙ্গে দ্র. রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ, ২২ আগস্ট, ১৯২৫ ও ২৩ আগস্ট, ১৯২৫, 'চিঠিপত্র' ১২; পৃ. ৩৬৩-৬৫।

১৬. রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ, ৯ মে, ১৯২৬, 'চিঠিপত্র' ১২; পৃ. ৩৬৫-৬৮।

১৭. তদেব; পৃ. ৯০-৯৪।

১৮. তদেব; পৃ. ৮৮-১১১ এবং ৩৬৩-৩৮৭।

১৯. তদেব; পৃ. ১০৫।

২০. রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ, ২ জুলাই, ১৯২৭, তদেব; পৃ. ১০৭।

২১. তদেব; পৃ. ১০৩।

২২. রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ, ২ জুলাই, ১৯২৭, তদেব; পৃ. ৩৮৩।

২৩. তদেব; পৃ. ৯৪। বক্ররেখ আমার।

২৪. ৭ অক্টোবর, ১৯২৮, তদেব; পৃ. ১১৯।

২৫. 'স্মৃতির খেয়া' (১৯৭৮)। প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' ৯, কলকাতা ২০০৪; পৃ. ১৬ তে উদ্ধৃত।

২৬. "Jadunath Sarkar (A Biographical Sketch)", in H R. Gupta, ed., *Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar,* Punjab University 1958; p. 51. পরবর্তী উল্লেখে, *Life and Letters.*

২৭. তদেব; p. 52।

২৮. "ভূমিকা", মণি বাগচি, 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা', কলকাতা, ১৯৭৫; পৃ. [৯]। পরবর্তী উল্লেখে, 'আচার্য যদুনাথ'।

২৯. 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩৫৫; পৃ. ২১৩-১৫।

৩০. যে কটি মনোগ্রাফ বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি হল, যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮২); নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, 'যদুনাথ সরকার' (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮); অনিরুদ্ধ রায়, 'যদুনাথ সরকার' (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯); Anil Chandra Banerjee, *Jadunath Sarkar* (Sahitya Akademi, 1989), মণি বাগচির 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা' (কলকাতা, ১৯৭৫) সবক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়।

৩১. দ্র. 'চিঠিপত্র' ১৫, সম্পাদনা ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫।

৩২. সুশীল রায়, "শ্রী যদুনাথ সরকার", 'স্মরণীয়', কলকাতা, ১৯৫৮; পৃ. ৫৬-৫৭।

৩৩. *Life and Letters*; p. 268.

৩৪. 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রর ১৯, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬; পৃ. ৩৭৬, ৩৭৮।

৩৫. "Reminiscences", *Life and Letters;* p. 87.

৩৬. "স্যার যদুনাথ সরকার", 'এখন যাঁদের দেখছি', কলকাতা, ১৩৬২; পৃ. ৩১।

৩৭. "ভূমিকা", 'আচার্য যদুনাথ'; পৃ. [১১-১২]

৩৮. "Jadunath Sarkar (A Biographical Sketch)", *Life and Letters*; p. 54.

৩৯. তদেব; পৃ. ৪১৬।

৪০. "বিজয়ার অলিন্দে", 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২০-২১।

৪১. *Life and Letters*; p. 43.

৪২. "ভূমিকা", 'আচার্য যদুনাথ'; পৃ. [১২]

৪৩. 'পথে ও পথের প্রান্তে', ১ বৈশাখ, ১৩৩৪। 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৩৪৫),

বিশ্বভারতী ১৪০০; পৃ. ৩৬।

৪৪. যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার'; পৃ. ৭৪।

৪৫. প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে, *Hindustan Standard,* Puja Number, 1941 এবং *Hindusthan Standard,* Puja Annual, 1952 সংখ্যায়।

৪৬. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' ৫, কলকাতা, ১৯৯০; পৃ. ২০৫-২০৬।

৪৭. বক্ররেখ আমার। "Rabindranath Tagore and Sister Nivedita"; p. 65.

৪৮. গাথা দুটি হল, "পণরক্ষা" ও "পূজারিণী"। ১৯৩১ সালে *The Modern Review* (পরবর্তী উল্লেখে *MR*) পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় যদুনাথ "Tagore's ballads" (pp. 381-84) নামক একটি প্রবন্ধে "পণরক্ষা" ও "পূজারিণী" কবিতা দুটির পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ ও আলোচনা করেছিলেন। অনুবাদ দুটির ইংরেজি শীর্ষক ছিল যথাক্রমে "His Vow" (pp. 382-83) ও "The Votaress" (pp. 383-84)।

৪৯. "Greater India", *MR*, August, 1927; pp. 216-19.

৫০. "সাহিত্যিরসিক যদুনাথ সরকার", 'দেশ', ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৪; পৃ. ৯৫৩।

৫১. দ্র. *Hindusthan Standard,* Puja Annual, 1955; pp. 57-60.

৫২. যথাক্রমে *Gitanjali* (Nagri Script), *MR,* March, 1915; pp. 318-19; *Sadhana : The Realisation of Life, MR,* July, 1915; pp. 84-85; *Chitra, MR,* October 1915; pp. 431-3; *The Home and the World, MR,* November, 1919; 543-44; এবং 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়'-এর জন্য, *MR,* March, 1944; p. 221.

৫৩. ১৯১৫'র ৪ এপ্রিল রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন "[Since *I have got my fame as an English writer* I feel extreme reluctance in accepting alterations in *my English poems by any* of your writers." Lago; p. 195। বক্ররেখ আমার।

৫৪. Tagore to Rothenstein, 10 December, 1913. তদেব; p.143.

৫৫. 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ১৮।

৫৬. Tagore to Rothenstein, 20 August, 1915, Lago ; p. 211.

৫৭. Tagore to Rothenstein, 10 December, 1915, তদেব; p. 215.

৫৮. প্রশান্তচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ, ২১ আগস্ট, ১৯১৫। প্রশান্তকুমার পাল-সম্পাদিত 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত : রবীন্দ্রনাথ-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পত্রবিনিময়', কলকাতা, ২০০৫; পৃ. ৪-৫। পরবর্তী উল্লেখে, 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'।

৫৯. দ্র. G. S. Sardesai, "Jadunath Sarkar as I know Him"", *Life and Letters;* p.19-20; এবং যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার'; পৃ. ৩৫।

৬০. দ্রঃ *MR*, January, 1918; pp. 2-7.

৬১. যদুনাথকে রবীন্দ্রনাথ, ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭, 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ২০।

৬২. Jadunath sarkar, "Confession of a History Teacher," *MR,* December, 1915; p. 663.

৬৩. 'রবিজীবনী' ৬, কলকাতা ২০০৪; পৃ. ২২৭।

৬৪. পৃ. ৪২২-২৩।

৬৫. প্রথম পত্রটি (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) অবশ্য কোনো চিঠি নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত এটি একটি মুদ্রিত কার্ড। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ দিনটি স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখী-সংগীত ও মন্ত্র (ভাই ভাই এক ঠাঁই ...) একটি কার্ডে মুদ্রিত করে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

৬৬. 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ২১।

৬৭. তদেব; পৃ. ১৬২।

৬৮. এই চিঠিটিও পাওয়া যায় নি। চিঠিটির তারিখের জন্য দ্র. রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথ, ৩১ মে, ১৯২২, 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ৮৫।

৬৯. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' (১৩৬৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৭; পৃ. ১১১।

৭০. দ্র. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ২১২।

৭১. দ্র. *Visva-Bharati (The Santiniketan University) : Memorandum of Association, Statutes and Regulations;* pp. 32-33.

৭২. রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথ, ৩১ মে, ১৯২২, 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ৮৫।

৭৩. তদেব; পৃ. ৮৬।

৭৪. তদেব; পৃ. ৮৭।

৭৫. তদেব; পৃ. ৮৭।

৭৬. তদেব; পৃ. ২১-২২।

৭৭. তদেব; পৃ. ২৮।

৭৮. তদেব; পৃ. ২৮-২৯।

৭৯. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ২৬

৮০. রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথ, ৩১ মে, ১৯২২, চিঠিপত্র ১৫; পৃ. ৯০, ৯৪।

৮১. "বিশ্বভারতী", রর ২৭, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪; পৃ. ৩৪৬।

৮২. দ্র. John Henry Newman, *The Idea of a University Defined and Illustrated (1877),* ed. I.T. Ker, Oxford 1976; p. 5.

৮৩. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ২৭।

৮৪. *Visva-Bharati Samsad Proceedings 1922-1923,* Rabindra-Bhavana archive, Visva-Bharati.

৮৫. দ্র. 'চিঠিপত্র' ১২; প. ৯৩।

৮৬. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯২২ - ২১ মার্চ ১৯৩২', ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৯৯৩; পৃ. ৩৬, পরবর্তী উল্লেখে, 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', খন্ড ও প্রকাশকাল।

৮৭. 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ২৯-৩০।

৮৮. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ৭৭।

৮৯. 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ২২।

৯০. 'চিঠিপত্র' ১২; পৃ. ১১৩-১৪।

৯১. তদেব; পৃ. ১১৪-১৫।

৯২. যদুনাথকে রবীন্দ্রনাথ, ৩০ নভেম্বর, ১৯২৭, 'চিঠিপত্র' ১৫; পৃ. ২৯-৩০।
৯৩. যোগেশচন্দ্র বাগল, "যদুনাথ সরকার", 'বরণীয়', কলকাতা, ১৩৬৬; পৃ. ১৬৮।
৯৪. দ্র. 'সুবোধ সেনগুপ্ত, 'তে হি নো দিবসা:', কলকাতা ১৯৮৪; পৃ. ৯৪-৯৫, ১৬৮-১৬৯, ১৯০,২০৫, ২৪০, ২৬৯। এবং সুকুমার সেন, 'দিনের পরে দিন যে গেল', ১ম খণ্ড (১৯৮২), কলকাতা, ১৯৯০; পৃ. ১২২, ১৩২-৩৩।
৯৫. দ্র. 'জয়শ্রী' : স্যার যদুনাথ শতবার্ষিকী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮; মণি বাগচি, 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা', পৃ. ৬০-এ উদ্ধৃত।
৯৬. দ্র. শ্রাবণী পাল সম্পাদিত 'মুকুল দে-র দিনলিপি', কলকাতা, ১৯৯৫। প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' ৭, কলকাতা, ১৯৯৭-এ উদ্ধৃত; পৃ. ২৯৩।
৯৭. প্রশান্তচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ, ২ জুন, ১৯২২, 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত', পৃ. ২৬।
৯৮. দ্র. পত্র ৯২,"রামানন্দকে লিখিত পত্রের প্রসঙ্গ", 'চিঠিপত্র' ১২; পৃ. ৪৯১।
৯৯. *India Through the Ages;* (1928), Disha Books, 1998; pp. 76-77.
১০০. চিঠিপত্র ১২; পৃ. ১১৬।
১০১. *India Through the Ages;* pp. 77-78.
১০২. রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ, ১০ অক্টোবর, ১৯২৮, 'চিঠিপত্র' ১২; পৃ. ১২১।
১০৩. তদেব; পৃ. ১২১
১০৪. প্রশান্তচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ, ২০ জানুয়ারি, ১৯২৯, 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ৮২।
১০৫. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', ১ খণ্ড; পৃ. ১২।
১০৬. তদেব; পৃ. ২৪।
১০৭. তদেব; পৃ. ৪৯।
১০৮. Ramananda Chatterjee, ed. *The Golden Book of Tagore : A Homage to Rabindranath Tagore from India and the World in Celebration of His Seventieth Birthday,* Calcutta : Golden Book Committee, 1931.
১০৯. Chatterjee, Ramananda, Register No. 2, Serial No. 8. Nehru Museum Library, Delhi. প্রতিলিপি।
১১০. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', খণ্ড ২, কলকাতা ২০০২; পৃ. ৭৭। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।
১১১. তদেব; পৃ. ৮৪।
১১২. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', খণ্ড ৪, কলকাতা, ১৯৯৮; পৃ. ২৬৮-৬৯।
১১৩. 'শনিবারের চিঠি : রবীন্দ্র-সংখ্যা' (পুনর্মুদ্রণ), কলকাতা, ১৪০১; পৃ. ৭৫২-৫৩; ৭৫৪; ৭৫৫।
১১৪. *Hindusthan Standard,* Puja Annual, 1955; pp. 59, 60.
১১৫. 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬), কলকাতা, ১৯৮০; পৃ. ১২।
১১৬. "রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত", 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩৬২; পৃ. ৪১৪-১৫।
১১৭. "রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত", পৃ. ৪১৪-১৫; ৪১৫, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির জন্য দ্র. "ইতিহাস কথা", 'ইতিহাস', বিশ্বভারতী, ১৩৯৫; পৃ. ১৬৩।
১১৮. তদেব; পৃ. ৪১৫।
১১৯. দ্র. যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার'; পৃ. ৮৯-৯০।

শিক্ষার মাধ্যম ও যদুনাথ সরকার

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, 'আত্মকথা' (১৯৪৭)-র স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ *Autobiography* (১৯৫৭)-তে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন : "I had been a member of the Patna University Senate and Syndicate and I now decided to resign from both the bodies though not before I had completed one job on which my mind was set. The University had appointed a committee to suggest reforms in the light of recommendations made by the Sadler Commission on the affairs of Calcutta University and I was a member of the committee. I had worked hard to have the *mother-tongue accepted as the medium of instruction at least up to the Matriculation standard.* It was a hotly debated issue in the committee... Many prominent persons of Bihar were opposed to my view as they felt that if English was not taught from the beginning, the standard of education of the boys would be lowered and that, in the race for progress, the nation would be left far behind. ... When the Senate met, I made a strong appeal for the adoption of my resolution. *Among those who opposed the resolution were Sultan Ahmed, Khwaja Mohammed Noor, Justice Jwala prasad and Prof. Jadunath Sarkar.* Among the supporters, surprisingly enough, were two Englishmen, Prof. Hamilton and Prof. Duke. ... The resolution was carried by a majority. The Senate recommended the amendment of the University rules to enable schools to impart education through the medium of the mother-tongue up to the Matriculation." (বক্ররেখ আমার)[১]

উল্লিখিত সেনেট অধিবেশনের কোনো সাল বা তারিখের উল্লেখ রাজেন্দ্রপ্রসাদ করেন নি। কিন্তু আত্মজীবনীতে বিধৃত আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী থেকে অনুমান করা যায় যে, উক্ত অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল গান্ধিজির অসহযোগ-আন্দোলনের ডাক

দেওয়া (সেপ্টেম্বর ১৯২০) ও স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত (১৯১৯-২০) হবার পর, সম্ভবত ১৯২০-র নভেম্বরে। উদ্ধৃত বিবৃতিতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানিয়েছেন যে, সেনেট অধিবেশনে উপস্থাপিত তাঁর প্রস্তাবের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন যদুনাথ সরকার তাঁদের অন্যতম। মণি বাগচিও তাঁর 'যদুনাথ সরকার : জীবন ও সাধনা' বইতে রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি ঈষৎ অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করে বলেছেন: 'সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেদিন যখন কমিটির সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়, সিনেটের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে একমাত্র যদুনাথই সাহস করে বলতে পেরেছিলেন : "If English is not taught from the beginning, the standard of education of the boys will be lowered, and that in the race for progress, the nation will be left far behind."[২]

'সমসাময়িক বিবরণ' বলতে মণি বাগচি কী বুঝিয়েছেন আমার জানা নেই। যদুনাথের 'উক্তি'-র কোনো সূত্র নির্দেশও তিনি করেন নি। মজার কথা এই যে, যে-বাক্যটি যদুনাথের উক্তি বলে মণি বাগচি দাবি করেছেন, একটু লক্ষ করলেই ধরা পড়বে রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকে সেটি উৎকলিত, যদিও রাজেন্দ্রপ্রসাদ যদুনাথের মুখে বাক্যটি বসান নি, সাধারণভাবে তদানীন্তন বিহারের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মনোভাব বলে উল্লেখ করেছেন। বোধ হয় সেই কারণেই মণি বাগচি-প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে বাক্যটি নেই। তথ্যবিকৃতির এই অপচেষ্টা দেখলে ঐতিহাসিক যদুনাথ কী ভাবতেন সহজেই অনুমেয়। অবশ্য প্রসঙ্গটি যদি স্কুলের পাঠক্রম থেকে ইংরেজি বিতাড়নের হত, তবে উক্তিটি যদুনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু রাজেন্দ্র-প্রসাদের প্রসঙ্গ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং সেই সূত্রে যদুনাথের বিরোধিতা। বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য। কিন্তু তার আগে প্রসঙ্গটি একটু বিশদ করা দরকার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার প্রতিকারের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৭ সালে লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যর মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বাধীন একটি রয়াল কমিশন গঠন করে। কমিশনের সরকারি নাম 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন' হলেও, এটি স্যাডলার কমিশন নামেই সমধিক পরিচিত এবং এর কার্যকাল ছিল ১৯১৭ থেকে ১৯১৯। ১৯১৯-২০ সালে কমিশন তেরো খণ্ডে সংকলিত তার বিপুল রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে। ১৯২১ সালে রিপোর্টটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয় এবং যথারীতি রিপোর্টটি সম্পর্কে সরকার দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করে। ১৯২৩ সালে সরকার জানায় যে, আর্থিক সংকট ও অন্যান্য সমস্যার জন্য কমিশনের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, যদিও বিষয়টি সরকারের সক্রিয় ও সযত্ন বিবেচনাধীনে রয়েছে।[৩]

কমিশনের সভাপতি হিসেবে স্যর মাইকেল স্যাডলার (Sir Michael Sadler, 1861-1943)) কলকাতায় আসেন ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে। বিলেত ছাড়ার আগে তিনি তাঁর বন্ধু, উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের কাছ থেকে কতিপয় বিশিষ্ট

ভারতীয়ের নামে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। স্যাডলারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১৮ নভেম্বর, ১৯১৭-তে।[৪] এই সাক্ষাতের পর বেশ কয়েকবার স্যাডলার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমও পরিদর্শন করেছিলেন। ১৯১৭-র শেষের দিকেই স্যাডলার কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রশ্নাবলী বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের কাছে তাঁদের মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেয়। ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে লিখেছেন: "Education Commission-এর প্রশ্নাবলী পাইয়াছি। আপনাদের পরামর্শ পাইলে উত্তর দেওয়া সহজ হইত।"[৫] এ-বিষয়ে যদুনাথ কোনো পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা সেটা অবশ্য জানা যায় না।

যদুনাথ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উক্ত চিঠির কয়েকদিন পরেই স্যাডলার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যান। কমিশনের রিপোর্টে এই পরিদর্শনের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে।[৬] স্যাডলারকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি, বিশেষত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং স্যাডলার তাঁর প্রতিবেদনে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত অনুকূল মন্তব্য করেছেন।

স্যাডলার কমিশন রিপোর্টের সূত্রেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২১ সালে সেনেট ও সিন্ডিকেটের অধিবেশনে মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সরকারের অনীহা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি-উপসমিতি ইত্যাদির বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তাবটির শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যু ঘটে। এগারো বছর পর, ১৯৩২ সালের ২৩ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার এক অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আশুতোষের প্রস্তাবটি 'পুনরুজ্জীবিত করলেন। ২৪ জুলাই, ১৯৩২-এর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, শ্যামাপ্রসাদ তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় সমবেত সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯২১ সালে স্যর আশুতোষ বহু সমিতি ও উপসমিতির বেড়া ডিঙিয়ে সেনেট ও সিন্ডিকেটে দুটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন : (১) "উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ও হস্ত-সম্পাদ্য বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। (২) 'ইংরাজী ছাড়া অপর সকল বিষয়েই বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে।" ১৯২২ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সেনেটের অধিবেশনে প্রস্তাব দুটি অবশেষে গৃহীত হয়; কিন্তু সরকারী বিধি-নিষেধের চাপে প্রস্তাব দুটি কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

বক্তৃতার উপসংহারে শ্যামাপ্রসাদ বলেন : "১৯২১ সালে সিনেটের সম্মুখে যে প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হইয়াছিল ...সেই বিতর্কের উপসংহার করিবার সময় এখন আসিয়াছে। ইহাকে আমি শেষ মনে করি না, ইহাকে সূচনা বলিয়াই মনে করিয়া থাকি; কারণ দেশীয় ভাষা স্কুলসমূহে শিক্ষাদানের বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াই আমাদিগকে

নিবৃত্ত হইলে চলিবে না; আমাদিগকে আরো আগাইয়া যাইতে হইবে। এমন দিন আসিবে যেদিন আমাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্য শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের বাহন স্বরূপ হইবে।”[৭] সেনেটের উক্ত সভায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি যদিও ৩০-১৯ ভোটে গৃহীত হয়, তবু ১৯৩৭ সালের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি কার্যকর করা যায় নি।[৮]

মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের বাইরে বহু আগে থেকেই আলোচিত হচ্ছিল। আমরা সকলেই জানি যে, ১৮৯২ সালে রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত ও 'সাধনা' পত্রিকায় পৌষ ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি নিয়ে প্রথম দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেন।[৯] আলোচনায় সাগ্রহ সম্মতি জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু।[১০] 'সাধনা'র চৈত্র ১২৯৯ (১৮৯৩) সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে মুদ্রিত 'প্রসঙ্গ কথা'-য় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাব আরো স্পষ্ট করে উপস্থিত করলেন: "বাল্যকাল হইতেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিকরূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়, বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া শিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।"[১১] ১৮৯৩-এর পর থেকে সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন এবং বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিদ্যালয়েও তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯১৭-১৮ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের এই শিক্ষাদান ব্যবস্থাই মাইকেল স্যাডলারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু যে কথাটা আমরা অনেকেই জানি না সেটি এই যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও একটি স্মরণীয় ভূমিকা ছিল এবং এই প্রচেষ্টার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৮৯৪ সালে, কার্যনির্বাহক সমিতির দুজন সদস্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রজনীকান্ত গুপ্তের পরিষদের সম্পাদককে লিখিত দুটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে (১৫ অগস্ট, ১৮৯৪) চিঠি দুটি আলোচিত হয় এবং চিঠি দুটির বক্তব্যকে প্রস্তাবাকারে রচনা করার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়। এই উপসমিতির সদস্যেরা ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত ও নন্দকৃষ্ণ বসু।

"বিশেষভাবে নিযুক্ত এই সমিতি ২০০ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদ্‌গণের নিকট একটি 'সার্কুলার' প্রেরণ করেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে তাঁহাদের মতামত আহ্বান করা হয়—

১) সংস্কৃত, ফার্সী অথবা আরবী ভাষা শিক্ষাদানের কোন ক্ষতি না করিয়া এফ-

এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁহারা অনুমোদন করেন কিনা। যদি করেন তবে কতটুকু শিক্ষাদান তাঁহাদের মনোমত।

২) প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাঙ্গলা মাধ্যম প্রবর্তন আপনি কি পরিমাণে অনুমোদন করেন। আপাতত চতুর্থ শ্রেণী (Middle English) পর্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকাই আপনার অভিপ্রেত কিনা। ইহার উত্তরে ৭০ জন ভদ্রলোকের অভিমত পাওয়া গিয়াছিল। এই অভিমত পাইয়া এই সমিতি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। রজনীকান্তের মূল-প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাতে বলা হয় যে, এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গলা রচনা ও বাঙ্গলায় অনুবাদ প্রবর্তন করা হউক। ...হীরেন্দ্রনাথের মূল প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই আবেদনে এন্ট্রান্স পরীক্ষার গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতির পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।"[১২]

প্রস্তাব দুটির বিশদ আলোচনার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়িতে। এই অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

"... বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সদস্য এই মত প্রকাশ করেন যে পরিষদ যে প্রস্তাব করিতেছেন বিশ্ববিদ্যালয় তাহা গ্রহণ করিলে সংস্কৃত শিক্ষার গতি মন্দীভূত হইবে এবং ইংরাজী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত ও গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী এই মতের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শন করেন। অতঃপর স্থির হয় যে পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই দুইটি বিষয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাইবেন...।"[১৩]

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সাহিত্য পরিষদের এই প্রচেষ্টা অবশ্য বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। ১৮৯৬ সালে পরিষদের অধিকাংশ প্রস্তাবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও দশ বছরের মধ্যে উল্লিখিত মনীষীদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রবেশিকা স্তরে বাংলায় ইতিহাসের পরীক্ষা দেওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

২.

এই নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গে এবার ফিরে আসা যেতে পারে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন প্রবেশিকা স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাবের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন সুলতান আহমেদ, খোওজা মহম্মদ নুর, জোয়ালাপ্রসাদ এবং যদুনাথ সরকার। রাজেন্দ্রপ্রসাদের মূল প্রস্তাবটি দেখার সুযোগ আমার হয় নি। তাঁর প্রস্তাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদ কি স্কুলের পাঠক্রম থেকে ইংরাজি অপসারণের কথাও বলেছিলেন? আত্মজীবনীর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি এ

বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, অন্তত প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি সেখানে বলেন নি। অবশ্য পূর্বোদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুটির এক পৃষ্ঠা আগে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছিলেন: "It is not wrong to learn a foreign language. It is good to learn one, particularly today when knowledge of at least one European language has become almost obligatory. But to study a language in order to acquire a working knowledge of it is one thing and to learn every subject through its medium is another. *So I have always expressed my opposition to making a foreign tongue the medium of instruction but not to learning it for its own sake.*" (বক্ররেখ আমার)[১৪] এই অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য আমরা ধরে নিতে পারি যে, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইংরেজি বর্জন নয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি ছাড়া অন্য বিষয়গুলির শিক্ষাদান ব্যবস্থার কথাই বলেছিলেন।

ইংরেজি 'অটোবায়োগ্রাফি' প্রকাশের দশ বছর আগে প্রকাশিত মূল হিন্দি 'আত্মকথা' (১৯৪৭)— যার বেশিরভাগই রাজেন্দ্রপ্রসাদ জেলে অন্তরীণ অবস্থায় লিখেছিলেন ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে— থেকেও এ বিষয়ে বিশেষ কোনো সাহায্য আমরা পাই না। 'আত্মকথা'-র প্রাসঙ্গিক অংশে রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন: "সেনেটের অধিবেশনে আমার প্রস্তাবের সমর্থনে আমি একটি জোরালো বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সেই বক্তৃতায় তথ্য ছাড়াও, আবেগের মাত্রা বেশ কিছু পরিমাণে মিশে ছিল। যতদূর আমি বুঝতে পারলাম, উপস্থিত সদস্যরা আমার বক্তৃতার দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন সুলতান আহমেদ, খোওজা মহম্মদ নুর, জাস্টিস জোয়ালাপ্রসাদ, যদুনাথ সরকার প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের ভাষণে আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কেউ কেউ চুপ করে রইলেন। কিন্তু প্রস্তাবের বিপক্ষেই তাঁরা সম্মতি দিয়েছিলেন। আমার সমর্থকদের মধ্যে দুজন ইংরেজ ছিলেন— প্রোফেসর হ্যামিলটন ও প্রোফেসর ডিউক... প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের বলে গৃহীত হল। সেনেট এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে এমন পরিবর্তন করা হোক যাতে প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে... বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেনেটের অধিবেশনে যে প্রস্তাব পাশ করাবার জন্য আমি এত পরিশ্রম করেছিলাম, সেটিকে হয়তো কার্যকর করতে পারতাম। নিশ্চিত করে অবশ্য আজ কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সেনেটের অনুমোদন লাভ করার পরেও, প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিশেষ কোনো কাজ হয় নি। প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। সম্প্রতি, ইংরেজি ভাষা ও গণিত ছাড়া, প্রবেশিক্ষা স্তর পর্যন্ত অন্য সমস্ত বিষয়গুলির শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা মাতৃভাষাতে হয়েছে.. বিশ্ববিদ্যালয়ও শেষ পর্যন্ত এই জরুরি সংস্কার বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি।" (বাংলা অনুবাদ আমার)[১৫]

সুলতান আহমেদ, খোওজা মহম্মদ নুর ও জোয়ালাপ্রসাদ সম্পর্কে আমার মনে

কোনো সংশয় নেই। কিন্তু যদুনাথ সরকার? আসলে সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আগেই বলেছি রাজেন্দ্রপ্রসাদের মূল প্রস্তাবটি আমি দেখিনি। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য যদি এই হয় যে ইংরেজি ছাড়া, প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত অন্য সমস্ত বিষয়গুলির শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ মাতৃভাষার মাধ্যমে করা দরকার, তবে সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা যদুনাথের পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়, কারণ এই বক্তব্যের সমর্থনে যদুনাথের সাক্ষ্যের কোনো অভাব নেই।

স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৯১৭ সালে। পাটনা কলেজের স্থায়ী ও প্রবীণ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সেই সময় থেকেই নবজাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য। ১৯১৮-তে তিনি ইন্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসে উন্নীত হয়ে ১৯১৯-এর জুলাই মাসে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে যোগদান করেন। ১৯২৩-এর অক্টোবর মাসে তিনি আবার পাটনা কলেজে ফিরে আসেন। র‍্যাভেনশ কলেজ তখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে; অতএব, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিবেশনগুলিতে যোগ দেবার জন্য যদুনাথকে নিয়মিতভাবে কটক থেকে পাটনায় আসতে হত। স্যাডলার কমিশন রিপোর্টের প্রথম পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১ জুলাই ১৯১৯-এ।[১৬] অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে যদুনাথের প্রতিক্রিয়া কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নি। ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭-তে কমিশনের প্রশ্নাবলী প্রসঙ্গে যে চিঠি রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে যদুনাথ কবিকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, সেটি রবীন্দ্র-ভবন (বিশ্বভারতী) সংগ্রহে নেই।

কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার সম্পর্কে যদুনাথ ভাবছিলেন ১৯১৫ সাল থেকেই। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Confessions of a History Teacher' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে তাঁর প্রথম মুদ্রিত সাক্ষ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯১৫-এর ডিসেম্বর মাসেই (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২) রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের অবস্থানের সাযুজ্য যে-কোনো মনস্ক পাঠিকা/পাঠকের নজরে পড়বে।

কলেজের সাধারণ ছাত্রদের কাছে কিভাবে ইতিহাসের বিষয়কে অর্থবহ করে তোলা যায়, যদুনাথের প্রবন্ধে সেটাই প্রধান আলোচ্য: "The difficulties in the path of achieving this ideal are many, as everyone with experience of Indian Colleges knows very well. First and foremost, our boys have to attend lectures and write answers in an alien tongue of which the immense majority of our freshmen have no such mastery as breeds confidence and facility in using it."[১৭] আমরা জানি, ১৮৯২ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এক

অস্বাভাবিক অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। যদুনাথ তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করে বললেন: "This unnatural arrangement of Oriental boys having to read and write in a foreign and imperfectly acquired tongue, is responsible for a twofold mischief..."[১৮]

ইংরেজি ভাষায় ইতিহাস-শিক্ষাদান প্রসঙ্গে যদুনাথ যে-দুটি প্রধান অসুবিধার কথা বলেছেন, সে-দুটি হল, প্রথমত, ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি না থাকার ফলে আমাদের সাধারণ ছাত্রেরা ইংরেজি বই থেকে যে জ্ঞান আহরণ করেন তা যৎসামান্য। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি বই থেকে আহৃত সেই যৎসামান্য জ্ঞানকেও পরীক্ষার খাতায় তাঁরা ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পারেন না। যদুনাথ বলছেন: "When, however the lectures are delivered in the boys' mother tongue they can take notes of their own. A case within my own knowledge illustrates this point. I once discoursed on the Renaissance to the B.A. students of our college; the language used was English, and on examining their notebooks I found that only two of my pupils,— who were up to the honours standard— had taken down an intelligent and useful summary of my lecture in English. Sometime afterwards, I spoke on the same subject, but in Bengali, to the boys of Rabindranath's school at Bolpur, and though my second audience was very much younger than my first, they wrote excellent connected reports of my discourse, in their mother tongue."[১৯]

মাতৃভাষায় শুধু পড়ানোই নয়, মাতৃভাষায়— দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মাতৃভাষায়— উত্তর লেখার একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন যদুনাথ, পাটনা কলেজে তাঁর শিক্ষকতার জীবনে। যদুনাথের নিজের বিবৃতিতে: "Another experiment in education which I have made with great success at Patna College, is what, for want of a better name, may be called the *Vernacular Seminar*. Early in the term I put up a list of subjects with sources of informaton (in English) and ask my B.A. students to read them up and write vernacular essays, two students taking up a subject. The writers have to give exact reference to authorities, criticise evidence, and make at least an atempt at freshness of thought, instead of producing a mere epitome of the success. The essays are read by the writers in the full class, and the Professor concludes by criticising them and supplementing their information."[২০] সাধু ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দ বা আরবি শব্দের পরিবর্তে কথ্য ভাষায় প্রচলিত হিন্দি শব্দের ব্যবহারের নির্দেশও দেওয়া হত এই টিউটোরিয়াল ক্লাসে। এই প্রবন্ধেই যদুনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন:

"It is beyond the power of us,— who are mere teachers and not University authorities,— to abolish the unnatural system of teaching and examining our boys in a tongue which they do not use in daily life and in which only a few of them possess facility."[২১]

প্রবন্ধের শেষে পত্রিকার সম্পাদক (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) যদুনাথের প্রস্তাব সম্পর্কে পাঠিকা/পাঠকের মতামত ও মন্তব্য আহ্বান করেছিলেন।[২২] কৌতূহলের বিষয় এই যে, সম্পাদকের আহ্বানে মাত্র তিনটি মন্তব্য পাওয়া গিয়েছিল— তার মধ্যে একটি অস্বাক্ষরিত,[২৩] অপর দুটি পি.এস. রামকৃষ্ণ আইয়ার ও অধ্যাপক নীলকান্ত শাস্ত্রীর।[২৪]

মাতৃভাষা প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার যদুনাথ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ১৯১৬ সালে— দ্বারভাঙ্গা শহরে অনুষ্ঠিত বিহারী ছাত্র সম্মিলনীর (Bihari Students' Conference) একদশ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে।[২৫] যদুনাথ প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু মডার্ন রিভ্যিয়ুর নভেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভাষণটির বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।[২৬] যদুনাথের বক্তৃতা থেকে কয়েকটি বাক্য বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কয়েকজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে সভাপতি নিন্দা করেছেন। সম্পাদক, যিনি যদুনাথের সম্পূর্ণ ভাষণটি দেখেছিলেন, জানাচ্ছেন: "But we do not see any such condemnation here. He rather looks forward to the day when the normal method of instruction through the vernaculars will replace the present 'abnormal phenomenon' ... we have not forgotten his [Jadunath's] article on the Teaching of History in a previous mumber of this *Review*, in which he described how he used the vernacular of Bihar to teach history to his students in Patna College. And he says in another part of this very address that Bihar can be modernised 'only by imparting modern knowledge *through the vernaculars or English.*" [২৭]

যদুনাথের তৃতীয় প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, "The Vernacular Medium : Views of an Old Teacher" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। মডার্ন রিভ্যিয়ু পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায়।[২৮] লক্ষণীয়, স্যাডলার কমিশনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত যে চিঠি রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে লিখেছিলেন ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তে, সেই চিঠির অব্যবহিত পরেই যদুনাথ এই রচনাটিতে হাত দিয়েছিলেন। স্যাডলার কমিশন তখন কার্যরত। উনবিংশ শতাব্দীর ৯০-এর দশকে শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য যে উদ্যোগ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, এই প্রবন্ধে যদুনাথ তার কথা স্মরণ করেছেন এবং বিপক্ষের সাম্প্রতিক যুক্তিগুলি যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে: "To sum up, I think it is practicable and necessary at the present day *to make Bengali the medium of*

teaching and examination in our schools and colleges upto the intermediate standard only. The boys may *read* English books but they must *answer* in Bengali. In scientific subjects, English technical terms should be freely either written in English or transliterated in Bengali... I do not share the linguistic purist's horror of such mixture of languages... Our pundits have been the greatest enemies of the introduction of the vernacular medium, by their insistence on a difficult and artificial literary Bengali style, which is often more obscure than English to us. Allow a simple unadorned vernacular style in the answers at University examinations as the best means of ensuring true knowledge." (প্রথম বক্ররেখ আমার; পরবর্তী দুটি যদুনাথের)[২৯]

বছর চারেক পরে যদুনাথ আবার এই প্রসঙ্গ তুললেন তাঁর "An educational Programme for Bengal" নামক প্রবন্ধে। এটিও প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভ্যিয়ু পত্রিকায়, জুলাই ১৯২২ সংখ্যায়।[৩০] স্যাডলার কমিশনের সম্পূর্ণ রিপোর্ট ততদিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্ণিত সেনেটের অধিবেশনও দু বছরের পুরোনো। প্রবন্ধটিতে যদুনাথ বাংলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বহুবিধ সমস্যার আলোচনা করেছেন। কিন্তু, যেহেতু সমস্যাগুলির অধিকাংশই আমার বর্তমান নিবন্ধের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়, তাই যদুনাথের আলোচনা থেকে আমি মাত্র তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করব। প্রথমত, যদুনাথ বলেছেন যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হল মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল সংস্কার। এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত প্রস্তাব হল: (১) প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে সরিয়ে একটি স্বতন্ত্রভাবে গঠিত মাধ্যমিক বোর্ডের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে রাখা প্রয়োজন। (২) প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠক্রমের আদ্যন্ত পুনর্বিন্যাস, বিশেষত ইংরেজির : "A real working knowledge of modern English— and not philology nor rhetoric nor acrobatics of grammarians, which disfigure matriculation papers,— should be the first thing aimed at."[৩১] (৩) এই উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হতে পারে যখন *অন্যান্য বিষয়গুলি— যেমন, ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক— মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াবার ও পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব* হবে। স্কুলগুলির শিক্ষকমণ্ডলী ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এই নবগঠিত বোর্ড সর্বদাই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও মান সমসাময়িক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াসী হবে, যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো মৃত নিয়মবিধি পালনে পর্যবসিত না হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রবেশিকা স্তরের পর এবং ইনটারমিডিয়েট শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে আরো দুবছর স্কুল বোর্ডের অধীনেই প্রবেশিকা-উত্তর শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা দরকার। প্রথম ক্ষেপে, কয়েকটি নির্বাচিত স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, কলেজের শিক্ষাবর্ষ প্রচলিত চারবছর থেকে কমিয়ে তিনবছরে সম্পূর্ণ

করা যেতে পারে।[৩২] সন্দেহ নেই, ১৯২২ সালের পরিপ্রেক্ষিতে যদুনাথের প্রস্তাবগুলি আশ্চর্য রকম আধুনিক। জানতে ইচ্ছা করে, আমাদের সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনার রচয়িতারা কি যদুনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন?

অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে মডার্ন রিভ্যিয়ুতে প্রকাশিত যদুনাথের উল্লিখিত রচনাগুলি রাজেন্দ্রপ্রসাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক ধরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকা যে শিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী ভারতীয়দের মধ্যে বহুলপ্রচলিত ছিল সে-কথা আজ সুবিদিত। তা ছাড়া, রাজেন্দ্রপ্রসাদ যদুনাথের দীর্ঘকালের পরিচিত এবং বন্ধু।[৩৩] তাই মনে হয়, পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক সেনেট অধিবেশনে যদুনাথের বিরোধিতা— যদি তিনি সত্যই বিরোধিতা করে থাকেন— রাজেন্দ্রপ্রসাদকেও নিশ্চয় অবাক করেছিল। তাঁর বিরোধী মন্তব্যে যদুনাথ কোনো ব্যাখ্যা যোগ করেছিলেন কিনা তা-ও জানা যায় না। ফলে, সমস্ত প্রসঙ্গটাই আমার কাছে এক মস্ত প্রহেলিকা বলে ঠেকে।

সূত্রনির্দেশ

১. Rejendra Prasad, *Autobiography* (1957), New Delhi : National Book Trust, 1994; pp. 118-19.

২. মণি বাগচি, 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা', কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫; পৃ. ৫৫।

৩. দ্র. Mary M. Lago, ed. *Imperfect Encounter : Letters of William Rothenstein and Rabindranath Tagore, 1911-1941,* Cambridge, Masachusetts : Harvard UP, 1972, L 143, fn 4, Rothenstein to Tagore, 23 April, 1921; p. 282.

৪. দ্র. তদেব। L. 124, fn. 2, Rothenstein to Tagore, 5 April, 1918; p. 246.

৫. 'চিঠিপত্র ১৫', সম্পাদনা, ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫। পত্র ১২, যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ, ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭; পৃ. ২০।

৬. 'চিঠিপত্র ১৫'; পৃ. ১০৪-১০।

৭. দ্র. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ মার্চ ১৯৩২— ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১', ২ খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ (১৯৯৫), দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২, সম্পাদনা, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ৪২১-৪২৪।

৮. দ্র. "যৎকিঞ্চিৎ", 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩ খণ্ড (১৯৯৬); পৃ. ৩৭।

৯. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী ১৯৭৩, খণ্ড ১২; পৃ. ২৭৭-২৮৯। পরবর্তী উল্লেখে, র. র ও খণ্ড সংখ্যা।

১০. গ্রন্থপরিচয়, র. র ১২; পৃ. ৬১৬-১৭।

১১. গ্রন্থপরিচয়, র. র ১২; পৃ. ৬২২।

১২. দ্র. গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, "রজনীকান্ত গুপ্ত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ", 'রজনীকান্ত গুপ্ত : ব্যক্তিত্ব ও মনীষা', সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও জ্যোৎস্না

সিংহরায়, কলকাতা : লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৭৬; পৃ. ৬-৭।

১৩. তদেব; পৃ. ৭।

১৪. *Autobiography*; p. 117.

১৫. 'আত্মকথা', তৃতীয় সংস্করণ, নয়াদিল্লি : সস্তা সাহিত্য মণ্ডল, ১৯৬২; পৃ. ১৬২-৬৩।

১৬. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' ৭, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭; পৃ. ৪৬১।

১৭. Jadunath Sarkar, "Confessions of a History Teacher", *The Modern Review*, December, 1915; p. 662. পরবর্তী উল্লেখে, *MR*.

১৮. তদেব; p. 663.

১৯. তদেব; p. 663.

২০. তদেব; pp. 665-666.

২১. তদেব; p. 664.

২২. তদেব; p. 667.

২৩. *M R*, April, 1916; pp. 432-33.

২৪. *M R*, February, 1916; pp. 231-33.

২৫. রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় 'বিহারী ছাত্র সম্মেলন'-এর জন্ম হয় ১৯০৬ সালে। ১৯২০ পর্যন্ত প্রতি বৎসর পুজোর ছুটিতে এই সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন বিহারের কোনো না কোনো শহরে অনুষ্ঠিত হত। এই বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সভাপতিত্ব করেছিলেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর 'অটোবায়োগ্রাফি'তে (p. 49) ও 'আত্মকথা'য় (পৃ. ৬৩), তাঁদের নামের একটি তালিকা দিয়েছেন। আশ্চর্যের কথা, সেই তালিকায় যদুনাথের নাম নেই; অথচ দুটি বইয়ের প্রকাশকালেই যদুনাথ জীবিত ছিলেন।

২৬. দ্র. 'Prof. Jadunath Sarkar's 'Practical Address', 'Notes', *M R*, November, 1916; pp. 561-63.

২৭. তদেব; p. 562.

২৮. "The Vernacular Medium : Views of an old Teacher", *M R*, January, 1918; pp. 2-7.

২৯. তদেব; pp. 6-7.

৩০. "An Educational Programme for Bengal", *M R*, July, 1922; pp. 70-75.

৩১. তদেব; p. 73.

৩২. তদেব; p. 73. বক্ররেখ আমার।

৩৩। দ্র. Jadunath Sarkar to G.S.Sardesai, Cuttock, 4 December, 1922 : 'You may send a copy of Molesworth's Mar-Eng Dictionary 2nd ed. for me by a friend, to the Congress at Gaya, *where my friend Rajendra Prasad will take charge of it and forward it to Patna (which town I visit every month.)* বক্ররেখ আমার। H.R. Gupta, ed., *Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar*, Panjab University, 1958; p. 145.

'স্বদেশী আন্দোলন' : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার

'চিঠিপত্র ১৫'তে সংকলিত যদুনাথ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রটির পরিচিতি প্রসঙ্গে সম্পাদক জানিয়েছেন : "এই মন্ত্র ('ভাই ভাই এক ঠাঁই / ভেদ নাই ভেদ নাই') ও রবীন্দ্রনাথ রচিত রাখী-সংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' একটি কার্ডে মুদ্রিত করে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এরূপ একটি কার্ড যদুনাথকে প্রেরণ করেন। পত্রীটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল : 'বন্দে মাতরম / এক দেশ এক ভগবান / এক জাতি এক মনপ্রাণ'। প্রসঙ্গটি অবশ্যই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের। 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক ১৩১২ সংখ্যায় মুদ্রিত (পূর্বেই লিখিত) একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "আগামী ৩০ আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙলার রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতা বাঁধিয়া দিব'।"[১]

সন্দেহ নেই, এই কার্ড রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক বন্ধুদের কাছেই পাঠিয়েছিলেন; অন্যতম প্রাপক ছিলেন যদুনাথ সরকার। কিন্তু যদুনাথ কেন? বিহার প্রবাসী এই বাঙালি ঐতিহাসিক তখন পাটনা কলেজের অধ্যাপক, সরকারি চাকুরে এবং কোনোভাবেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সুবে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে আয়োজিত আন্দোলনে কোনো সরকারি চাকুরের পক্ষে সরাসরি যুক্ত থাকা সম্ভবও ছিল না, যদিও আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি থাকতেই পারে। অন্তত এরকম কথাই লিখেছেন যদুনাথের ঘনিষ্টতম গবেষক-ছাত্র ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো : "A few years after a political storm burst over Bengal and rapidly spread all over India with the Bengal Partitions of 1905 during the viceroyalty of Lord Curzon. A wave of anti-British feeling filled every genuine heart, and Jadunath could not but have a shaking. He was however the most moderate of his family. His more inflammable younger brother, Bijoynath, B.A. C.E, after a conflict with his British superior in the Central Provinces, lost the post of the Executive Engineer, and took to Swadeshi with full ardour. Jadunath prepared a sober broadside which hit the British Indian Gov-

ernment at its weakest spot, namely its economic policy. His *Economics of British India* came out in 1909..."[২] অর্থাৎ, যদুনাথের দেশাত্মবোধ কখনও কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তাঁর আর এক গবেষক-ছাত্র, যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরীও লিখেছেন : "যদুনাথের আন্তরিক স্বদেশ-প্রীতি ছিল। যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো আন্দোলনে যোগদান করেন নাই তাহা হইলেও তাঁহার অনেক কার্যে এই মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।"[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও 'স্বদেশী' আন্দোলনের একবছর আগে— ১৯০৪ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত— রবীন্দ্রনাথ যখন সদলবলে (রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, রথীন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসুর দুই কন্যা, ত্রিপুরার মহারাজকুমার ও তাঁর শিক্ষক, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য) বোধগয়ার অতিথিশালায় অবস্থান করছিলেন, যদুনাথ তখন পাটনা থেকে তিন-চার দিনের ছুটিতে বোধগয়ায় এই দলের সঙ্গে যোগ দেন। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এই সপ্তাহ-যাপনের সময়ে আসন্ন বঙ্গভঙ্গ ও 'স্বদেশী' আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন যদুনাথ। মাত্র চার মাস আগে কলকাতায় মিনার্ভা থিয়েটারে, ২২ জুলাই, ১৯০৪-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন। যাঁরা মিনার্ভা থিয়েটারে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনতে পান নি, তাঁদের অনুরোধে ৩১ জুলাই কার্জন রঙ্গমঞ্চে প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করা হয় একটু পরিবর্ধিত আকারে। এই প্রবন্ধ পাঠের সময়ে যদুনাথ কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর অনবহিত থাকার কথা নয়, কারণ ৩১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত পাঠের দিন প্রবন্ধটি একটি পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হয়েছিল। তাছাড়া, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ভাদ্র ১৩১১ (১৯০৪) সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এবং "স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট" অংশটি মুদ্রিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর আশ্বিন ১৩১১ সংখ্যায়। সন্দেহ নেই, বোধগয়া বাসের সময়ে "স্বদেশী সমাজ"-এর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার দ্বারা যদুনাথ প্রভাবিতও হয়েছিলেন। প্রভাবিত যে হয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে যদুনাথের "Rabindranath Tagore and Sister Nivedita" নামক স্মৃতিচারণে। যদুনাথ জানিয়েছেন একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময়ে বোধগয়ার সন্নিকটে বুদ্ধ-শিষ্যা সুজাতার গ্রামের ভগ্নস্তূপ দেখে ও ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নিবেদিতা যখন আক্ষেপ করছিলেন, যদুনাথ তখন নিবেদিতাকে বলেন : '"I do not despair. We had, certainly, reason for despondeney, *but Rabindranath has been the saviour of Bengal*" The poet was walking just behind us and overheard my remark. Then I explained at great length to Sister Nivedita, by extempore translations of Rabindranath's recent writings, how he had infused a new spirit into Bengali literature and through literature into the hearts of the rising generation of Bengal. His ballads and tales,

songs and essays, were now proclaiming the eternal values ... truth, self-sacrifice, earnest endeavour, strenuous devotion to ideals...'[৪] (বক্ররেখ আমার।) বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যদুনাথের এই মূল্যায়নে রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো ভূমিকা ছিল না।

স্বদেশ-ভাবনা প্রসঙ্গে যদুনাথের অবস্থান বোঝার জন্য তৎকালীন বিহার অঞ্চলের রাজনৈতিক পটভূমি খানিকটা জানা দরকার। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন অবিভক্ত বাংলার বিহার অঞ্চলকে আন্দোলিত করেনি। বিহারে স্বদেশী আন্দোলনের কথাও ১৯০৮ সালের আগে সরকারি নথিপত্রে স্থান পায়নি।[৫] কার্জন-প্রস্তাবিত বঙ্গচ্ছেদে বিহারিদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোনো আশঙ্কা ছিল না; দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশের নতুন প্রদেশে (নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম) যেমন মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, পুরোনো প্রদেশে তেমনি বিহারিদের সংখ্যাধিক্য ছিল। বস্তুত, শুধু বিহারিরা নয়, হিন্দিভাষী অবাঙালিরা সাধারণভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা বিদেশি পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নি। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, যিনি বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন : 'মারোয়াড়ীরা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালীর বিশেষ শত্রুতা করিয়াছিল। এমন কি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাতে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের মাথা ঘামাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।" কাশীর কংগ্রেসে যখন বাংলার অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা হয়, তখন তিনি এবং কতিপয় লোক বলিয়াছিলেন "প্রাদেশিক ব্যাপার কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়।" মিঃ গোখলে কাশী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন... তাঁহার চেষ্টাতে এবং বাঙালীর ভয়ে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা অবশেষে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।'[৬]

বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে বাঙালি-বিহারি অসৌহার্দ্যের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন ১৯০৮ সালে, 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত "সদুপায়" নামক প্রবন্ধে: "বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালিমাত্রেই জানেন.. বাঙালিও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে।"[৭] বাঙালির 'অবজ্ঞার' অন্যতম কারণ অবশ্যই এই ছিল যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বিহারে রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বদেশী আন্দোলনের ভূমি তৈরি হয় নি; যদিও কলকাতায় শিক্ষিত ও পাঠরত কতিপয় বিহারি যুবক এ-বিষয়ে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর আত্মজীবনী, 'আত্মকথা'-য় রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন : "বি.এ. পাস করিয়া আমি কলিকাতায় এম.এ. ও বি.এল. পড়িতে লাগিলাম। সে সময়ে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোর চলিতেছিল। কলিকাতায় আমরা যে

কয়েকজন বিহারী ছাত্র পড়িতেছিলাম, তাহাদের উপরেও ইহার প্রভাব পড়িতই। আমরা বিহারী ক্লাবে সর্বদা বসিতাম, মিশিতাম ও আলাপ-আলোচনা করিতাম। বাংলার ছাত্র সমাজ এইভাবে স্বদেশী প্রচার করিতেছে, আমাদের বিহারেও ছাত্রদের সংগঠন হইলে তাহার দ্বারা স্বদেশীর প্রচার হইতে পারে, আমাদের মনে এই উৎসাহ আসিল। আমরা এক গানও তৈরি করিলাম, তাহা ছাপাইয়া যেখানে-সেখানে বিলি করিলাম। ... আমরা মনে করিলাম, বিহারের ছাত্রদের এক সম্মেলন করা যাক। ... প্রথম সম্মেলন হইল পাটনা কলেজের বড়ো হল ঘরে। বিহারের সমস্ত কলেজ ও অনেক স্কুলের ছাত্রেরা ঐ সম্মেলনে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিল... আমার মনে আছে, নিয়ম রচনা করিবার সময় দুটি প্রশ্ন লইয়া নিজেদের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। এক, এই সম্মেলন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু কাজ করিবে কিনা। এ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যেই খুব মতভেদ ছিল। বয়স্ক লোকেরা তো সকলেই ইহার বিরোধী ছিলেন। শেষে ইহাই স্থির হইল যে সম্মেলন কোনো প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকিবে না। ... এই সময় বিহার বাংলারই অন্তর্গত ছিল। প্রদেশ স্বতন্ত্র হয় নাই। শিক্ষার দিক দিয়া বিহার অনেক পিছনে পড়িয়াছিল। সাধারণের হিতে জীবনযাপন তো না থাকার মধ্যেই। বিশেষত ছাত্ররা বাহিরের কোনো খবরই রাখিত না। অল্প লোকই কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। এ পর্যন্ত বিহারের কোনো স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও ছিল না, না ছিল বিহারের স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটি, না ছিল বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস। ইহাই হইল প্রথম প্রতিষ্ঠান..."[৮]

উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্ণিত সম্মেলনের ঘটনাকাল ১৯০৬ এবং বর্ণনাটি তৎকালীন বিহারের রাজনৈতিক চেতনার একটি নিখুঁত ছবি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিহার প্রবাসী বাঙালিরাও যে সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও 'স্বদেশী' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন— এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে— যেমন ভাগলপুর, রাঁচি, মজঃফরপুর ও হাজারিবাগে— অবশ্য বাঙালিরা ৩০ আশ্বিন, ১৩১২ (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫), বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে ঘরে ঘরে অরন্ধন দিবস পালন করেছিলেন।[৯] কোনো কোনো শহরে— যেমন ভাগলপুরে— সম্ভবত মিছিল ও সভা আয়োজিত হয়েছিল, কিন্তু পাটনা শহরে তেমন কিছু ঘটে নি। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— যিনি ১৯০২ সাল থেকে কলকাতার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন— লিখেছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন উড়িষ্যায় যেভাবে বিস্তারলাভ করেছিল, বিহারে সেভাবে করে নি : "বাঙ্গালার বৈপ্লবিক হাওয়া উড়িষ্যায় গিয়া বিশেষভাবে লাগে... উড়িষ্যায় দলে দলে বাঙালী (উড়িষ্যাবাসী বাঙালী), উড়িষ্যাবাসী যুবকের দল, মাস্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার বড়ো বড়ো মঠের মোহান্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীন ব্যক্তিরা আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন।... এক সময়ে কটক, পুরী, বালেশ্বর ও অন্যান্য স্থানসমূহ আমাদের সমিতির কার্যের ফলে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদে মুখরিত হইত।"[১০]

পক্ষান্তরে, "ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বিপ্লববাদ হিন্দি বা হিন্দুস্থানী ভাষীদের মধ্যে বিশেষভাবে স্ফূর্তিলাভ করে নাই। কারণ জানি না, হয়ত স্থানীয় লোকদ্বারা প্রচার করানো হয় নাই বলিয়া ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ফল লাভ হয় নাই অথবা তৎস্থানীয় ছাত্রবৃন্দের মানসিক চিন্তা তৎকালে বিপ্লববাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই।... চাঁইবাসার (সিংভূম) কোনো ঘটনা হইতে এই অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি যে কোন কোন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতাবাদী হইলেও বাঙ্গালীকে এ কর্মে বিশ্বাস করিতে রাজি হইতেন না। এর কারণ বাঙালা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিল।"[১১] কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে— যেমন রাঁচি ও চাঁইবাবসায় বিপ্লবীরা অবশ্য বাঙালি ও বিহারি ছাত্রদের সাহায্যে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কলকাতায়, রাজেন্দ্রপ্রসাদ সহ কয়েকজন উৎসাহী বিহারি ছাত্র "যুগান্তর" সাপ্তাহিকের হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টাও করেছিলেন। ১৯০৫-০৬ সালে অরবিন্দ পরিকল্পিত 'ভবানী মন্দির' স্থাপনা উপলক্ষে পাটনার কয়েকজন সহানুভূতিশীল আইনজীবী, শিক্ষক ও ছাত্রের সাহায্যও বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই সেখানে সফল হয় নি।[১২]

আগেই বলেছি, শুধু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনই নয়, 'স্বদেশী' আন্দোলনেও বিহার প্রবাসী বাঙালিদের কোনো সংগঠিত প্রয়াস দেখা যায় নি। পাবনার জমিদার ও কর্মসূত্রে সরকারি চাকুরে, অবিনাশ চক্রবর্তী ১৯০৪ সাল থেকেই অনুশীলন সমিতি ও 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ সাল থেকে তিনি অরবিন্দের সঙ্গে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং অরবিন্দের পণ্ডিচেরি গমনের পর তাঁরই উপর দলের কর্মভার ন্যস্ত হয়।[১৩] 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময়ে (১৯০৪-০৫) অবিনাশ চক্রবর্তী পাটনায় অস্থায়ী মুনসেফ হিসেবে কর্মরত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : "এই কালে আমি অবিনাশ বাবুকে বলি, আপনি পাটনায় আছেন, আপনার উর্ধ্বতন কর্মচারী মুকুন্দবাবুর সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা কেন করিতেছেন না? তিনি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, নিশ্চয়ই ঘোর স্বদেশী। অবিনাশবাবু উত্তর প্রদান করেন, মুকুন্দ বাবু ঘোর স্বদেশী। কিন্তু উচ্চস্তরে অবস্থিত আছেন। আমার দ্বারা approach করা সম্ভব নহে।"[১৪]

ঠিক কি প্রসঙ্গে অবিনাশ চক্রবর্তীর সঙ্গে উক্ত কথোপকথন হয়েছিল ভূপেন্দ্রনাথ বিশদ করেন নি। মনে হয়, ঘটনাটি ১৯০৫ সালের শেষের দিকের অথবা ১৯০৬ সালের শুরুর দিকের, এবং উপলক্ষ ছিল অরবিন্দ-উদ্ভাবিত 'ভবানী-মন্দির'-এর স্থাপনা। ১৯০৫ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯০৬-এর গোড়ায় অরবিন্দ তাঁর ইংরেজিতে রচিত প্রবন্ধ-পুস্তিকা, 'ভবানী-মন্দির' প্রকাশ করেন। ভারতের কোনো পর্বতশীর্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কল্পে আরাধ্যা দেবী ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠাই ছিল এই পুস্তিকার বিষয়। কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের তদানীন্তন সুপারিনটেন্ডেন্ট ডেন হ্যাম, তাঁর গোপনীয় রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন : "The pamphlet Bhawani Mandir is but a clear forerunner of the far stronger meat which was

served up in the Jugantar".[১৫]

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও ভবানী-মন্দির স্থাপনা প্রসঙ্গে অরবিন্দের সক্রিয় ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন এবং এই উপলক্ষেই তাঁকে অর্থ সংগ্রহের জন্য ১৯০৫-০৬ সালে বিহারের আরা ও পাটনা শহরে প্রেরণ করা হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথের বিবৃতি একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধারযোগ্য : "নির্জনে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া একদল সন্ন্যাসীর দ্বারা তাহার পূজা চালাইয়া এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা বিপ্লববাদ প্রচার করা এবং তদনুযায়ী কর্ম করার সঙ্কল্প লইয়া অরবিন্দ বরোদা হইতে ১৯০৫ সালে আসেন। ... এই কর্মোপলক্ষে ৺হেমচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে একটা সভা আহূত হয়। তথায় ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবব্রত বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। দেবব্রতের কাছে শুনিয়াছি, রামেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেন... হীরেন্দ্রবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। শেষে কলিকাতায় একটি Board of Trustees নিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে ৺হেমচন্দ্র মল্লিক (সুবোধ মল্লিকের খুল্লতাত); হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি পুস্তিকা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় এবং ছোটনাগপুরের পাহাড়ে মন্দির স্থাপনের জন্য ভূমির খোঁজও হয়। এই জন্য বারীন্দ্র ও হরিশ ঘোষ উভয়ে বিহারে যান। মন্দিরের জন্য চাঁদা তুলিবার নিমিত্ত রসিদ বইও মুদ্রিত হয়। আমিও আরা এবং পাটনায় এই কর্মের জন্য পরে প্রেরিত হই। ভূমি পাইবার সম্ভাবনা ছিল,অনেক বিহারী জমিদার এতৎকল্পে রাজী ছিলেন। যে সব বিহারী ভদ্রলোক ভেতরের কথা জানিতেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা অনেকেই চাঁদার খাতায় নাম সহি করেন। কিন্তু পাটনার বাঙালীরাই নানা প্রকারের আইনের ফাঁকি বাহির করেন। Trustee-দের নাম কোথায়, তাহাদের স্বাক্ষরিত পত্র কোথায়, কে কে এই পরিকল্পনায় আছেন ইত্যাদি না জানিলে বিশ্বাস করা যায় না। এই সময়ে পুনিতবাবু [কলকাতার S. K. Lahiri কোম্পানীর এজেন্ট, পাটনা নিবাসী, বাবু পুনিত লাল] আমায় কতিপয় বিহারী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহারা বলিলেন, 'মদৎ মিলেগা'; কিন্তু বাঙালীদেরই অবিশ্বাস ছিল। পুনিতবাবু আমাকে তৎকালে পাটনায় অবস্থিত অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং কিছুদিন আমি সরকার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। এই সময়েই একবার কথোপকথনকালে অধ্যাপক সরকার বলেন, 'ভগ্নী নিবেদিতা বলেন, রামমোহন রায়ের উপযুক্ত স্থান ছিল রণজিৎ সিংহের ডান দিকে। তাহা না করিয়া তিনি একটা ধর্ম-সমাজ করিয়া নিজের জীবন ব্যায় করিলেন (The proper place of Rammohan Roy had been by the right side of Ranjeet Singh)। নিবেদিতার এই মতে সরকারের মন্তব্য এই, 'রণজিৎ সিংহ ছিলেন একজন বর্বর, সে রামমোহনের কদর কি বুঝিত!' আমাদের দেশের অধ্যাপকদের Dialectical Materialism-এর জ্ঞান এই প্রকারের।"[১৬] স্পষ্টতই, যদুনাথ সরকারের কাছে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য কোনো সাহায্য ভূপেন্দ্রনাথ পান নি। অরবিন্দের 'ভবানী-মন্দির' প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছাও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

২.

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও 'স্বদেশী' আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা একটি বহু আলোচিত প্রসঙ্গ। বহু আলোচিত, কিন্তু সবক্ষেত্রে যথেষ্ট তথ্যনির্ভর নয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ভারতে ইংরেজ শাসনের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেছেন-রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সাল থেকেই।[১৭] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধের কথা বলেছেন অসংখ্যবার; ইংরেজ শাসনের অ-ইংরেজসুলভ আচরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে কখনো সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করতে চান নি। রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলির ক্ষেত্রে তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে বার বার, কিন্তু কোথাও ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নি, এমনকি পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবির কথাও তিনি তোলেন নি তাঁর প্রবন্ধাবলীতে। হিংসার রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; হয়তো ১৯০০ থেকে ১৯০৩-এর মধ্যে কিছুকালের জন্য হিন্দুত্ববাদকেও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন স্বাজাত্যাভিমান।[১৮] কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও বয়কট আন্দোলনকে তিনি কখনই একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে দেখেন নি, তিনি দেখেছিলেন স্বদেশ-সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে; আর 'স্বদেশী' আন্দোলনের মধ্যে খুঁজেছিলেন 'স্বদেশী সমাজ' নির্মাণের কর্মকাণ্ড।

রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চেহারাটা একটু অন্য রকম। বঙ্গভঙ্গের শতাধিক বছর পর এটা এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার যে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন প্রধানত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী। বাঙালি হিন্দু সমাজের বর্ণেতর জনগোষ্ঠী, মুসলমান সম্প্রদায় ও বিহারিরা শুধু যে এই আন্দোলনের বাইরে থেকে গিয়েছিল তাই নয়, বিরোধিতাও করেছিল। প্রধানত বাঙালি ভদ্রলোকদের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হল। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আয়োজিত হল প্রতিবাদ মিছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত 'রাখীবন্ধন' ও ঘরে ঘরে অরন্ধন। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব আগেই গৃহীত হয়েছিল ৭ অগস্ট, ১৯০৫ সালে টাউন হলে আয়োজিত বিরাট জনসভায়; তারও আগে আলোচিত হয়েছিল কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার পাতায়।

সরকারি রিপোর্ট অনুসারে, এই আন্দোলনের 'নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা ছাড়াও কংগ্রেস সমর্থক স্বদেশী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ মানুষ'। রিপোর্টে যদিও এঁদের বলা হয়েছে Calcutta leaders, বস্তুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত বাংলা প্রদেশে, বিশেষত পূর্ব বাংলায়। কৃষ্ণকুমার মিত্র যে তালিকা দিয়েছেন তাতে উল্লিখিত হয়েছে ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, কুমিল্লার উপেন্দ্রমোহন মিত্র, নোয়াখালির যশোদা ঘোষ, নাটোরের মহারাজা

জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাজশাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, রংপুরের উমেশচন্দ্র গুপ্ত, দিনাজপুরের যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কৃষ্ণনগরের প্রসন্নকুমার বসু, যশোরের যদুনাথ মজুমদার, খুলনার অমৃতলাল রাহা, আলিপুরের বিজয়চন্দ্র বসু ও মেদিনীপুরের উপেন্দ্রনাথ মাইতির নাম।[১৯] কিন্তু আন্দোলনের এই ব্যাপকতা সত্ত্বেও, বঙ্গভঙ্গ প্রায় নিঃশব্দেই সম্পন্ন হয়ে গেল। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলতেন : "... ১৯০৫ এর 'স্বদেশী', 'বয়কট', 'স্বরাজ' আর 'জাতীয় শিক্ষা'র আন্দোলন মাস দুয়েক বা বৎসর দেড়েকের ভেতরই খতম হয়ে গেছিল।"[২০]

এই আন্দোলনে জমিদারদের ভূমিকা একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন : "জমিদারি সুখনীড়ে বঙ্গভঙ্গ যেন শনি হয়ে দেখা দিল। ... যে ভয়টা তাঁদের কাউকে কাউকে বিপ্লবী সমিতির দিকে ঠেলে দিল সে হল নতুন ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা।" এবং "... চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়ু বিষয়ে যেই মাত্র তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন, তখন থেকেই বহু জমিদার আন্দোলন থেকে সংবৃত। বঙ্গভঙ্গের সহমরণে জমিদারি যাবে না বুঝে তাঁরা যে সরকারের বশংবদ তা জানিয়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন, ১৯০৭ এর মাঝামাঝি। ... রাজভক্ত জমিদারদের নিয়ে একটা ইমপীরিয়ল লীগ জন্ম নিল, তার অন্যতম সদস্য প্রাক্তন বিপ্লবী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৈমনসিংহ-সুসং-উত্তরপাড়ার সঙ্গে রাজবন্দনায় গলা মেলালেন অন্যান্য ছোটোখাটো জমিদার, রায়বাহাদুর আর খান বাহাদুর। সরকারি দলিলে তাঁদের আনুগত্য অক্ষয় হয়ে আছে।"[২১]

'স্বভাবত স্বতন্ত্র' রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য এই দলে কখনই ফেলা যাবে না। জমিদারি রক্ষার স্বার্থে তিনি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও 'স্বদেশী আন্দোলনে' যোগ দিয়েছিলেন ও পরবর্তীকালে একই কারণে আন্দোলন থেকে সরে আসেন, অথবা সন্ত্রাসের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন— এমন কোনো তথ্য আমাদের গোচরে নেই। এটা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ দয়ালু, সৎ ও উপায়কুশল জমিদারদের সমাজের, বিশেষত গ্রাম-সমাজের, স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা জমিদারি রক্ষার স্বার্থে নয়, 'স্বদেশী সমাজ' রচনার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে। ঠিক তেমনি, 'স্বদেশী' আন্দোলনের বিপ্লববাদকে তিনি কখনো সমর্থন করেন নি, সরকারি নিপীড়নের ভয়ে নয়, স্বদেশ-নির্মাণের ভ্রান্ত পথ বলে।

বস্তুত, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও 'স্বদেশী' আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয়ভাবে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, এমন মনে করার স্বপক্ষে যথেষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। এটা ঠিক যে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশি গানগুলির বিপুল জনপ্রিয়তা তখনকার 'স্বদেশী' আন্দোলনকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল। ১৯০৪ সালেই তিনি বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন "স্বদেশী সমাজ"-এর সংবিধানে, যথাক্রমে ২ ও ৭ নং অনুচ্ছেদে : "ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না", এবং "স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয়

করিব।"[২২] বছর খানেক পরে, আরো দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বয়কট' সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। প্রথমটির নাম "ব্রতধারণ"[২৩]; দ্বিতীয়টি ২৫ অগস্ট, ১৯০৫ সালে কলকাতা টাউন হলে পঠিত নিবন্ধ "অবস্থা ও ব্যবস্থা"।[২৪] সন্দেহ নেই, "অবস্থা ও ব্যবস্থা"র চড়া সুর ও বক্তব্য রবীন্দ্রনাথকে চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের অনেকখানি কাছে নিয়ে এসেছিল। এই বক্তৃতায় তিনি ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা করে 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করলেন : "যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।"[২৫] তাঁর নীতিগত অবস্থানেও একটা নতুন ও খানিকটা অপ্রত্যাশিত মাত্রা যোগ হল : "অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিবাচক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়।" অথবা; "কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল— এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ।"[২৬]

বয়কটকেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে, সমর্থন করার কারণ যদিও চরমপন্থীদের থেকে ভিন্ন : "আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে।"[২৭] অবশ্য বয়কটের সিদ্ধান্তকে নিজের মতো করে সমর্থন করলেও, তিনি মনে করিয়ে দিলেন : "দেশের কার্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না— এখন সেদিন নাই— আমি যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।"[২৮]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন : "১৯০৫ সালে লেখা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যতখানি এগিয়েছিলেন, তা যে চরমপন্থার খুবই নিকটবর্তী— সানন্দে লক্ষ করেছিলেন চরমপন্থীরা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা মনে করলেন, রবীন্দ্রনাথ পশ্চাদ্ অপসরণ করেছেন।"[২৯] পরবর্তী বিতর্কের সময়ে তাঁরা এই প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন বার বার। ২৭ মে, ১৯০৮-এর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকীয় "Abstraction and Modern Problem in India"-তে লেখা হয়েছিল : "কিছুদিন থেকে বাবু রবীন্দ্রনাথ এই সকল অভিযোগের (নূতন ন্যাশনালিস্ট দলের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে) পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, বিশেষত ন্যাশনালিস্ট দলের সেই অংশের বিরুদ্ধে যার সঙ্গে গত দুই বৎসর তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন নি।"[৩০] বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও লিখেছেন : "এই সময়ে সাধারণ লোকে রবীন্দ্রবাবুর মন্ডলী,

কংগ্রেসের গরমদল— যাহা বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দের চারি ধারে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং বৈপ্লবিক দল— এই সকলকে এক দল বলিয়া মনে করিত।"[৩১]

তবু, এইসব সাক্ষ্য সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই বঙ্গভঙ্গ-সূত্রে স্বদেশি আন্দোলনে নিজেকে নিমজ্জিত করেন নি। 'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পাল ১৯০৫-এর জুলাই মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কবির কর্মসূচি সম্পর্কে যে-সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। মনে রাখতে হবে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের এটাই প্রথম পর্ব এবং সেই সূত্রে 'স্বদেশী আন্দোলন' তখন তুঙ্গে। প্রশান্তকুমার লিখেছেন : "... ত্রিপুরা রাজ্যের সংকট নিয়ে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ দেখা যায়, বাংলাদেশের সংকট নিয়ে সেই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।"[৩১] ১৯০৫-এর ১৯ জুলাই ভারত সরকারের 'Extraordinary' গেজেটে বঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কিত বিস্তৃত প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়। ২০ জুলাই (১৯০৫) *Bengalee* পত্রিকা কালো বর্ডারে সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি মুদ্রিত করে। রবীন্দ্রনাথ যে এ-বিষয়ে অনবহিত ছিলেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, বিশেষত প্রস্তাবটির সূত্রপাত যখন ১৯০৩ সালে। অথচ বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। ৩ অগস্ট, ১৯০৫ তারিখে *Bengalee* পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল : "An address in connection with the present agitation against the Partition... will be delivered today at 5 pm at the Star Theatre by Bepin Chandra Pal. Rbindra Nath Tagore is expected to preside".[৩৩] রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন নি। শুধু তাই নয়। প্রশান্তকুমারের তথ্য অনুসারে, ৭ আগস্ট (১৯০৫) কলকাতা টাউন হলে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে বিরাট সভা হয়, সেখানেও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির উল্লেখ নেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে। এই সভায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হয়, তাতে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, জানকীনাথ ঘোষাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও রবীন্দ্রনাথের নাম গৃহীত হয় নি। এই আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন, তথ্যগুলি এই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রশান্তকুমার বলেছেন : "সম্ভবত ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে না থেকে দূর থেকে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিটি তিনি [রবীন্দ্রনাথ] বুঝে নিতে চাইছিলেন, যাতে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া যায়।"[৩৪]

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন ২৫ আগস্ট, ১৯০৫-এ, কলকাতা টাউন হলে পঠিত "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক বক্তৃতায়। এই প্রবন্ধের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ তারিখে তিনি কলকাতার উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহ ছেড়ে দীর্ঘকালের জন্য গিরিডি চলে গেলেন। সেখানে একমাসের মধ্যে তিনি রচনা করলেন ২৩টি স্বদেশি সংগীত— বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দেলনের সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। এই এক-মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মাত্র একবারই কলকাতায় এসেছিলেন, ২৭ সেপ্টেম্বর

(১৯০৫) সাবিত্রী লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম সাধন সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিহারীলাল সরকার, শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী, নিখিলনাথ রায়, অমৃতলাল বসু, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল "to consider what are our principal duties at the present regarding the indigenous goods."[৩৫] সম্ভবত এই সভাতেই রাখীবন্ধনের প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ গিরিডি ফিরে যান ২৯ সেপ্টেম্বর; তাঁকে আবার কলকাতায় আসতে হয়েছিল ৮ অক্টোবর (১৯০৫), পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিতব্য 'বিজয়া সম্মেলন' (৯ অক্টোবর) উপলক্ষে। ৩০ আশ্বিন, ১৩১২ (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) বঙ্গচ্ছেদ কার্যকর হল। সেইদিন কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল ও অরন্ধন পালিত হয়। 'রবিজীবনী'কার লিখেছেন : 'দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রতিবেদনে গঙ্গাতীরের অভূতপূর্ব জনসমাবেশের সুদীর্ঘ বর্ণনা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নাম কোথাও উল্লেখিত হতে দেখি নি। সকালে বীডন স্কোয়ারে এই উপলক্ষে একটি বড়ো সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ সেখানেও উপস্থিত ছিলেন না।"[৩৬] গঙ্গাতীরে শোভাযাত্রা, রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাস্নান ও রাখীবন্ধনের বিবরণের মূলসূত্রটি খুব সম্ভব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরোয়া'।[৩৭] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে।[৩৮] পরবর্তীকালে সজনীকান্ত দাসকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন সেখানে অবশ্য রাখীবন্ধনের কথা রয়েছে, কিন্তু গঙ্গাস্নানের উল্লেখ নেই।[৩৯] ৩০ আশ্বিন (১৬ অক্টোবর) বিকেলের জনসভায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে যে বিরাট মিছিল রবীন্দ্রনাথ রচিত 'স্বদেশী গান' গাইতে গাইতে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে উপস্থিত হয়, সেই মিছিলেও রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। এখানেই স্বল্পায়ু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি। প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন : "রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে পাঁচটি সভায় যোগ দিয়ে দুটিতে লিখিত ভাষণ পাঠ করেছেন, একটিতে সভাপতিত্ব ও মৌখিক বক্তৃতা করেছেন, একটিতে ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করে অন্যটিতে শুধু উপস্থিত থেকেছেন। অপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তুলনায় এই ভূমিকা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত।"[৪০] অবশ্য 'ভান্ডার' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাবলী ও 'স্বদেশী সঙ্গীত'-এর কথা এখানে ধরা হচ্ছে না।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মতই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বঙ্গচ্ছেদ সম্পন্ন হবার একমাস পরেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Council of Education) জন্ম হয় ১৬ নভেম্বর, ১৯০৫ সালে। অরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতায় পরিষদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান, Bengal National College and School-এর কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৪ অগস্ট, ১৯০৬-এ। (প্রথম প্রতিষ্ঠানটি Society for the Promotion of Technical Education নামে

পরিচিত।) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই এই দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী রচনায় অংশ নিয়েছেন, বাংলা বিভাগের পরিচালকের পদেও ছিলেন প্রায় তিনবছর। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের পঞ্চম ও সপ্তম মানের (standard) জন্য চারটি আদর্শ প্রশ্ন রচনা করেছিলেন তিনি। তাছাড়া, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুরোধে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে চারটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন ১৯০৭ সালে।[৪১]

কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও, প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার সমস্যা, সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য ও রাজনীতির আবহাওয়ায় স্বস্তিবোধ করেন নি রবীন্দ্রনাথ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী রচিত হবার (২ ডিসেম্বর, ১৯০৫) মাত্র দশদিন পরেই, ১২ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছিলেন :"আপনার চিঠি পড়িয়া যাহা বুঝিলাম সেইরূপই সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমাকে লইয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ? বস্তুত দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা— তাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়ের মত বৃহৎ ব্যাপারের কোনোই সুবিধা হইবে না... ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই 'লীডর' বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাট মাত্র— যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব— কিন্তু 'নেতা' হইবার দুরাশা আমার মনে নাই—"[৪২]

জাতীয় বিদ্যালয় নিয়ে উদ্দেশ্যহীন তর্ক-বিতর্কের কথা ক্ষোভের সঙ্গে স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ সালে বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও : "দেখুন, একটা System-এর মধ্যে যাঁরা মানুষ হয়ে কর্মক্ষেত্রে খুব সফলতা লাভ করেন, তাঁহারা সে System থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। গুরুদাসবাবু হাইকোর্টের জজ হলেন, কিন্তু পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি; আবার যেটা ন্যাশনাল হওয়া দরকার, সেটাকে হিন্দু করবার জন্যে চেষ্টা দেখে সফলতার আশা বড়ো করতে পারি নি। দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মর্মকথাটুকু বুঝতে না পারলে একটা মিথ্যে মেকি নিয়ে আত্মবঞ্চনা করা

ও স্বদেশের অপমান করা হয়।"[৪৩] ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অরবিন্দ পদত্যাগ করেন ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে। হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ মডারেট রাজপথে চলছিল। বিরক্ত অরবিন্দ সেই কারণেই শিক্ষা পরিষদ থেকে সরে আসেন।[৪৪] অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণেই অরবিন্দ অধ্যক্ষপদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। দেশের বাহ্যসম্পদ উন্নয়নের বা বৃত্তিশিক্ষায় অরবিন্দের উৎসাহ ছিল না।[৪৫] কারণ যাই হোক, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে জন্মলগ্ন থেকেই সমস্যাকীর্ণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই এবং এই সব কারণেই ১৯০৯ সাল থেকে জাতীয় বিদ্যালয়ের অবক্ষয় শুরু হতে থাকে।

ক্ষোভ ও বিরক্তি সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ১৯০৮ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন নি। অবশ্য শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বিদ্যালয়কে তিনি 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর অভিঘাত ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুপ্রবেশ থেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "মনে পড়ে একবার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগ হয়, তাহাতে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইংরেজের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। আদালত অবমাননার অপরাধে বিপিনবাবুর কিছুকালের জন্য জেল হয়। কবি তখন আশ্রমে ছিলেন না। ঐ ঘটনার সংবাদ আশ্রমে পৌঁছিবামাত্র বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হইল এবং আমরা ছেলেদের লইয়া একটি মিছিল করিয়া মাদল বাজাইয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে বোলপুর ও পার্শ্ববর্তী... অনেক স্থান ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে উত্তেজনার মাত্রা একটু চড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের খবর কবির কাছে যায়। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আমাদের ডাকিয়া বলেন, 'উত্তেজনার জন্য কর্তব্য কাজে শিথিলতা করা মাৎলামির সামিল। এখানকার কাজের গুরুত্বকে তোমরা উপলব্ধি করো। আমি বলে রাখছি যদি গভর্নমেন্ট আমাকেও কোনোদিন জেলে দেয় তা হলেও তোমরা উত্তেজিত না হয়ে নিজেদের কর্তব্য কাজ করে যাবে।' "[৪৬] ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আর একজন শিক্ষক ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট সহযোগী, অজিতকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন : "জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হইবার প্রস্তাব সেই সময়ে চলিতেছিল। নানা কারণে তাহা হয় নাই। হইলেও ভালো হইত কিনা সন্দেহ। কারণ, জাতীয় বিদ্যালয় যে ভাব হইতে উঠিয়াছে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমের জন্ম সে ভাব হইতে হয় নাই...।"[৪৭]

শুধু জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রভাব থেকেই নয়, সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর ঝড় থেকেও রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমকে রক্ষা করেছিলেন অনেক আশ্রমবাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অজিতকুমার লিখেছেন : "এমন সময়ে ১৩১২ সালে সমস্ত বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ...এই ভাবের বাষ্প দেশের আকাশময় ছড়াইয়াছিল... যাহাই হউক, শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বন্দরে দেশের চিত্তসমুদ্রের এই ক্ষুব্ধ ঝটিকার তরঙ্গের অভিঘাত লাগিবার কোনো কারণ ছিল না,

সাময়িকতা সেখানে বারংবার প্রতিহত হইল। ... শান্তিনিকেতন তাহাকে ফিরাইল বটে, কিন্তু শান্তিনিকেতনবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই শান্তিনিকেতনের শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সাধনা এমন করিয়া গ্রহণ করেন নাই যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে দেশকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল। অবশ্য যখনই তাঁহারা সংযমের রাশকে আলগা করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, শান্তিনিকেতনের তর্জনী তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছে। কিন্তু তখন যে তাহা অনেক সময়েই ভালো লাগে নাই এবং অনেক সময় বিরোধ জাগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।"[৪৮]

৩.

'স্বদেশী-আন্দোলন'-এর উত্তেজনা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ক্রমশই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিলেন সম্ভবত তার প্রথম আভাস পাওয়া যাবে ১৯০৬ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠিতে। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন পণ্ড হবার পর রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরে আসেন বিশ্রামের আশায়। সেখান থেকে দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখলেন : "আর কাজের কথা তুলিবেন না— আমার এখন ছুটি। প্রবন্ধ লিখিবার কথা আমার মনেও নাই— দেশ যে আমার কোনো কথার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এমন আমার ধারণা হইতেছে না।... আমি আমার অন্তরের অন্তরে জাতীয়তা স্বদেশীকতা প্রভৃতি কথার [-] হইতে মুক্ত। যখনি অবকাশ পাই তখনি নিজের এই পরিচয় আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা অনেক মিথ্যায় বিজড়িত— তাহার মধ্যে শেখা বুলির ভাগই বিস্তর। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা নাই— আমরা নূতন বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া ভ্রম করি। আমি এ সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাই না... আমি এখন লোকালোচনার অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা করি... আমার আর যশোমানে কাজ নাই। ভিড়ের মধ্যেই যদি দিন কাটাই তবে ঘরের কাজ কখন করিব। অতএব এবারে আমি সরিয়া পড়িলাম।"[৪৯]

অনেকেই 'খেয়া'-র (আষাঢ় ১৩১২ - জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) একাধিক কবিতার মধ্যে ('নিরুপায়', 'সীমা', 'বিদায়', ও 'সমাপ্তি') রাজনীতির প্রত্যক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ক্রমণের কাব্যভাষ্য খুঁজেছেন। 'খেয়া'র সূত্র ধরেই অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : "এমন সময় হঠাৎ কবি আন্দোলন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। ন্যাশনাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল উদ্যোগের অগ্রণী হইয়া, পল্লী-সমিতি স্বদেশী-সমাজ প্রভৃতি গঠনের প্রস্তাব ও পরামর্শ ও কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া, যখন সমস্ত কর্ম হইতে তিনি সরিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার পরম ভক্তগণও একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। বেশ মনে আছে, দেশের লোকের কাছে ইহার জন্য তাঁহাকে কী নিন্দাবাদ, কী বিদ্রূপই সহ্য করিতে হইয়াছিল।"[৫০]

'একেবারে অপ্রত্যাশিত' হয়তো নয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের এক বছর আগে পঠিত (২২ ও ৩১ জুলাই, ১৯০৪) রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের

বক্তব্য অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে, স্বদেশ-নির্মাণ ও স্বরাজ-সাধন বলতে নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, অরবিন্দ ঘোষের অনুগামী চরমপন্থীরা ও বোমা-বারুদে বিশ্বাসী বিপ্লবীদল যা বুঝতেন, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতেন না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বয়কট ছিল রাজনৈতিক কৌশল। অরবিন্দের কাছে স্বরাজলাভের হাতিয়ার, আর রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তির রাজনীতিকে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের কেউই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন নি। ফলে, 'স্বদেশী-আন্দোলন'এর নেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতদ্বন্দ্ব ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ১৯০৬ সাল থেকেই। কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটে নি তখনো। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন ও সাহিত্য সম্মেলন পণ্ড হবার পর, রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬-এর ২৮ এপ্রিল কলকাতায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে "দেশনায়ক" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ও পরে 'সমূহ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'সমূহ' গ্রন্থে সংকলনের সময় অবশ্য প্রবন্ধটির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বর্জিত হয়েছিল; এবং এই খণ্ডিত পাঠই রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী)তে গৃহীত হয়েছে।[৫১] "দেশনায়ক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন : "... এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশ সেবার চর্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর, হয় বিধাতা নয় গর্বমেন্ট করিবেন— এই ধারণাকেই আমরা সর্ব উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি।"[৫২] কথাটা নতুন নয়। দুবছর আগে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। "দেশনায়ক" প্রবন্ধের গুরুত্ব তার বর্জিতাংশে। সম্ভবত এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়কটের প্রকাশ্য সমালোচনা করলেন। সমালোচনার প্রাসঙ্গিক অংশটি অবশ্য পরে বর্জিত হয়েছিল। বর্জিতাংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "আমি আপনাদের কাছে স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালির মুখে 'বয়কট' শব্দের আসফালনে আমি বরাংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি, একথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। ... আজ আমরা দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয় তবে দেশের কাপড়ের এত বড়ো অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয় তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করিতেছি।"[৫৩]

এই প্রবন্ধের বর্জিতাংশেই রবীন্দ্রনাথ আরেকবার রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। দুবছর আগে, ১৯০৪ সালে, "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে রাষ্ট্রনায়কের পদে তিনি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করার প্রস্তাব করেছিলেন।[৫৪] কিছুদিন পরে অবশ্য তিক্ত, বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যাহরণ করেছিলেন।[৫৫] বস্তুত, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় একজন জননায়কের প্রয়োজন ও গুরুত্ব

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনও সংশয় প্রকাশ করেন নি। "দেশনায়ক" প্রবন্ধে (বর্জিত রচনাংশে) তিনি অধিনায়কের পদে অভিষিক্ত করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন।[৫৬] আর, মৃত্যুর দুবছর আগে, ১৯৩৯ সালের মে মাসে, মহাজাতি সদনের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র বসুকে এই পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।[৫৭]

'স্বদেশী আন্দোলন' সম্পর্কে তাঁর অবস্থানের কথা রবীন্দ্রনাথ আরেকটু স্পষ্ট করে জানালেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে, ২৯ মে, ১৯০৬ তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "আমি বিরোধ ও বিদ্বেষপরবশ জাতীয় ভাবের পক্ষপাতী নই— আমি বিধাতার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক অধিকার ও অনুরাগমূলক জাতীয় ভাবের সমর্থন করিয়া থাকি।... যদি স্বদেশপক্ষপাতের প্রতি বেশি ঝোঁক দিয়া কিছু লিখিয়া থাকি তবে এই স্বাভাবিক মমত্বের অপরাধ মার্জনা করিবেন— কিন্তু বিদেশ-বিদ্বেষকে আমি শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করি না।"[৫৮] লক্ষণীয় যে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনেও (১৬ অক্টোবর, ১৯০৬) রবীন্দ্রনাথ কোনো অংশ নেন নি; শুধু তাই নয়, কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ২২ তম অধিবেশনেও (২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৬), পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলির তুলনায়, রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা ছিল না।

এই বিচ্ছেদ স্পষ্টতর হল ১৮ জুন, ১৯০৭ সালে, চট্টগ্রামের নাগরিকদের রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত কবির ভাষণে। প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর "চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথ" নামক নিবন্ধে জানিয়েছেন : "... সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দেশের তৎকালীন সংকটজনক অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করে জানান যে প্রাচীন বা মধ্যপন্থী এবং নবীন বা উগ্রপন্থী কোনো দলই প্রকৃত কাজ করছেন না, কেন না দেশের অতি সাধারণ মানুষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে তাদের নিয়ে কাজ কোনো পক্ষই করছেন না, অথচ এটাই এখন সবচেয়ে বেশী জরুরী।"[৫৯] চট্টগ্রাম অভিভাষণের মাস দুয়েক পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "ব্যাধি ও প্রতিকার"।[৬০] প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তাতে কবির ঘনিষ্ট বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও যোগ দিয়েছিলেন। 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩১৪ সংখ্যায় তিনি "ব্যাধি ও প্রতিকার" শীর্ষক একটি নিবন্ধে লিখলেন : "দু বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রূকুটি দর্শনে আমরা এখন ঠান্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো।

আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি।... স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই।"[৬১]

এর পরের ইতিহাস সুবিদিত। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮-এ পাবনায় অনুষ্ঠিত

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ঘোষণা করলেন : "রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কংগ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।"[৬২] এই অভিভাষণেও রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে আত্মশক্তির রাজনীতির কথা ব্যাখ্যা করলেন— বয়কট এবং নরম ও উগ্রপন্থী রাজনীতির সমালোচনাও করলেন। প্রায় আড়াই মাস পর, ১৯০৮-এর ৩০ এপ্রিল, উত্তর বিহারের মজঃফরপুর শহরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমায় কিংসফোর্ডের পরিবর্তে প্রিঙ্গল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা নিহত হলেন। ২ মে, মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হল। এই আবিষ্কারের সূত্রে অরবিন্দ সহ আরও অনেকে গ্রেফ্‌তার হলেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী রাজনীতির হিংসা ও বয়কটের দৈন্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। অরবিন্দের সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ যে নানা সূত্রে অবহিত হয়েছিলেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের বিপ্লবতত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই সমর্থন ছিল না। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে, 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সূত্রে অরবিন্দের নামে গ্রেফ্‌তারি পরোওয়ানা জারি হবার (১৬ আগস্ট, ১৯০৭) আট দিন পরে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশে রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত "নমস্কার" শীর্ষক কবিতা (২৪ আগস্ট, ১৯০৭)। তার দুদিন পরে, ২৬ আগস্ট, ১৯০৭-এ, আমেরিকায় পাঠরত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানালেন : "Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানি নে। বোধ হয় জেল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না।"[৬৩] "নমস্কার" ("অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার")[৬৪] কবিতা প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন : "এ কি শুধুই কবিতা? অরবিন্দর বিপজ্জনক চরমপন্থা সম্বন্ধে কিছু না জেনেই রবীন্দ্রনাথ এই বন্দনা রচনা করেছেন? চক্র ও চক্রীদের খুব কাছাকাছি অবস্থান করেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আভাসে-ইঙ্গিতে অরবিন্দর ভূমিকা সম্বন্ধে একেবারে কিছু না জানা সম্ভব ছিল কি?"[৬৫]

মজঃফপুরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা এবং মুরারিপুকুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার ও অরবিন্দ-সহ অন্য অনেকের গ্রেফ্‌তারের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম লিখিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ৬ মে, ১৯০৮-এ লিখিত একটি চিঠিতে। নির্ঝরিণী সরকারকে তিনি লিখেছিলেন : "এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না।"[৬৬] লক্ষণীয় যে, বিপ্লবপন্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো সমর্থন না থাকলেও তরুণ বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব কখনো ঘটে নি। উনিশদিন পরে, ২৫ মে, ১৯০৮-এ চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে মিনার্ভা থিয়েটারে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন তাঁর বহুবিদিত প্রবন্ধ,

"পথ ও পাথেয়"।[৬৭] এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন : "বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়; তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ংকর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।" আর, শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির মতো তরুণদের কথা স্মরণ করে লিখলেন : "অধৈর্য বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়; ...তখন ছোটো ছোটো বালক দিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতি সুকুমার ছোটো ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পন করিয়া বসিয়াছি— এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই— তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দুঃখ আরো কত সহ্য করিতে হইবে জানি না।"[৬৮] প্রবন্ধের শেষাংশে লিখলেন : 'ইংরেজ-শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে।"[৬৯]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিপ্লববাদীরা পছন্দ করেন নি। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার ২৭ মে, ১৯০৮ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা প্রকাশিত হল। অরবিন্দ তখন কারাগারে। ৩১ মে, ১৯০৮-এ লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন যে, "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে তিনি 'পলিটিক্সকে অতিক্রম করেই কথা কবার চেষ্টা' করেছিলেন।[৭০] এই অভিপ্রায়েই কবি তাঁর বক্তব্যকে বিশদ করে বললেন আরও তিনটি প্রবন্ধে : "সমস্যা", "সদুপায়" ও "দেশহিত"।[৭১] "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ রচনার প্রায় তিন মাস পর রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধটি পাঠ করলেন ১২ আগস্ট, ১৯০৮ সালে।[৭২] এই প্রবন্ধের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হল।

হিংসার রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ নিজেকে রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। কিন্তু স্বদেশচিন্তা থেকে নয়। বস্তুত, আত্মশক্তির উদ্বোধন ও উজ্জীবনকেই স্বদেশ-নির্মাণের একমাত্র বৈধ উপায় বলে তিনি মনে করেছেন আজীবন। সম্প্রতি এই বিষয়ে এত আলোচনা হয়েছে যে নতুন কিছু বলবার বিশেষ অবকাশ নেই।[৭৩] তবু, পুনরুক্তি হলেও, এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলে নিতে চাই।

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি— একে

অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি..."[৭৪] এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পঁচিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরি-উক্ত চিন্তাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছিলেন ২২ জুলাই, ১৯০৪ সালে, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত সভায়, "স্বদেশী সমাজ" নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে।[৭৫] বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তায় এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রবন্ধেই তিনি তাঁর আজীবন স্বদেশ-ভাবনার সমস্ত জরুরি সূত্রগুলি বিবৃত করলেন। "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের একটি চুম্বক দিয়েছেন অধ্যাপক অভ্র ঘোষ। তিনি বলেছেন : "যে-কথাটি দিয়ে শুরু করা যায় তা হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝতে হলে রাষ্ট্র বা রাজনীতিকে বড়ো করে ভাবলে চলবে না। যেহেতু এ-সভ্যতায় প্রাচীনকাল থেকেই 'সমাজতন্ত্র' প্রবল অতএব সমাজজীবনের ইতিহাস অন্বেষণ করতে হবে। সমাজজীবনের ইতিহাস শুধু নয়, সমাজমনের খোঁজও তাঁদের করতে হবে। কারণ কবির সুনির্দিষ্ট মত ছিল, এক একটা দেশের প্রাণশক্তির চেহারা এক এক ধরণের রূপ পরিগ্রহ করে, জাতির প্রতিভাও সেই বিশিষ্টরূপে ফুটে ওঠে।"[৭৬]

ভারতীয় সমাজের এই বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্র দুটি। প্রথমত, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সন্ধান। দ্বিতীয়ত, এই প্রত্যয় যে 'আবহমান কাল থেকে আমাদের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হল গ্রামসমাজ'। দ্বিতীয় সূত্রটির কথা অবশ্য উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষে কর্মরত ইংরেজ রাজকর্মচারী ও ইয়োরোপিয় ভারততত্ত্ববিদেরা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের আগেই।[৭৭] এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মরণীয় প্রবন্ধে ভারতীয় গ্রামসমাজের পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করে বললেন : "য়ুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে... য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট, অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে... আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে; তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে... এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।"[৭৮]

'স্বদেশী আন্দোলন'-এর যুগে অনেকেই "স্বদেশী সমাজ"-এর প্রস্তাবকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার এক অলীক ও অবাস্তব বিকল্প হিসেবে দেখেছিলেন।[৭৯] সম্প্রতি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও "স্বদেশী সমাজ"-এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পান নি।[৮০] আমার বিশ্বাস "স্বদেশী সমাজ"-এর বক্তব্যকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের বিকল্প হিসেবে ধরে না নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ও জরুরি কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করা হয়। স্বদেশী সমাজের সংগঠন রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অধীনতার বিকল্প অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। অর্থাৎ, স্বদেশী সমাজের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা পরাধীনতার কোনো সম্পর্ক নেই। মনুষ্যত্বের আদর্শ ও পৃথিবীর ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে স্বদেশী সমাজের নির্মাণ একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত।

লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তায় রাষ্ট্র স্বীকৃত, কিন্তু সমাজতন্ত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। বার বার তিনি সমাজজীবনে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক

করেছেন। সর্বগ্রাসী অতিকায় রাষ্ট্রের পরিণাম রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ও অবসানে, ইয়োরোপের দেশগুলিতে। কিন্তু এর করাল চেহারাটি তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন অনেক আগেই— বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। সেই কারণেই তিনি স্বনির্ভর, স্বাধিকারসম্পন্ন সমাজ-জীবনের কথা— এক বেসরকারি সমাজ-জীবনের কথা— এত বিশদভাবে বলেছিলেন তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে এবং সারা জীবনব্যাপী স্বদেশ-ভাবনায়। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিস্পর্ধার নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিপূরকের। মহাত্মা গান্ধির মতো রাষ্ট্রকে অস্বীকার করেন নি রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানকেও নয়। ২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৬-এ রবীন্দ্রনাথ নির্মল-কুমারী মহলানবিশকে লিখেছিলেন : "দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে— এটার নাম দেওয়া হোক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্তা নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক।"[৮১]

শুধু তাই নয়। ইয়োরোপিয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ"-এও রয়েছে সাংগঠনিক বিধি বিধান, গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার এপিসটেমোলজিতে (epistemology) ইয়োরোপিয় এনলাইটেনমেন্টের যুক্তিবাহিত বিজ্ঞান চেতনা ও রাষ্ট্রশাস্ত্রের উত্তরাধিকার স্বীকৃত। এখানেই মহাত্মাজির সঙ্গে তাঁর অমিল। মহাত্মাজির এপিসটেমোলজিতে এনলাইটেনমেন্টের উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। কিন্তু মিলের ক্ষেত্রও অপ্রশস্ত নয়। গান্ধির মতই রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তা সমাজজীবনে সকলের সঙ্গে আত্মীয়বন্ধনে তার স্বাধীনতাকে বিপুল ও জটিল রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বব্যাপী সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। গান্ধির মতই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন গ্রাম, গড়তে চেয়েছেন সর্বস্তরের মানুষের সমবায়। বলাই বাহুল্য, এনলাইটেনমেন্টের অভিঘাতে পাশ্চাত্যে যে জটিল, ভোগসর্বস্ব, অতিকায় রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা আদৌ গ্রাহ্য নয়। কিন্তু তাই বলে তিনি যুক্তির ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি। এই ঐতিহ্যের ভিতরেই তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন 'স্বদেশী সমাজ'— ত্যাগ, সংযম ও প্রেমের মাহাত্ম্যে।

৪.

প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যদুনাথ কখনও যুক্ত হন নি— সাময়িকভাবেও নয়। প্রথমত তিনি সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন; দ্বিতীয়ত, পাটনা প্রবাসী হবার ফলে তৎকালীন বাংলাদেশের তপ্ত রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তবু, যদুনাথের স্বদেশ-ভাবনা ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একটি চিঠিতে যদুনাথকে 'কর্তাভজা'দের দলভুক্ত বলে অভিযুক্ত করেছিলেন।[৮২] অনেকে যদুনাথকে 'ইংরেজের

খয়ের খাঁ' বলেছেন।[৮৩] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ গ্রহণের সময়েও (১৯২৬) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সাময়িকীতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে লেখা হয়েছিল : "... সম্প্রতি এই নিয়োগের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ) সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বিশেষ দলাদলি ও কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলিতেছেন, অধ্যাপক সরকারকে নির্বাচিত করিয়া লাট সাহেব উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন; অপর দল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সদস্য অধ্যাপক সরকারের নিয়োগের বিরুদ্ধবাদী... আমরা বলিতে পারি যে, অধ্যাপক যদুনাথ গবর্ণমেন্টের হাতের পুতুল হইবেন বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; অধ্যাপক যদুনাথ সে প্রকৃতির লোকই নহেন... তবে একথাও বলি যে, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সিনেট যেভাবে গঠিত এবং যে প্রভাবে প্রভাবিত, তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া সফলকাম হওয়া অধ্যাপক যদুনাথ কেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী, অধিকতর কার্যকুশল ব্যক্তির পক্ষেও সম্পূর্ণ অসম্ভব..."[৮৪]

তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে যদুনাথ কখনো কিছু লেখেন নি। কিন্তু তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ও অন্য অনেকের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা কিছু সংগত অনুমান করতে পারি। মতাদর্শে তিনি যে একজন উনিশ শতকীয় উদারপন্থী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত, স্বদেশ-ভাবনায় ও রাজনীতিগত অবস্থানে যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যতটা কাছাকাছি ছিলেন, অন্য কারোর মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর ততটা নৈকট্য ছিল বলে মনে হয় না। 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর যুগে রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত পন্থাই যে সঠিক পথ ও ভারতবর্ষের মুক্তির দিশারী— সে কথা যদুনাথ বিশ্বাস করতেন এবং ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে বোধগয়ায়, ভগিনী নিবেদিতাকে সোৎসাহে সে কথা তিনি জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আগেই করেছি। পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক 'স্বদেশী'র কথা যদুনাথ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন একাধিকবার। পাটনায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে রামমোহন রায় সেমিনারি হলে ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে তিনি বলেছিলেন : "কবি মানুষের মনকে সমস্ত প্রকারে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন সফল হয় নাই, এবং তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জন্য সংকীর্ণ জাতিপ্রেম নহে, পরন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্বই তাঁহার লক্ষ্য।"[৮৫] রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর শেষ জয়ন্তী উৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত সভায় (৯ মে, ১৯৪১) সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন যদুনাথ। সেই ভাষণেও তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেন : "স্বদেশী যুগে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি এবং অরবিন্দ তখন সমভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করেন ও দেশে নবজাগরণের উদ্বোধন করেন। দেশের লোক নিজের কাজ নিজে করিতেছে না দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া রাজনীতি ছাড়িয়া গ্রাম উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সরকারি

সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীনিকেতনে নূতন প্রচেষ্টা শুরু করেন।"[৮৬] চারমাস পর, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১-এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আয়োজিত স্মরণসভায় অন্য অনেকের সঙ্গে যদুনাথও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন : "সত্য বটে বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ অচিন্তনীয় পরিশ্রমে ও বিচিত্র উপায়ে জন-গণ-মন অধিনায়কের কার্য করিতে লাগিলেন; তিনি একবার রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তখন আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে, সুরেন্দ্রনাথ রাজা হইবেন এবং আমি তাঁহার উজীর হইয়া ডান হাতে দাঁড়াইয়া দেশ উদ্ধার করিব'। কিন্তু এই দেশ উদ্ধারের ভিত্তি অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র গঠন তিনি অনেক আগেই আরম্ভ করিয়াছিলেন।"[৮৭]

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রতি যদুনাথের গভীর আস্থা ছিল। সম্রাট পঞ্চম জর্জের পঁচিশ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হবার উপলক্ষে যদুনাথ লিখেছিলেন : "... অবশেষে ১৮৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অশান্তির শেষ প্রবল সৈন্যদল দমিত হইল, ইংরেজ রাজশক্তি নিঃসংশয়রূপে নিজেকে স্থাপিত করিল, আমাদের দেশে নব্যজ্ঞান সেই যুগ হইতে ব্যাপ্তভাবে আরম্ভ হইল। আমাদের এই জাতীয় জাগরণই ব্রিটিশ শক্তির শ্রেষ্ঠ দান। তখন যে সভ্যতার বীজ বপন করা হয়, বিংশ শতাব্দীতে তাহাই বাড়িয়া নানা শাখা-পল্লবে বিস্তৃত হইয়াছে, আজ সমস্ত ভারত তাহারই নানা পুষ্প ও ফল সম্ভোগ করিতেছে।"[৮৮] ইংরেজ শাসনের প্রতি এই গভীর আস্থা কিন্তু যদুনাথের স্বদেশ-প্রীতিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। স্পষ্টতই, তাঁর স্বদেশ-চিন্তায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রাধিকার ছিল না। 'স্বদেশী' বলতে তিনি বিপ্লবপন্থা বুঝতেন না, দেশের অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে অনুনয়-বিনয়ও নয়। 'স্বদেশী' বলতে যদুনাথ বুঝতেন সততা, কঠিন কর্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত শ্রমের সাহায্যে জাতির চরিত্র গঠন। এই কারণেই তিনি স্বদেশসেবা প্রসঙ্গে বার বার রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তির উদ্বোধন'-এর কথা বলেছেন আজীবন। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক মিথ্যাচারের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে যদুনাথ বলেছিলেন : "But these will pass away, if only we are vouchsafed by a kind heaven fifty years of peace and strong and wise hands at the helm of India's Government. Then England's marvellous achievements in India will be appraised in a just balance, in peace of mind, all passions spent."[৮৯]

ভারতের স্বাধীনতালাভের শুভক্ষণে যদুনাথ লিখেছিলেন : "আজ ভারতের সম্মুখে স্বাধীনতার দরজা খোলা হইয়াছে। মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার আগে আমাদের সেইসব চিন্তার নেতাকে স্মরণ করি, যাঁহারা প্রথমে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং জীবনে তাহারই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ... যে স্বাধীনতার জন্য আজ আমরা উন্মুখ হইয়া চাহিয়া আছি, তাহা ধর্মগত গোষ্ঠীগত, স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্বাধীনতা নহে। আজকার স্বাধীন ভারত পাশ্চাত্য সভ্যতার সব ধন, নব বিজ্ঞানের সব ফলগুলি আদরে মানিয়া লইবে, সেইসব নবীন জগৎ-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র

চালাইবে— অথচ প্রাচীন আর্যভূমির এবং মধ্যযুগীয় হিন্দু-দেশের আধ্যাত্ম সম্পদ ও নৈতিক আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করিবে। আমরা জগতের কোনো লোককে, কোনো জ্ঞানকে অছুৎ বলিয়া ত্যাগ করিব না।

বর্তমান যুগের উপযোগী এই স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম দেখেন— রামমোহন রায়। ইহা প্রচার করেন— বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বিদেশে আমাদের দূত হইয়া ভারতের এই স্বাধীনতার দাবি জগৎসভার মধ্যে খাড়া করেন— বিবেকানন্দ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"[৯০]

লক্ষণীয় যে, যদুনাথের তালিকায় মহাত্মা গান্ধি বা কোনো বাঙালি অথবা অবাঙালি রাজনৈতিক নেতার নাম নেই। এমনকি সদ্যসমাপ্ত মহাযুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামও অনুপস্থিত। প্রায় দশবছর পরে, যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' বইয়ের ভূমিকায় যদুনাথ লিখেছিলেন : "আজকাল মুক্তি-সংগ্রাম বলিয়া যে চিৎকার অহরহ শোনা যাইতেছে তাহাতে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন, বক্তৃতা প্রসেশন্ এবং সৌখীন শান্তিভঙ্গ করিয়া কারাবরণ এই 'ভঙ্গিমা' (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) জিনিসটিকে পূজা করা হয়।

কিন্তু ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার প্রাণের বীজ ছিল নব্যজ্ঞান ও চরিত্রগঠন, জাতীয় ঐক্য (বর্ণভেদের বিরোধী) এবং ব্যবসায়ে আত্মনির্ভরতা (economic self-sufficiency of the nation)। এই চিরসত্য আমাদের প্রথম যুগের দেশনেতারা প্রচার করেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।"[৯১] ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অথবা স্বদেশ-চেতনা উদ্বর্তনে রাজনীতির ভূমিকাকে যদুনাথ বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। স্বাধীনতালাভের চারবছর পরেও যদুনাথ লিখেছিলেন : "The supreme problem of Free India is how to be intellectually independent of Europe. On the right solution of this question depends her prosperity, and even her very existence as a nation."[৯২]

চিন্তার মুক্তি (আমাদের মনে পড়বে হুগলি মহশিন কলেজে, ১৯২৮-৩০ সালে, দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রদত্ত বক্তৃতা 'Swaraj in Ideas'-এর কথা) ও প্রকৃষ্টরূপে ভারতীয় হয়ে ওঠার কঠিন সাধনাকেই যদুনাথ স্বদেশ-নির্মাণ বলে মনে করতেন; এবং সেই কারণেই রাজনারায়ণ বসুকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতামহ বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯০৯ সালে, রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' প্রকাশিত হবার উপলক্ষে রচিত একটি প্রবন্ধে যদুনাথ লিখেছিলেন : "To Raj Narain Bose belongs the credit of heading the reaction against this spirit [Anglomania] and preaching the gospel of nationalism to the educated public... Mr. Townshend of the Spectator or Rudyard Kipling would point the finger of scorn at his actions as another case of educated Indians 'going fantee'— as the negroes of West Africa do, when they suddenly discard civilised dress and ways and revert to their ancestral

barbarism with unmixed glee. But in our eyes there is no nobler feature in the career of Raj Narain than his passionate lifelong endeavour to diffuse among his less fortunate brethren the new thoughts and new spirit which he had got from his English teachers, — to raise the entire Indian community to his own level, instead of abjuring their society and joining the 'Ingo Bangas' who tried to pass themselves off as Englishmen and succeed only in being mistaken for third rate Eurasians. Raj Narain's everpresent thought was 'I am one of the people. How can I make them realise our national oneness'?"[১৪] বৃদ্ধবয়সে, পিতা রাজকুমার সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রেরণার কথা স্মরণ করে যদুনাথ বলেছিলেন : "সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল। আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হল কি করলে কোনো জাতি বড়ো হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়। স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য তা তিনি পুরাতন পার্টিশন আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছিলেন।"[১৫]

আমরা জানি, যদুনাথ "স্বদেশী আন্দোলন"-এর বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাস করতেন না। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে 'স্বদেশী' যুগে অরবিন্দের কর্মপন্থা ও রবীন্দ্র-অরবিন্দের মতদ্বন্দ্ব সম্পর্কে যদুনাথ ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন, এবং এই মতদ্বন্দ্বে তিনি যে রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তৎসত্ত্বেও কিংবা, সেই কারণেই, প্রাগুক্ত রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কিত প্রবন্ধে যদুনাথ অরবিন্দের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : "His [Raj Narain Bose's] serene old age was passed among his grandchildren, all gifted with high talent, such as *Aurobindo Ghose, a first-rate classical scholar*..."[১৬] (বক্ররেখ আমার)। যদুনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে। বিপ্লববাদের মুখ্য প্রবক্তা ও অবিসংবাদিত নেতা, অরবিন্দ তখন মুরারিপুকুর বাগানের বোমার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে কারান্তরালে (অরবিন্দ গ্রেফ্‌তার হয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ২ মে)। মাত্র এক মাস পরে তিনি আলিপুর জেল থেকে মুক্তি পাবেন (৩০ মে, ১৯০৯ সালে)। দেশের সেই উত্তাল অবস্থার দিনেও যদুনাথ অরবিন্দকে শুধু "a first-rate classical scholar" বলে উল্লেখ করলেন? ১৯০৫-০৬ সালে অরবিন্দ-পরিকল্পিত 'ভবানী মন্দির' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যদুনাথ যে অরবিন্দ প্রেরিত দূত, বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন নি, সে কথা তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার দশবছর পরে যদুনাথ আবার অরবিন্দ প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ *The Home and the World* (1919)-এর সমালোচনা সূত্রে। এই

সমালোচনায় যদুনাথ অত্যন্ত স্পষ্ট করে রবীন্দ্র-অরবিন্দের মতদ্বন্দ্বের উল্লেখ করলেন, এবং এই আলোচনাতেই 'স্বদেশী' প্রসঙ্গে যদুনাথের অবস্থানও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা জানি যে, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন বাংলাদেশে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল; সেই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথও অংশ নিয়েছিলেন,[১৭] এবং সেই বিতর্কের সূত্র ধরেই যদুনাথ লিখেছিলেন : "The novel of modern Indian life in the days of the great Swadeshi movement in Bengal [*The Home and the World*] is Rabindranath's reply to Arabindo Ghosh. And hereby hangs a tale.

Our wrestlers salam each other before they come to grips, and so do our poets. At the dawn of the present Nationalist agitation, Tagore published a long poetical salutation to Arabindo in his best style : *Arabindo! Rabindrer Laha Namaskar*. The inspired seer of Indian Nationalism was equally sweet on Rabindranth. And then they began to spar.

Tagore politely denounced the cult of hatred, violence and political jugglery taught by some of our Nationalist leaders. This moral canker would, he argued, kill all our country's hopes; in God's world nothing immoral, nothing false, can triumph in the end. Arabindo (or more correctly his 'pal') replied in the *Vande Mataram*, saying that such moral preaching was superficial, that a great National regeneration can be effected only by rousing a whirlwind of passions... in short, that a Rabindranath, a dreamy poet living in an etherial atmosphere far away from our real world, was a 'preacher of love and sweetness' (as Arabindo styled him) but a child in politics.... Rabindranath did not reply immediately. The moral shock that he had received forced him to leave the Swadeshi camp and seek to heal his stricken heart in the rural quiet of Shanti Niketan. But he 'In meditation dwelt, / And shaped his weapon with an edge severe.' That reply is no political tract or platform oration, but a novel— the *Home and the World* (Ghare-Baire), the moral of which he who runs may read. "[১৮]

রবীন্দ্রনাথের মতই, স্বদেশ-নির্মাণে বিপ্লবপন্থা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে যদুনাথ কখনও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু গান্ধি প্রসঙ্গে তাঁর আশ্চর্য নীরবতা আমাদের বিভ্রান্ত করে। যদুনাথ সরকার ও গোবিন্দ সখরাম সরদেশাই পত্রগুচ্ছের সম্পাদক এবং যদুনাথের অন্যতম গবেষক ছাত্র, হরিরাম গুপ্তা, জানিয়েছেন : "In all his [Jadunath's] correspondence there are only a couple of references

to Mahatma Gandhi's Quit India Movement and the Second World War... Mahatma Gandhi is assassinated, but there is not a word in his letters about it."[৯৯] অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ১৯২১-এর ১ জুন তারিখে লিখিত একটি পত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যদুনাথকে লিখেছিলেন : "গান্ধী মহাশয়ের Young India তে (April 13, 1921) তাঁহার নিম্নলিখিত কথা reported হইয়াছে : 'Pre-British period was not a period of slavery. We had some sort of Swaraj under Moghull ruler. In Akbar's time the birth of a Pratap was possible, and in Aurangzeb's time, a Shivaji would flourish. Has 150 years of British rule produced any Pratap or Shivaji?' এই উক্তিগুলিকে ঐতিহাসিক কি চক্ষে দেখেন, তাহা শিক্ষিত লোকদের জানা দরকার।"[১০০] যদুনাথ এই পত্রের কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। সম্ভবত দেন নি। ১৯২১-এর ৮ জুন রামানন্দ যদুনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবার লিখলেন : "... গান্ধির কথা সম্বন্ধে আপনার অবসর মতো কিছু লিখিলে নিরপেক্ষ লোকদের উপকার হইবে।"[১০১] যদুনাথ, রামানন্দের এই অনুরোধও রক্ষা করেন নি।

অথচ, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের মতো, যদুনাথও এক 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ' সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস করতেন।[১০২] হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাও বলেছেন বিশদ করে।[১০৩] কিন্তু যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতোই, গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। খদ্দরের রাজনীতিতেও বিশ্বাস করতেন না। দিলীপকুমার সান্যাল তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "কাহারও মন যোগাইবার জন্য স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়া যদুনাথের কোষ্ঠিতে ছিল না। *যদুনাথ খদ্দর পরিতেন না,* গলাবাজি করিয়া ইংরাজকে নানা গালিও দিতেন না। এমন অনেকে তাঁহাকে সরকারের খয়ের খাঁ বলিয়াছে যাঁহারা খয়ের খাঁ গিরি করিয়াই নিজেদের জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করে।"[১০৪] (বক্ররেখ আমার)। কিন্তু খদ্দর না পরলেও যদুনাথ আজীবন দেশি মিলের প্রস্তুত ধুতি পরেছেন। যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী জানিয়েছেন : "স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই তিনি বিলাতি ধুতি পরিধান না করিয়া স্বদেশে প্রস্তুত মোটা ধুতি ব্যবহার করিতেন।"[১০৫]

'স্বদেশী আন্দোলন'-এর সময়ে বিলেতি বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্তটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের সংলগ্ন 'সংবিধান'-এ বিদেশি বস্ত্র ও দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। স্বদেশির উত্তেজনায় বিলেতি বস্ত্র-বয়কট ঘোষিত হলেও, স্বল্পমূল্যে দেশি বস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গতি বাঙালির ছিল না। সেই দুর্দিনে যে-দুটি বাঙালি পরিচালিত কাপড়ের মিল দেশি বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব নিয়েছিল, সে-দুটি হলো 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'মোহিনী মিল'। রবীন্দ্রনাথ এদের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন ১৯৩১ সালে রচিত তাঁর "বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত" প্রবন্ধে।[১০৬] আর ১৯৪১ সালে, 'মোহিনী মিল' (১৯০৮)-এর প্রতিষ্ঠাতা, মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন যদুনাথ তাঁর "মোহিনীমোহন চক্রবর্তী-স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে।[১০৭] উভয় প্রবন্ধেই 'স্বদেশী

আন্দোলন'-এর যুগে বাংলাদেশে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের সংকটের কথা আলোচিত হয়েছে; উভয় প্রবন্ধেই যন্ত্রচালিত কারখানায় বস্ত্রের উৎপাদন-ক্ষমতার তুলনায় চরকার দৈন্যের কথা বলা হয়েছে। গান্ধিজির নাম না করে যদুনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "এখন একটা হুজুক উঠিয়াছে যে শুধু চরখায় সুতা কাট, দেশ উদ্ধার হইবে, জাতীয় দৈন্য ঘুচিবে, পূর্ণ স্বরাজ হাতে নামিয়া আসিবে। কিন্তু জাতের অর্থনীতির ইতিহাস পড়িয়া এ সম্বন্ধে একটা কথাই মনে উঠে।" এর পরে যদুনাথ দেখিয়েছেন যে চরকায় 'একঘেয়ে বৈচিত্রবিহীন, চিন্তাবিহীন' কাজ করে যে পরিধেয় পণ্য উৎপন্ন হয়, তাতে 'ঘোর আর্থিক ক্ষতি বা National Economic Waste'-এর আশঙ্কা প্রবল। প্রবন্ধের শেষাংশে যদুনাথ বলেছেন : "অথচ একটা বাঁধা গৎ শুনা যায় যে চরখার প্রচারই দেশসেবার একমাত্র উপায় এবং কলের চালকগন দেশের শত্রু, তাহারা ভারতকে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের পথে যাইতে বাধা দিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, ভারতের মতো গরীব দেশ কি National Economic Waste সহ্য করিতে পারে; আমরা কি পুরাতন তীর ধনুক হাতে লইয়া বর্তমান সভ্য জগতের মেশিনগানের সামনে দাঁড়াইতে পারি? এই যে চরখা চরখা বলিয়া অহোরাত্র হুংকার, এই যে জাতীয় সর্বব্যাধিহরণকারী মহৌষধি চরখা বলিয়া একটা বাণী মুখে প্রচারিত হয়, অথচ অন্তরে কেহ বিশ্বাস করে না, কাজেও নেতারা নিজে চরখা কাটে না, এটা ঠিক মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের একটা রূপান্তর মাত্র।

সুতরাং কেহ যেন মনে না ভাবে যে মোহিনীমোহন কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া 'মহাত্মা' শব্দের বিপরীত পদবাচ্য হইয়াছেন।"[১০৮] লক্ষণীয় যে, চরকার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সত্যের আহ্বান" ও "চরকা" প্রবন্ধে।[১০৯]

গান্ধির মতাদর্শের সঙ্গে যদুনাথের আর একটি গুরুতর বিরোধের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধি ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অহিংসার কথা বলেছিলেন; রাষ্ট্রকেও তাঁর মনে হয়েছিল 'organised violence', তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন নি। পক্ষান্তরে, যদুনাথ স্বাধীন ভারতের জন্য এক শক্তিশালী, দৃঢ়বদ্ধ রাষ্ট্রতন্ত্রের সংগঠন চেয়েছিলেন— এমন শক্তিশালী রাষ্ট্রতন্ত্র যার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সহজেই বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাতে পারবে।[১১০] কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন : "শেষ জীবনে তিনি [যদুনাথ] ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাস রচনা অর্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার পরে যদুনাথের চিন্তার বিষয় ছিল কি করিয়া এই স্বাধীনতা রক্ষা পাইতে পারে, জাতিকে কিভাবে প্রতিরক্ষা (Defence) সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, ভারতের আদর্শ সৈনিক কিভাবে শিক্ষিত করা উচিত।"[১১১]

বস্তুত, ইয়োরোপিয় এনলাইটেন্‌মেন্টের যুক্তিবাহী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ও আধুনিক 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী'তে বিশ্বাসী যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতোই, গান্ধির বিজ্ঞান-বিমুখতা এবং নৈতিক সত্য ছাড়া অন্য কোনো সত্যকে স্বীকার না করার দর্শনকে,[১১২] কখনও গ্রহণ করতে পারেন নি। হয়তো বোঝার চেষ্টাও করেন নি।

৫.

'স্বদেশী-আন্দোলন'-এর বিপ্লবপন্থাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন ভ্রান্ত পথ, অধর্মের পথ ও নিষ্ফল। কিন্তু বিপ্লবপন্থার অন্যায্যতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হলেও, বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর হৃদয়ের একটা গভীর টান ছিল; এই টান বার বার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায় ও বিপ্লবীদের জন্য সাহায্য- প্রচেষ্টায়। চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন: " 'সঞ্জীবনী' সভায় 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'র কৈশোরের দিনগুলি থেকে মৃত্যুর আড়াই মাস আগে 'পলাতক বিপ্লবী'র কাহিনী', 'বদনাম' লেখার সময় অবধি সাড়ে ছ' দশক কাল রবীন্দ্রনাথের নাম নানাসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে বিপ্লবীদের সঙ্গে"।[১১৩] জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ভূমিকা ও বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সারা জীবনব্যাপী যোগসূত্রের যে বিশদ ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ, সে বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই; সেই ইতিবৃত্ত আমার আলোচ্যও নয়। তবু, তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যৌগাযোগ ও এই বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ এবং গভীর দেশপ্রেমের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

চিন্মোহন বলেছেন : "বিপ্লবীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের দুটি দিক বরাবরই লক্ষণীয়। একদিকে তিনি তাদের অনুসৃত পন্থার কঠোর সমালোচক। অন্যদিকে আবার তাঁর লেখায় ও কাজেকর্মে অতি স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট ঐ দুঃসাহসী তরুণদের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর টান। কখনো হয়তো এক দিকে, কখনো বা অন্য দিকে ঝোঁক বেশি পড়েছে তাৎক্ষণিকতার তাগিদে।"[১১৪] বিপ্লবপন্থা ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথর মনোভাবের এই টানা-পোড়েন 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর সময়ে বিপ্লবীরাও লক্ষ করেছিলেন। এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্য উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতা এবং Parallel Government স্থাপন করিয়া দেশমুক্ত করার প্ল্যানের পর, অনুমান হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কর্মীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে একটি পত্র লিখি যে, আমরা ভারতীয় সভার সহযোগে কর্ম করিতে প্রস্তুত নই। তাঁহার সহিত সংযুক্ত ভাবে কর্ম করিতে চাই। ইহাতে তিনি তাঁহার দ্বারকানাথ ঠাকুর স্ট্রীটস্থ বাসায় আমাকে আহ্বান করেন এবং বলেন, 'আমার ভ্রাতুস্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এই বিষয়ে কথা কও' 'bringing coal to New castle!' ন্যায়। ইহাতে সখারাম বাবু, দেবব্রত বাবু এবং আমি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাড়ীতে যাই। তিনি বলিলেন, রবিবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইহারা কাহারা'। আমি সব কথা বলি, তিনি বলেন, তিনি বক্তৃতা ও সাহিত্য দ্বারা কার্য করিবেন। ইহাতে সখারাম বাবু ব্যঙ্গ করেন— 'কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবে না'।... যাহাই হউক, পরে, এই দলের কোনো এক মিটিং-এ রবিবাবু আমাদের ডাকিয়াছিলেন। আমি তখন 'ভবানী মন্দির' পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে বিহারে প্রেরিত হইয়াছিলাম। প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্নদা কবিরাজের কাছ হইতে ইহা শুনিলাম; তিনি এই আহ্বানে এই সভায় গমন করিয়া-

ছিলেন। সভায় নানাদল নানাকথা বলে, রবিবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনার কি মত' কবিরাজ জবাব দেন, 'আমরা তর্ক করিতে অক্ষম, কার্য্য দিন, করিতে প্রস্তুত'। রবিবাবু বলিলেন, 'তাহা আমি জানি'।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠাকল্পের প্রচেষ্টার সহিত বৈপ্লবিক সমিতির সহযোগিতার উদ্দম এই স্থলেই শেষ হয়।"[১১৫]

সম্ভবত, ১৯০২ সাল থেকেই, অর্থাৎ, অনুশীলন সমিতির জন্মকালেই, বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটেছিল। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, সখারাম গণেশ দেউস্কার, পি. মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত ইত্যাদি অনেকের মতো 'সমিতিকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন এবং কোনো কিছু শেখাবার উদ্দেশ্যে এসে উপদেশ বা বক্তৃতা দিয়ে সভ্যদের উৎসাহিত করতেন।'[১১৬] জীবনতারা হালদার লিখেছেন : "স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় কলিকাতাস্থ ৪৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সন্নিকটে মদন মিত্র লেনস্থিত ক্রীড়া প্রাঙ্গনে শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুব সংঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নবরচতি কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান।"[১১৭] অবশ্য যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বা জীবনতারা হালদার— এঁরা কেউই অনুশীলন সমিতি অথবা অন্য কোনো বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যুক্ত থাকার কথা বলেন নি। কিন্তু এই সংগঠনগুলির গুপ্ত পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই অনবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। মতাদর্শের অনতিক্রম্য ব্যবধান সত্ত্বেও, 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর সময়ে তরুণ বিপ্লবীদের প্রতি ইংরেজ-শাসকের দমননীতির বিরুদ্ধে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদন্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজাদের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিনব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বারবার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে : বন্দে মাতরম্।"[১১৮]

১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির আত্মত্যাগ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বিপ্লবপন্থা ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত ভাবনার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ১৯১৭ সালে লেখা তাঁর "ছোটো ও

বড়ো" প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩২৪ সংখ্যায়। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "... স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয় পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে-পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্‌' বলে। ... বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই, একথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্ টিক্ করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌— বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই।" এই উদ্ধৃতির কয়েক ছত্র পরেই রবীন্দ্রনাথ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন : "বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোন ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে... কিন্তু আমাদের ভাগ্যে একী হইল। দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়— এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা?"[১১৯]

'স্বদেশী আন্দোলন' ও তার পরবর্তী সময়ে অনুসৃত বিপ্লবপন্থা সম্পর্কে এই হল রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু উপরের উদ্ধৃতির ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই পাওয়া যাবে বিপ্লবীদের সম্পর্কে কবির ভিন্ন সাক্ষ্য। সেই অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন এইভাবে : "কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোরডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে,

ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই।"[১২০]

১৯২০-২১ এ গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি রবীন্দ্রনাথ। ১৯২১-এর ১৫ আগস্ট ইউনিভার্সিটি হলে তিনি "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে অসহযোগতত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কবি, কিন্তু সেখানেও 'স্বদেশী যুগ'-এর বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে : "সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্য তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকলদেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা... সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা।"[১২১] মৃত্যুর দুবছর আগে, ১৯৩৯ সালের মে মাসে, মহাজাতি সদনের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সেখানেও সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশনায়ক রূপে বরণ করে তিনি লিখেছিলেন : "... পরবর্তীকালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল— ভুল করে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চির-দিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসীলেপন করুক, তবু কি কালো করতে পেরেছে, তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে?"[১২২]

শুধু প্রবন্ধ ও বক্তৃতাতেই নয়, তরুণ বিপ্লবীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক টান ও আনুকূল্য বার বার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার চেষ্টায়, কারান্তরালে বিপ্লবী বন্দীদের নিগ্রহের প্রতিকারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উচ্চমহলের সঙ্গে পত্রালাপে এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিবৃতিতে। এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথকে আজীবন পুলিশের সন্দেহভাজন হয়ে থাকতে হয়েছে; এমন-কি শান্তিনিকেতনও রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পায় নি। ১৯০৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখে লিখিত একটি গোপন নথিতে তৎকালীন বাংলা পুলিশের গোপনশাখার ডি. আই. জি., এফ. সি. ডেলি (F. C. Daly) কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও

বাংলাদেশের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্টদের কতিপয় প্রখ্যাত ব্যক্তিদের উপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ব্যক্তিদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নামও ছিল : "The list of persons includes the names among others of Surendranath Banerjee, Motilal Ghose, Hirendranth Dutt, Brojendra Kumar Roy Choudhury, Gaganendranath Tagore, Rabindranath Tagore..."[১২৩] এরকম প্রচুর গোপনীয় রিপোর্টের উল্লেখ ও সেইসব নথি থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' বইতে। একটি রিপোর্টে ভারতের গোয়েন্দা প্রধান, স্যার ডেভিড পেট্রি, ১৯২৫-এর ২০ মে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লিখেছেন : "...I have no doubt whatsoever that the atmosphere of the Santiniketan— an all important matter in the case of an educational institution— is anti-British and disloyal... I can say without hesitation that I would do my utmost to dissuade any Indian parent I know, from sending his boy there, or any would-be contributor from sending as much as a single rupee towards its support."[১২৪] আর একটি দলিলে বলা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে) কালীমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, হীরালাল সেনগুপ্ত ও ফনীন্দ্রনাথ রায়ের মতো প্রাক্তন বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পেশোয়ারের কেশোরাম সবেরওয়াল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও কেদারেশ্বর গুহের মতো কুখ্যাত বিপ্লবীদেরও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কাজে আহ্বান করেছিলেন।[১২৫] অন্য আর একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, যিনি ডালহৌসি স্কোয়ার্ বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১১ সালে দ্বীপান্তরিত হন— শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন, এবং নরসিংভাই প্যাটেল, যাঁকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য বরোদা থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল— নবগঠিত বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক রূপে।[১২৬]

খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অনুশীলন সমিতির কর্মী, হীরালাল সেনগুপ্ত, ১৯০৮ সালে 'হুংকার' নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বাংলা অভিধান রচয়িতা, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "সে সময়ে স্বদেশীয় যুগের আরম্ভ। তিনি (হীরালাল সেনগুপ্ত) দেশে থেকেই স্বদেশীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন; 'হুংকার' নামে একখানি উত্তেজনাপূর্ণ বইও লিখেছিলেন। বইখানি কবির নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কবি তা জানতেন না, বই হস্তগত হলে জানতে পারলেন। 'হুকার' পড়ে কবি গ্রন্থকারকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে উত্তেজনার প্রশ্রয় ছিল না, স্থির ধীর হয়ে দেশের কাজ করারই উপদেশ ছিল। সে পত্রের ভাষা মনে নেই। তবে যা দু-এক কথা শুনেছিলাম, তার ভাবটা এইরকমই মনে হয়— ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাশা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 'হুংকার' যথাকালে গভর্নমেন্টের কানে পৌঁছল। গ্রন্থকার

বন্দী হলেন। ... কবির সেই পত্রখানি গভর্নমেন্টের হস্তগত হয়েছিল; ফলে, খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে কবির আহ্বান এল, নিরূপিত দিনে কবি কোর্টে উপস্থিত হলেন। সরকারি উকিল সেই পত্র দেখিয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, — 'এ পত্র কি আপনার লেখা?' কবি স্বীকার করলেন। গ্রন্থকারের ছয় মাস (?) কারাদন্ড হল। কবি এখানে এসে বললেন, 'হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা করে এলাম। মুক্তির পরে এখানে আসতে বলেছি।' "[১২৭] কারামুক্তির পর হীরালাল আশ্রমের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৯১০-এ; কিন্তু পুলিশের উৎপাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে সরিয়ে শিলাইদহে জমিদারির কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য হন।.

রবিজীবনীকার লিখেছেন যে, 'স্বদেশী' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হীরালাল সেন, কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায়কে শিক্ষক পদে নিয়োগ করার জন্যই বিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের বিরূপতা দেখা দিয়েছিল।[১২৮] এই বিরূপতার ফলেই তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা-অধিকর্তা একটি গোপন সারকুলার জারি করে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের অনুপযুক্ত ঘোষণা করেছিলেন। সারকুলারে বলা হয়েছিল : "[A]ny connection with this institution [Santiniketan School] in question is likely to prejudice the future of the boys who remain pupils of it after the issue of the present warning." 'বেঙ্গলি' (*Bengalee*) পত্রিকা ১৯১২-এর ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় এই গোপন নথিটি প্রকাশ করে দেয়।[১২৯] বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদ ধ্বনিত হবার ফলে সারকুলারটি অবশ্য কয়েক মাস পরেই প্রত্যাহৃত হয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন কবির জীবৎকালে কোনোদিনই পুলিশের সন্দেহের বাইরে যেতে পারে নি। 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর পরবর্তী কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে এই পুলিশি সন্দেহের কথা বলেছিলেন যদুনাথ সরকারকে। যদুনাথ লিখেছেন : "A Bengali Deputy Magistrate of some literary fame told Rabindranath Tagore that one day, when he was talking with the police officer of Jorasanko thana, on some private business, a beat constable came to the office door, saluted, and reported, '*Tin lumber daghi Rabindranath Thakur kal rat ko ghar pouncha*' (Suspect No. 3 Rabindranath Tagore arrived at his home last night.)" পাদটীকায় যদুনাথের সংযোজন : "I still remember the slight curl on the poet's lip as he told me the story, adding, 'I suppose the *dagh* still attaches to me in their dossier.' "[১৩০] এই ঘটনার উল্লেখ করে যদুনাথ মন্তব্য করেছেন : "If it was really necessary to shadow the Nobel Laureate as an enemy of the British Raj, I cannot imagine what can be a greater condemnation of British rule in India. If it was not necessary, what are we to think of the wisdom of the British Governor of Bengal?"[১৩১]

৬.

কৌতুকের বিষয় এই যে, সরকারি কর্মরত ও একান্ত নিয়মনিষ্ঠ যদুনাথ সরকারও সরকার ও পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পান নি। যদুনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের ইতিবৃত্তটি এতদিন অনুদ্ঘাটিত ছিল। সম্প্রতি Indian Council of Historical Research-এর গবেষক, পাটনাবাসী নগেন্দ্রমোহন প্রসাদ শ্রীবাস্তব বিহার পুলিশ ও সরকারি গোপন নথিপত্র থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন।[১০২] যদুনাথের ইতিবৃত্তটি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতো ঘটনাবহুল নয়; কিন্তু যদুনাথের সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে ইতিবৃত্তটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এই ইতিবৃত্তের সূত্রপাত ১৯১১ সালে। যদুনাথ তখন পাটনা কলেজে (Provincial Educational Service) ইতিহাসের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, এবং ঔরঙ্গজেবের রাজ্যকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক হিসেবে বুধমণ্ডলীতে সুবিদিত। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্মনিষ্ঠাকে সম্মানিত করার জন্য পাটনা কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, রাসেল (C. Russell), বিহার-উড়িষ্যার (বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহার ও উড়িষ্যা সযুক্ত প্রদেশ হিসেবে কাজ শুরু করে ১ এপ্রিল, ১৯১২ সাল থেকে) শিক্ষা-অধিকর্তা, জে. জি. জেনিংস (J. G. Jennings)-এর কাছে যদুনাথ সরকারকে রায় বাহাদুর অথবা রায় সাহেব খেতাবে ভূষিত করার জন্য প্রস্তাব করেন। শিক্ষা-অধিকর্তা সরকারি অনুমোদনের জন্য যদুনাথের নাম বিহার-উড়িষ্যার তৎকালীন মুখ্যসচিবের নিকট পাঠান। মুখ্যসচিব (H. Lemesurier) তাঁর মন্তব্যসহ বিষয়টি লে: গভর্নরের গোচরে আনেন। মুখ্যসচিব তাঁর ১৩ এপ্রিল, ১৯১৩-তে লিখিত মন্তব্যে বলেছিলেন : "I find that the Professor is a contributor to the 'Modern Review' which I cannot regard as a suitable organ for a Government Officer to contribute to it even only in the capacity of a reviewer of books."[১০৩] মুখ্যসচিব অবশ্য একটু ভুল করেছিলেন। মডার্ণ রিভিয়্যু পত্রিকায় মুদ্রিত যদুনাথের রচনা শুধু পুস্তক-সমালোচনাতেই সীমিত ছিল না। পত্রিকার জন্মলগ্ন (১৯০৭) থেকে ১৯১৩-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই পত্রিকায় প্রকাশিত যদুনাথের রচনার সংখ্যা প্রায় তিরিশ— প্রবন্ধ ও অনুবাদ মিলিয়ে এবং পুস্তক-সমালোচনা বাদ দিয়ে।

মডার্ন রিভ্যুয়্ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে সরকারি সম্মান-তালিকা থেকে যদুনাথের নাম প্রত্যাহৃত হয়। সরকারি সিদ্ধান্তের কিছু আভাস যদুনাথ সম্ভবত আগেই পেয়েছিলেন। 'সম্মান-তালিকা' প্রকাশিত হবার আগেই তিনি শিক্ষা-অধিকর্তাকে লিখেছিলেন : "I should not be recommended to the Government for any title of honour without first taking my consent to it. In my humble opinion the titles like Rai Bahadur or Rai Sahib are inappropriate to a scholar."[১০৪] সরকারি শাসকবর্গ যদুনাথের এই ধৃষ্টতা মার্জনা করেন নি। এই ঘটনার বছরখানেক পরে, বিহার-উড়িষ্যা সরকার Indian Educational Service-এর অধীনে পাটনা কলেজের ইতিহাস বিভাগের জন্য একটি

উচ্চতর প্রোফেসরের পদ সৃষ্টি করেন। প্রাদেশিক এডুকেশনাল সারভিসে কর্মরত যদুনাথ সরকার এই পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু যদুনাথের আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ গ্রাহ্য করেন নি; কারণ, ইংরেজ সরকার ইতিমধ্যেই আউস্টন স্মিথ (Ouston Smith) নামক জনৈক ইংরেজ-তনয়কে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করে রেখেছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে পত্র চলাচলের পর ক্ষুব্ধ ও অপমানিত যদুনাথ শিক্ষা-অধিকর্তার মাধ্যমে পাটনা কলেজ থেকে বাংলাদেশের কোনো সরকারি কলেজে বদলির আবেদন করলেন ৯ মার্চ, ১৯১৪ সালে (উল্লেখ্য যে পাটনা কলেজ তখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় ১৯১৭ সালে।) এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ টালবাহানার পর বিহার-উড়িষ্যার মুখ্যসচিব (H. Lemesurier) অবশেষে যদুনাথের আবেদন পত্র বাংলা সরকারের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠালেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বাংলার মুখ্যসচিবকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪-তে প্রেরিত একটি আধা-সরকারি চিঠিতে লিখেছিলেন : "My dear Cumming, ... refer to my official letter No. 316c. of today's date forwarding an application from Professor Jadunath Sarkar of the Patna College for transfer to the Bengal Provincial & Educational Service. The Lieutenant-Governor in Council would be extremely glad to see the Professor transferred from this to his own province, *but it would not be fair to leave your Government to deal with his application without placing it in possession of more information regarding him than it was convenient to incorporate in my official letter.*"[১০৫] (বক্ররেখ আমার)। এই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতে যদুনাথ সরকারের পাণ্ডিত্য প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশংসাবাক্য লেখার পর, মুখ্যসচিব লিখেছিলেন : "*He is at the same time a person of advanced views with strongly pronounced extremist sympathies which he has not been at much pains to disguise. The Special Branch report of the Criminal Investigation Department shows that Professor Jadunath Sarkar openly and persistently associated with students who are known to be tool of anarchist party even after charges against them had been brought to his knowledge, and with other Professors (e.g. Babu Kamakhya Nath Mitter of the Bihar National College), who are known to hold extremist views and to have expressed them freely on several occasions.*"[১০৬] (বক্ররেখ আমার) বলাই বাহুল্য, এই মন্তব্যের পর বাংলা সরকার যদুনাথের আবেদনপত্র বিবেচনা করেন নি। চারবছর পর, ১৯১৮ সালের ৭ নভেম্বর, যদুনাথ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস (Indian Educational Service)-এ উন্নীত হন।

যদুনাথ প্রসঙ্গে পুলিশের যে গোপন রিপোর্টের কথা বিহার-উড়িষ্যার মুখ্যসচিব

উপরে উদ্ধৃত পত্রে উল্লেখ করেছেন, তারও সূত্রপাত ১৯১৩ সালে। ঘটনাটির পূর্ব বৃত্তান্ত একটু বলা দরকার। ১৯০৮ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র নামে একটি তরুণ পাটনায় টি. কে. ঘোষ অ্যাকাডেমিতে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি ও প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যার সূত্রে বিহারের ছাত্র-সমাজ তখন ক্রমশ রাজনীতি সচেতন হতে আরম্ভ করেছে— অবশ্যই বাঙালি বিপ্লবীদের নেতৃত্বে। ১৯১২ সালে বঙ্কিম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাটনার বিহার ন্যাশনাল কলেজে বি.এ. ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে নাম লেখান। বিহার ন্যাশনাল কলেজ সেই সময়ে একটি বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং কিছু বিপ্লবী ছাত্র ও বিপ্লববাদে বিশ্বাসী অধ্যাপকের কর্মস্থল বলে বিহার পুলিশের সন্দেহের তালিকায় ছিল। বিপ্লববাদে বিশ্বাসী অধ্যাপক হিসেবে কামাখ্যানাথ মিত্র নামক একজন ইংরেজির শিক্ষকের নাম পুলিশের গোপন নথিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কামাখ্যানাথ পাটনায় যদুনাথ সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন বলে পরিচিত ছিলেন, এবং সম্ভবত তাঁরই অনুরোধে যদুনাথ বি.এ. ক্লাশের ছাত্র, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রকে তাঁর পুত্রদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯১৩-এর আগস্ট মাস থেকে বঙ্কিম গৃহশিক্ষক রূপে, যদুনাথের মোরাদপুরের (পাটনা) বাড়িতেই আশ্রয় নেন।

ইতিমধ্যে বঙ্কিম বেনারস অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে বঙ্কিম পাটনায় Patna Revolutionary Society স্থাপন করলেন ১৯১৩ সালের শেষের দিকে। বঙ্কিম ছাড়া, অন্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্যেরা ছিলেন পরেশনাথ সিংহ, গোবর্ধন প্রসাদ, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অখিলচন্দ্র দাসগুপ্ত।[১৩৭] এই গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি ক্রমশই ছাত্রসমাজের মধ্যে বিস্তারলাভ করতে থাকে। পুলিশের গোপন তথ্য অনুযায়ী (File No. 248 of 1914), যাঁরা এই সংস্থার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং যাঁরা এই সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, তাঁরা হলেন রামকিষেণ পাঠক, শ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায়, রঘুবীর সিং (টি. কে. ঘোষ অ্যাকাডেমির ছাত্র); সুধীরকুমার সিন্‌হা, অতুলচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, সিউকুমার সিং (বিহার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র); অমরেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র রায় (পাটনা কলেজের ছাত্র); হৃষীকেশ মজুমদার (পাটনা ল কলেজের ছাত্র), এবং অধ্যাপকদের মধ্যে কামাখ্যানাথ মিত্র ও নৃপেন্দ্রনাথ বসু (বিহার ন্যাশনাল কলেজ)।

গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে বঙ্কিমের সম্পর্কের বিষয়ে যদুনাথ অবহিত ছিলেন কি না নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯১৩-এর শেষের দিকে তিনি যে এ ব্যাপারে সবই জানতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯১৩-এর ২৪ নভেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে বোমার কারখানা আবিষ্কারের পর পাটনার গুপ্ত সমিতির কথাও প্রকাশ পায়। এই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের নাম বিহার পুলিশের গোচরে আসে। ১৯১৪-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে যদুনাথের বাসস্থানে বঙ্কিমের ঘর

তল্লাসি হয়। তল্লাশিতে অবশ্য রাজাবাজার বোমার মামলায় বঙ্কিমকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বঙ্কিমকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদুনাথ সরকারকেও এই মামলায় আলিপুর কোর্টে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল। ১৯১৪-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি আলিপুর কোর্টে এই সাক্ষ্যদান সমাপ্ত হয়।

রাজাবাজার বোমা-কারখানা মামলা থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্কিম যদুনাথের সঙ্গেই পাটনায় ফিরে আসেন এবং যদুনাথের আশ্রয়েই ছিলেন ১৯১৫-এর ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।[১৩৮] কিন্তু আলিপুর কোর্টের অনুকূল রায়ের পরেও বঙ্কিমের দুর্ভোগ শেষ হয় নি, সেই সঙ্গে যদুনাথেরও। পুলিশের চাপে বিহার ন্যাশনাল কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বঙ্কিমকে কলেজ থেকে চলে যেতে আদেশ দেন। শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে বঙ্কিমের পক্ষে অন্য কোনো কলেজে স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯১৪-এর ৬ আগস্ট, বঙ্কিম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কাছে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ. পরীক্ষা দেবার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু সেই আবেদনও মঞ্জুর হয় নি। কলেজ থেকে বিতাড়িত বঙ্কিম অবশেষে যদুনাথের সহায়তায় সাকচি (জামশেদপুর)-তে এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বেশিদিন কাজ করতে পারেন নি। কাজে যোগ দেবার চারমাসের মধ্যেই পুলিশের তাড়নায় বঙ্কিমকে সাকচি ছাড়তে হয়। ১৯১৫-এর জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি আবার যদুনাথের আশ্রয়ে পাটনায় ফিরে আসেন।[১৩৯]

ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন রাজদ্রোহীদের তালিকায় বিহার ন্যাশনাল কলেজের কামাখ্যানাথ মিত্র ও পাটনা কলেজের যদুনাথ সরকারের নাম বিশেষরূপে স্থান পেয়েছে। ১৯১৪-এর ১৬ জুলাই তারিখে লিখিত একটি গোপন পত্রে এ. আর. জি. হ্যাম্পটন (A.R.G. Hampton, D.I.G. of Police, Crime and Railways, Govt. of Bihar and Orissa) বিহার-উড়িষ্যার মুখ্যসচিবকে জানালেন : "Kamakhya Nath Mitter, Prof B. N. College, a man of anti-British views, is constantly visited by Prof. Jadu Nath Sarkar, Bankim Chandra Mitra, Surendra Nath Mitter, Jadunath Missir, Nalini Madhav and Deo Chand Punjabi who had been receiving copies of the Ghadar from Lahore and has been lent the work of Swami Vivekananda by Kamakhya Nath... Prof. Kamakhya Nath Mitter is said to be poisoning the minds of the students and others with anti-British views since sometime. *It is desirable that both he and Prof. Jadu Nath Sarkar should be removed from the Patna College.*"[১৪০] (বক্ররেখ আমার)। চিঠির শেষ বাক্যে অবশ্য তথ্যের ভুল রয়েছে। কামাখ্যানাথ মিত্র পাটনা কলেজের নয়, বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

এই চিঠির সূত্রে যদুনাথকে না হলেও কামাখ্যানাথকে বিহার ন্যাশনাল কলেজ

ছাড়তে হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকার কামাখ্যানাথকে পদত্যাগ করতে বলার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ সেনের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কামাখ্যানাথ পদত্যাগ করতে রাজি হন নি। সরকারি নথিতে বলা হল যে, পাটনার যদুনাথ সরকার এবং কলকাতার মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পরামর্শেই কামাখ্যানাথ পদত্যাগ করতে চাইছেন না।[১৮১] ফলত, বিহার-উড়িষ্যার শিক্ষা-অধিকর্তা, জেনিংস মুখ্যসচিবকে বিহার ন্যাশনাল কলেজের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিলেন।[১৮২] অবশেষে কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, হাসান ইমামের মধ্যস্থতায়, কামাখ্যানাথ জম্মুপ্রদেশে চাকরি নিয়ে পাটনা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

যদুনাথ সরকারকে অবশ্য সরাসরি পদত্যাগ করতে বলা হয় নি; কিন্তু তাঁকে যে নানাভাবে অপদস্থ ও বিড়ম্বিত করবার প্রচেষ্টা চলছিল সে-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ইতিমধ্যে, রাসবিহারী বসুর পরিকল্পিত দেশব্যাপী সামরিক অভ্যুত্থানের গোপন সংবাদ পুলিশের গোচরে আসে এবং এই সূত্রেই ১৯১৫-এর জুন মাসে বেনারসে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও নগেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। আর পাটনায় ধরা পড়েন বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, ১৯১৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে। পরের দিন, ৮ সেপ্টেম্বর, কলকাতার 'বেঙ্গলি' (*Bengalee*) নামক দৈনিকে খবরটি "Bankipore Sensation : Police Activities Renewed : Professor Sarkar's House Raided" শীর্ষকে প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারি নথিপত্রে Benaras Conspiracy Case নামে খ্যাত এই মামলায় যদুনাথকে সাক্ষ্য দিতেও ডাকা হয়েছিল বেনারসে।[১৮৩] সরকারপক্ষ অবশ্য যদুনাথের সাক্ষ্যে কোনো আস্থা প্রকাশ করেন নি। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও নগেন্দ্রনাথ দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের তিনবছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয় (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬)। মাসাধিককালপরে, সরকারের নির্দেশে বিহার-উড়িষ্যার শিক্ষা-অধিকর্তা বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যদুনাথের সম্পর্কের বিশদ বিবরণ চেয়ে অধ্যাপককে পত্র দেন ১৯১৬-এর ১৭ মার্চ। এই চিঠির উত্তরে যদুনাথের স্বহস্তে লিখিত নয় পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিবেদনের প্রতিলিপি (২০ মার্চ, ১৯১৬) শ্রী শ্রীবাস্তব তাঁর বইতে মুদ্রিত করেছেন। সেই প্রতিবেদনের কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র অথবা বিপ্লবীদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ বা কটূক্তি করেন নি যদুনাথ; বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও সবিস্তারে বলেছেন তিনি।

মনে হয়, এই ঘটনার পর থেকে যদুনাথ সম্পর্কে পুলিশের আর বিশেষ কোনো উৎসাহ ছিল না। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে উপাচার্য স্যার সুন্দরলালের অনুরোধে যদুনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। দুবছর পরে, ১৯১৯-এর জুলাই মাসে তিনি কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৩-এর অক্টোবরে আবার ফিরে আসেন পাটনা কলেজে এবং সেই থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত (১৯২৬) তিনি পাটনাতেই

বাস করেছেন।

যাঁরা যদুনাথকে চিরকাল ইংরেজের 'খয়ের খাঁ' ও রাজভক্ত প্রজা বলে ভেবে এসেছেন, উপরে বিবৃত তথ্যগুলি হয়তো তাঁদের মত পরিমার্জনে খানিকটা সাহায্য করবে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের জীবনের এই ঘটনাগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 'স্বদেশী-আন্দোলন'-এর যুগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে উদারপন্থী শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের অনেকেই বিপ্লবপন্থা ও হিংসার রাজনীতিকে দেশোদ্ধারের প্রকৃষ্ট উপায় বলে কখনো মনে করেন নি; কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা তরুণ বিপ্লবীদের গভীর দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ও মমত্ব প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নি।

সূত্রনির্দেশ

১. যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ, ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫; 'চিঠিপত্র ১৫', সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫; পৃ. ১৪৮।

২. "Jadunath Sarkar As a Historian", *Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar*, ed., B. R. Gupta, Vol. I, Punjab University, 1958; p. 58.

৩. 'যদুনাথ সরকার', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৮৯; পৃ. ৮৪।

৪. *Hindustan Standard*, Puja Number, 1941; p. 65.

৫. দ্র. N. M. P. Srivastava, *Rise of Militant Nationalism in Bihar : Sir Jadunath Sarkar with Bihar Revolutionaries*, Patna, 2004; pp. 1-70. পরবর্তী উল্লেখে, *Militant Nationalism.*

৬. 'আত্মচরিত' (১৩৪৩), কলকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৩৮১; পৃ. ২০১।

৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, বিশ্বভারতী; পৃ. ৫২৩-২৪। পরবর্তী উল্লেখে, র র, খণ্ড সংখ্যা।

৮. 'আত্মকথা' (১৯৪৭), অনুবাদ : প্রিয়রঞ্জন সেন, সাহিত্য আকাদেমী, ১৯৬৯; পৃ. ৬৭-৬৮।

৯. দ্র. প্রিয়বালা গুপ্ত, 'স্মৃতিমঞ্জুষা', কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯; পৃ. ৯।

১০. 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' (১৯২৬), কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৩; পৃ. ৬০-৬১।

১১. তদেব; পৃ. ৬৩-৬৪।

১২. তদেব; পৃ. ৬৩।

১৩. তদেব; পৃ. ১৩৩।

১৪. তদেব; পৃ. ১২৬-২৭।

১৫. উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬। পাদটীকা ১৮, পৃ. ৪৮(ক)তে উদ্ধৃত।

১৬. 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম'; পৃ. ১৭৬-৭৭।

১৭. দ্র. "ইংরেজের আতঙ্ক", 'সাধনা', পৌষ, ১৩০০। র র ১০, পৃ. ৫৩৭-৫৪১।

১৮. দ্র. বিজ্ঞলি সরকার, 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, ১৮৭৫-১৯১৯', কলকাতা, ২০০১;

পৃ. ১৪০-১৪৬।

১৯. কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'আত্মচরিত'; পৃ. ১৯১।

২০. 'বিনয়কুমার সরকারের বৈঠক', ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৪৪;পৃ. ২২৯।

২১. হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "বয়কট, বোমা ও ভদ্রলোক, ১৯০৫-১৮", 'চতুরঙ্গ', মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৫;পৃ. ৩২৬; এবং কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৬;পৃ. ২৪৮।

২২. দ্র. পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'স্বদেশী সমাজ', বিশ্বভারতী, ১৯৮৬;পৃ. ৫৯।

২৩. 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র, ১৩১২। রর ৩; পৃ. ৬২০-৬২৫।

২৪. 'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন, ১৩১২। রর ৩।পৃ. ৬০০-৬১৯।

২৫. "অবস্থা ও ব্যবস্থা", রর ৩;পৃ. ৬০৭।

২৬. তদেব;পৃ. ৬০৫-০৬।

২৭. তদেব;পৃ. ৬০৮।

২৮. তদেব;পৃ. ৬১২।

২৯. "স্বদেশী আন্দোলন : রবীন্দ্র-অরবিন্দ মতদ্বন্দ্ব", 'রাতের তারা দিনের রবি', সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, কলকাতা, ১৩৯৫;পৃ. ৪০৭।

৩০. তদেব;পৃ. ৪০৪।

৩১. 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম';পৃ. ১৫৮।

৩২. 'রবিজীবনী ৫', ১৩০৮-১৩১৪, কলকাতা, ১৪০৯; পৃ. ২৫৩।

৩৩. তদেব;পৃ. ২৫৫ তে উদ্ধৃত।

৩৪. তদেব;পৃ. ২৫৬।

৩৫. দ্র. তদেব;পৃ. ২৬১।

৩৬. তদেব;পৃ. ২৬৯।

৩৭. 'ঘরোয়া', বিশ্বভারতী, ১৩৪৮।পৃ. ১৪-১৫। দ্র: 'রবিজীবনী ৫';পৃ. ২৬৯।

৩৮. 'বাংলাদেশের ইতিহাস', খণ্ড ৪, কলকাতা, ১৩৮২;পৃ. ৩৫।

৩৯. 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', কলকাতা, ১৩৯৫। দ্র. 'রবিজীবনী ৫';পৃ. ২৬৯ এ উদ্ধৃত।

৪০. 'রবিজীবনী ৫';পৃ. ২৭৫।

৪১. যথাক্রমে, "সৌন্দর্যবোধ" (পৌষ ১৩১৩), "বিশ্বসাহিত্য" (মাঘ ১৩১৩), "সৌন্দর্য ও সাহিত্য" (বৈশাখ ১৩১৪), "সাহিত্যসৃষ্টি" (আষাঢ় ১৩১৪)।

৪২. 'চিঠিপত্র ১৫', বিশ্বভারতী, ১৯৯৫;পৃ. ৪১-৪২।

৪৩. বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'রবীন্দ্র সঙ্গ-প্রসঙ্গ', কলকাতা : প্রত্যয় প্রকাশন, ১৯৮৫। 'রবিজীবনী ৫'-এ উদ্ধৃত;পৃ. ২৭৯-৮০।

৪৪. "বোমা, বয়কট ও ভদ্রলোক, ১৯০৫-১৯১৮", 'চতুরঙ্গ', পৌষ, ১৩৭৬;পৃ. ২৫৩।

৪৫. 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭', কলকাতা (১৩৯৭), ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৯;পৃ. ৬০।

৪৬. "রবীন্দ্র স্মৃতি", 'দেশ', ২৩ শ্রাবণ, ১৩৪৯;পৃ. ৪৫-৪৬।

৪৭. 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮), বিশ্বভারতী, ১৩৯৭;পৃ. ৩৭।

৪৮. তদেব; পৃ. ৩৩।

৪৯. 'চিঠিপত্র ১০', পত্র ৩৩; পৃ. ৩৪। 'রবিজীবনী ৫'-এ উদ্ধৃত; পৃ. ৩০৪।

৫০. 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩১৮), বিশ্বভারতী ১৪০৪;পৃ. ১১৩।

৫১. "দেশনায়ক", রর ১০;পৃ. ৪৮৭-৯৬।

৫২. তদেব; পৃ. ৪৮৮।

৫৩. তদেব, 'গ্রন্থপরিচয়';পৃ. ৬৬২।

৫৪. দ্র. 'স্বদেশী সমাজ', 'পরিশিষ্ট : বর্জিত রচনাংশ";পৃ. ১১৫।

৫৫. দ্র. বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'রবীন্দ্র সঙ্গ-প্রসঙ্গ'; পৃ. ২৩।

৫৬. দ্র. 'গ্রন্থ পরিচয়', রর ১০;পৃ. ৩৫৮।

৫৭. দ্র. "দেশনায়ক" (১৯৩৯), 'কালান্তর', রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮; পৃ. ৩৮৭-৩৯০; এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ৩', বিশ্বভারতী, ১৪১১;পৃ. ১৯৬-৯৭।

৫৮. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮;পৃ: ৬১-৬২। 'রবিজীবনী ৫'-এ উদ্ধৃত; পৃ. ৩০৮।

৫৯. 'আজাদী', ১৭ কার্তিক, ১৩৯১। 'রবিজীবনী ৫'-এ উদ্ধৃত;পৃ. ৩৬৫।

৬০. 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩১৪; পৃ: ২৩৫-৪৩। 'সমূহ', পরিশিষ্ট, রর ১০;পৃ. ৬২৩-৬৩৫।

৬১. 'গ্রন্থপরিচয়', টীকা ১৫, রর ১০;পৃ. ৬৬৭।

৬২. "সভাপতির অভিভাষণ", রর ১০; পৃ. ৪৯৭।

৬৩. 'চিঠিপত্র ২', বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পত্র ২;পৃ. ৫।

৬৪. কবিতাটি বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলী'তে সংকলিত হয় নি; কিন্তু 'সঞ্চয়িতা' (১৩৩৮), বিশ্বভারতী, ১৩৬৫;পৃ. ৪৮৪-৮৬তে গৃহীত হয়েছে।

৬৫. "রবীন্দ্র-অরবিন্দ মতদ্বন্দ্ব";পৃ. ৪০৫।

৬৬. 'চিঠিপত্র ৭', পত্র ১; 'রবিজীবনী ৬';পৃ. ৫-এ উদ্ধৃত।

৬৭. দ্র. 'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ ও 'ভারতী', আষাঢ়, ১৩১৫। রর ১০; পৃ: ৪৪৫-৪৬৭।

৬৮. রর ১০;পৃ. ৪৫৩, ৪৬১।

৬৯. তদেব;পৃ. ৪৬৪।

৭০. 'অমৃত', ১৩ ফাল্গুন, ১৩৮৫;পৃ. ৯। 'রবিজীবনী ৬';পৃ. ৭-৮-এ উদ্ধৃত।

৭১. প্রবন্ধ তিনটি যথাক্রমে, 'প্রবাসী', আষাঢ়, ১৩১৫ (রর ১০; পৃ. ১৬৮-৪৮৪), 'প্রবাসী' শ্রাবণ, ১৩১৫ (রর ১০;পৃ. ৫২২-৩১), এবং 'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন, ১৩১৫ (রর ১০;পৃ. ৬৩৯-৪২)-তে প্রকাশিত।

৭২. 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১৫; রর ১২; পৃ. ২৬১-২৭৩।

৭৩. দ্র. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, New Delhi : People's Publishing House, 1973; অশীন দাশগুপ্ত, "রবীন্দ্রনাথের হারানো গ্রাম", 'প্রবন্ধ সমগ্র', কলকাতা, ২০০১; পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "রাবীন্দ্রিক নেশন কী", 'বারোমাস', শারদীয়, ২০০৩; "রাবীন্দ্রিক নেশন প্রসঙ্গে আরো দু-চার কথা", 'বারোমাস', শারদীয়, ২০০৪; বিজলি সরকার, 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, ১৮৭৫-

১৯১৯', কলকাতা ২০০১; অভ্র ঘোষ, "আত্মশক্তির রাজনীতি", 'পরিকথা', ২০০৫।

৭৪. "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত", 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬। রর ২৪; পৃ. ৪৪০-৪১।

৭৫. দ্র. 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র, ১৩১১; এবং "স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট", 'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন, ১৩১১। রর ৩; পৃ. ৫২৬-৫৫২ এবং ৫৫২-৫৫৮।

৭৬. "আত্মশক্তির রাজনীতি", 'পরিকথা', মে, ২০০৫; পৃ. ১৭।

৭৭. দ্র. Sir Charles Metcalf's description of a 'village republic' in the British Partliamentary Inquiry of 1810; Henry Summer Maine, *Village Communities in the East and West* (1871); Monier Williams, *Religious Thought and Life in India* (1889); *Karl Marx on Colonialism and Modernization*, ed. Shlo Avineri (1968); B. H. Baden- Powell, *The Indian Village Community* (1896).

৭৮. 'স্বদেশী সমাজ'; পৃ. ৩৫।

৭৯. দ্র. কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'সঞ্জীবনী', ১১ আগস্ট, ১৯০৪; পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, '"স্বদেশী সমাজ"- ব্যাধি ও চিকিৎসা', 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩১১; যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "স্বদেশী সমাজ", 'নব্যভারত', বৈশাখ, ১৩১২।

৮০. 'রাবীন্দ্রিক নেশন কী", 'প্রজা ও তন্ত্র', কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৫; পৃ. ৯৮।

৮১. 'পথে ও পথের প্রান্তে', বিশ্বভারতী, ১৪০০। রর (সুলভ সংস্করণ) ১৪, 'গ্রন্থ পরিচয়'; পৃ. ৮৪৬-৪৭-এ উদ্ধৃত।

৮২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ৭ অক্টোবর, ১৯২৮। 'চিঠিপত্র ১২', বিশ্বভারতী, ১৯৮৬; পৃ. ১১৫।

৮৩. দ্র. দিলীপকুমার সান্যালের স্মৃতিচারণ, 'জয়শ্রী : স্যার যদুনাথ শতবার্ষিকী সংখ্যা', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮। মণি বাগচি, 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা', কলকাতা, ১৯৭৫; পৃ. ৬০-এ উদ্ধৃত।

৮৪. 'ভারতবর্ষ', শ্রাবণ, ১৩৩৩; পৃ. ৩৬৭-৬৮।

৮৫. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯২২— ২১ মার্চ ১৯৩২', খণ্ড ১, সম্পাদনা : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৩; পৃ. ৪৯।

৮৬. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ২, ২২ মার্চ ১৯৩২-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১', কলকাতা, ২০০২; পৃ. ৭৭।

৮৭. তদেব ৪; কলকাতা, ১৯৯৮; পৃ. ২৬৮।

৮৮. "আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ", 'রজত-জয়ন্তী : ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯১১-৩৫)', সম্পাদক : কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলকাতা, ১৯৩৫; পৃ. ১৭।

৮৯. "How the British Lost India", an additional essay included in *India Through the Ages* (1928), Orient Longman, ed., 1979; p. 100.

৯০. "স্বাধীনতার উষায় চিন্তা" (২৫ আগস্ট, ১৯৪৭), 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৫৪; পৃ. ৫৩৭।

৯১. "ভূমিকা", 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী', কলকাতা ১৯৫৮; পৃ. [২]

৯২. "An Old Man's Last Hope", *The Modern Review*, August, 1951; p. 142.

৯৩. "Swaraj in Ideas", দ্র: *The Visva-Bharati Quarterly*, Silver Jubilee Issue, 1960; pp. 295-303.

৯৪. "Raj Narain Bose (1826-99); 'The Grandfather of Indian Nationalism'," *The Modern Review*, April, 1909; p. 314.

৯৫. "আমার জীবনের তত্ত্ব", 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩৫৫; পৃ. ২১৩।

৯৬. "Raj Narain Bose"; p. 313.

৯৭. দ্র. "গ্রন্থপরিচয়", 'রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪', বিশ্বভারতী (সুলভ সংস্করণ), ১৩৯৪; পৃ. ৭৫২-৭৫৬।

৯৮. *The Modern Review*, November, 1919; p. 543.

৯৯. "Indroduction", *Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar*; p. 14.

১০০. জেরক্স প্রতিলিপি, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, বিশ্বভারতী।

১০১. তদেব।

১০২. দ্র. "স্বাধীনতার উষায় চিন্তা"; পৃ. ৫৩৭।

১০৩. দ্র. যদুনাথ সরকার লিখিত "ভূমিকা", রেজাউল করীম, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' (১৯৪৪), কলকাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৩৬১।

১০৪. মণি বাগচী, 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা'-তে উদ্ধৃত; পৃ. ৬০।

১০৫. 'যদুনাথ সরকার', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৮৯; পৃ. ৮৪।

১০৬. 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৩৮। রর ২৭; পৃ. ৫৮৫-৯০।

১০৭. 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩৪৮।

১০৮. তদেব; পৃ. ২৭২।

১০৯. "সত্যের আহ্বান", 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩২৮। রর ২৪। "চরকা", 'সবুজপত্র', ভাদ্র, ১৩৩২। রর ২৪।

১১০. দ্র. যদুনাথ সরকার, "স্বাধীনতার উষায় চিন্তা"।

১১১. "ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার", 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬; পৃ: ১৪৫।

১১২. দ্র. Akeel Bilgrami, "Gandhi, the Philosopher", *EPW*, 27 September, 2003; p. 4164.

১১৩. 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ', বিশ্বভারতী, ১৩৯২; "ভূমিকা" (পৃ. সংখ্যা নেই)।

১১৪. তদেব; পৃ. ১৫।

১১৫. 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম'; পৃ. ১৫৭-৫৮।

১১৬. 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২; পৃ. ২২৯।

১১৭. 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' (১৯৫০), চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৭; পৃ. ৩১।

১১৮. "স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন", 'ভাণ্ডার', ফাল্গুন, ১৩১২; "গ্রন্থপরিচয়", রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ), খণ্ড ৫, বিশ্বভারতী, ১৩৯৪; পৃ. ৮২৭-এ উদ্ধৃত।

১১৯. "ছোটো ও বড়ো", 'কালান্তর', রর ২৪; পৃ. ২৮৪-২৮৬।

১২০. তদেব, পৃ. ২৮৬।

১২১. রর ২৪; পৃ. ৩২৬।

১২২. "দেশনায়ক", 'কালান্তর', পরিবর্থিত সংস্করণ, ১৩৬৭; পৃ. ৩৭৪। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' গ্রন্থে উদ্ধৃত; পৃ. ৮৮।

১২৩. *Eastern Bengal and Assam, Political Branch Confidential Circulars for 1908-09*. 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ'-এ উদ্ধৃত; পৃ. ১৮।

১২৪. তদেব; পৃ. ৫৬।

১২৫. তদেব; পৃ. ৫২।

১২৬. তদেব; পৃ. ৫৮।

১২৭. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ', বিশ্বভারতী, ১৪০৬; পৃ. ৩২।

১২৮. 'রবিজীবনী ৬', কলকাতা : আনন্দ, ১৪১১; পৃ. ২৬৯-২৭০।

১২৯. দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ'; পৃ. ২৮-২৯।

১৩০. *India Through the Ages* (1928), Orient Longman ed., 1998; pp. 97, fn 8, p. 101.

১৩১. তদেব; পৃ. ৯৭।

১৩২. *Militant Nationalism*. দ্র. টীকা ৫।

১৩৩. Political Special, G.B.O., File No. 137 of 1913. *Militant Nationalism* গ্রন্থে উদ্ধৃত; পৃ. ১২৩-২৪।

১৩৪. তদেব; পৃ. ১২৪।

১৩৫. D.O. No. 317c. Chief Secretary's Department Confidential Branch. File No. 319 of 1914. তদেব; পৃ. ১৬৯।

১৩৬. তদেব; পৃ. ১৭০।

১৩৭. Political Special, G. B. O. File No. 248 of 1914. তদেব; পৃ. ৭৪-৭৯।

১৩৮. তদেব; পৃ. ১১০।

১৩৯. দ্র. Jadunath Sarkar to Director of Public Instruction, Bihar and Orissa, 20 March, 1916. তদেব পৃ. ১১৪। যদুনাথের স্বহস্তে লিখিত এই চিঠির একটি ফ্যাকসিমিলি শ্রীএন. এম. পি শ্রীবাস্তব তাঁর *Militant Nationalism* গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন; পৃ. ১০৭-১১৫।

১৪০. D.I.G.P., Crime and Railways to Chief Secretary, G. B. O., July 16, 1914, তদেব; পৃ. ৯০।

১৪১. Political Special, G. B. O., File No 258 of 1914. তদেব; পৃ. ৯২।

১৪২. দ্র. J. G. Jennings to Chief Secretary, G. B. O., 24 October, 1914. তদেব; পৃ. ৯৩।

১৪৩. দ্র. Political Special, G. B. O., File No 748 of 1915. তদেব; পৃ. ১০০।

ইতিহাস ভাবনা : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার

মৃত্যুর দুবছর আগে, ১৯৫৬ সালে, যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই সংগ্রহে অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কাহিনী অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনা এবং বাহ্য তথ্য নির্ধারণ নাই; আছে 'philosophy of history', এবং সেইজন্য যখন (১৯১৩ সনে) আমি তাঁহার প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু" পত্রিকায় প্রকাশ করি, তখন ইহার যথার্থ নাম দিয়াছিলাম, 'My Interpretation of Indian History'। এই সংগ্রহগ্রন্থে কোন ঐতিহাসিক তথ্য অথবা ইতিহাস-শাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতি (methodology) সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যাইবে না, কিন্তু পাঠক রবীন্দ্রনাথকে আরো একান্তভাবে চিনিতে এবং কবির হৃদয় স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন। ...ইংলন্ডের বর্তমানে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রধান ঐতিহাসিক জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান বলেন যে, জাতির ক্রমবিকাশ, সামাজিক জীবনের ও ভাবের অভিব্যক্তিই একমাত্র সার ইতিহাস— যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি তাহার বাহিরের খোলা মাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের Social History লেখা এখনো বাকী আছে; সে কার্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পথ দেখাইয়া দিবে।"[১] যদুনাথের মন্তব্যের অব্যবহিত উপলক্ষ ছিল ইতিহাস প্রসঙ্গে রচিত রবীন্দ্রনাথের আঠারোটি প্রবন্ধের সংকলন 'ইতিহাস' গ্রন্থের আলোচনা। প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত এই বইটি বিশ্বভারতীর 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'-য় প্রথম প্রকাশিত হয় ২২ শ্রাবণ, ১৩৬২তে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" (১৯১১) প্রবন্ধের যদুনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে, *The Modern Review* পত্রিকার আগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায়।

যদুনাথের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনায় উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন ঐক্যের সূত্র; যদুনাথ খুঁজেছেন ইতিহাস রচনার জন্য অবিসংবাদী তথ্য। রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট ইতিহাসের দর্শন, আর যদুনাথের অন্বিষ্ট প্রধানত রাজবৃত্ত অথবা রাজনৈতিক ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলিতে 'ইতিহাস-শাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতি' সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নির্দেশ পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে, ইতিহাস-রচনার মেথডলজি নির্মাণ যদুনাথের নিরলস সাধনার বিষয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গের

বিস্তারিত আলোচনার আগে দু-একটি কথা নিবেদন করা দরকার। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের— বিশেষত যদুনাথের— ইতিহাস-সম্পর্কিত রচনার কোনো মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়— সে যোগ্যতাও আমার নেই। আমার লক্ষ্য সীমিত। ইতিহাস এবং ইতিহাসের অভিপ্রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের ধারণার অনুধাবন করাই এই প্রবন্ধের মূল প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ভাবনার উপাদানগুলি সন্নিবেশিত রয়েছে প্রধানত তাঁর 'ইতিহাস' সংকলনে। কিন্তু এই সংকলন ছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান চিন্তা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে।[২]

দ্বিতীয়ত, আমি বিশ্বাস করি যে, রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের ইতিহাস ভাবনার উদ্ভব ও বিকাশ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে উদ্‌বেজিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চেতনার পরিমণ্ডলেই ঘটেছিল। অবশ্য উভয়ের আশ্রয়-সূত্রগুলির (premises) ভিন্নতা এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কথাটির সারবত্তা স্বীকার করে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু যদুনাথ প্রসঙ্গে কথাটি উত্থাপিত হলেই আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। সম্ভবত এর কারণ যদুনাথের ইংরেজ-প্রীতি সম্পর্কে বহুপ্রচলিত ও প্রচারিত কতগুলি কাল্পনিক ধারণা। অথচ, যদুনাথের ইতিহাস সাধনার লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে একটু সচেতন হলেই বোঝা যায় যে উনিশ শতকের ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ভারত-নির্মাণে তিনি আস্থা রাখতে পারেন নি; মুঘল যুগ সম্পর্কে তাঁর বিপুল ও মৌল গবেষণাই এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ। তিনি নিজেই বলেছেন : "... ১৮৫৭-৫৯ সনের সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হইবামাত্র স্বদেশপ্রেম জন্মিয়া এক নব অমৃতধারায় ভারতীয় শিক্ষিত জনগণের হৃদয় ভরিয়া দিল; আমরা বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পাইলাম। মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সনে।"[৩] রবীন্দ্রনাথের নয় বছরের কনিষ্ঠ যদুনাথও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের স্বদেশচিন্তার অভিঘাত থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। যদিও দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও তথ্যনিষ্ঠ যদুনাথ— এঁদের দুজনের পক্ষেই তৎকালীন জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা সম্ভব হয় নি।

১.

১৮৮০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন : "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?"[৪] এই উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে মূলত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার কথাই ভাবছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। জাতীয়তাবাদী চেতনার

উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনাকালের আগেও অবশ্য বাংলায় রচিত বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের অভাব ছিল না। কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই ছিল স্কুল-পাঠ্য টেক্সট ও প্রধানত মার্শম্যান (John Clark Marshman)-এর *History of India* (1831), অথবা *Brief Survey of Hisotry* (1833) অথবা *Outline of the History of Bengal* (1839)-এর সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। স্বভাবতই এই বইগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল 'বালপাঠ্য', এবং প্রকৃত ইতিহাসের বিকৃতি। এই তালিকার মধ্যে অবশ্যই মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার রচিত 'রাজাবলি' (১৮০৮) বইটি ধরা হচ্ছে না। 'রাজাবলি' ইতিহাস শিক্ষার পাঠ্য হিসেবে রচিতও হয় নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা ভাষা শিক্ষার টেক্সট হিসেবেই পরিকল্পিত হয়েছিল বইটি। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন জানিয়েছেন যে, ইতিহাসের পাঠ্য হিসেবেও 'রাজাবলি' ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত সুপ্রচলিত ছিল।[৫]

প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়েছিল 'সিপাহি বিদ্রোহ'-এর পরে। ১৮৫৮ থেকে ১৯১২-এর মধ্যে রচিত অন্তত ষোলোটি মুদ্রিত বইয়ের সন্ধান দিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন ('বাংলার ইতিহাস সাধনা') ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "ইতিহাসের উত্তরাধিকার" প্রবন্ধে।[৬] এই তালিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত ও রমাপ্রসাদ চন্দ-এর মতো খ্যাতনামা ঐতিহাসিকেরা যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন স্বল্পখ্যাত লেখকেরাও।[৭] শেষোক্তদের অধিকাংশই অবশ্য লিখেছেন স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসের বই। এঁদের একজনের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রও। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাথমিক বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখেছিলেন : "গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই... ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"[৮] রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাথমিক বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস— বঙ্কিমের এই মূল্যায়ন অবশ্য তর্কসাপেক্ষ; কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, 'সিপাহি বিদ্রোহ'-পরবর্তী বেশ কয়েক দশক ধরে এই ছাত্রপাঠ্য বইগুলি বাংলাদেশের শহর ও মফস্বলে বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে সাহায্য করেছিল।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "তৎকালীন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ইতিহাস লেখকদের মধ্যে বঙ্কিম মোটেই ব্যতিক্রম ছিলেন না" এবং এইসব লেখকদের ইতিহাসবোধও ছিল বঙ্কিমের অনুরূপ।[৯] কি সেই ইতিহাসবোধ? পার্থ বেশ কয়েকটি অনুধাবনযোগ্য সূত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, এই ইতিহাসবোধের কাঠামো সম্পূর্ণ আধুনিক ও ইয়োরোপিয়। প্রাক্-উপনিবেশিক ইতিহাসবোধের কালচেতনা এখানে স্পষ্টত অনুপস্থিত; অর্থাৎ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো কোনো 'পুরাণেতিহাস' এঁরা লিখছেন না। ইতিহাস রচনায় এঁরা অনুসরণ করেছিলেন আঠারো শতকের ইয়োরোপে সংগঠিত বৈজ্ঞানিক প্রকরণ; এঁদের কালচেতনা ঐতিহাসিক। দ্বিতীয়ত, এঁরা সকলেই অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ভারততত্ত্ববিদদের গবেষণার ফসল, প্রাচীন ভারতীয় আর্য সভ্যতার

গৌরবকে তাঁদের ইতিহাস চেতনার প্রধান স্বীকার্য বলে মনে করেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও প্রাচীন ভারতীয় আর্য অথবা হিন্দু সভ্যতার শৌর্য-বীর্যের অনুসন্ধান কিভাবে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং ইতিহাসের পাতা ছাপিয়ে উনিশশতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান থিম হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের 'উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস' নামক গ্রন্থে।[১০]

তৃতীয়ত, ইংরেজ ভারততত্ত্ববিদদের আবিষ্কারকে স্বাগত জানালেও আমাদের আলোচ্য বাঙালি ঐতিহাসিকেরা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। চতুর্থত, ইংরেজ *ঐতিহাসিকদের* রচিত বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে অনাস্থা থাকলেও, এঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ইংরেজবর্ণিত পর্ব বিভাগকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন— অবশ্যই নিজেদের মতো করে সাজিয়ে। ফলত, এঁদের সকলের রচনাতেই পাওয়া যাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের তিনটি পর্ব : প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার স্বর্ণযুগ, মুসলমান শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ ও ইংরেজ শাসনের আলোকদীপ্ত আধুনিক যুগ। পঞ্চমত, আলোচ্য ঐতিহাসিকদের সকলেই ভারতের প্রাচীন গৌরবের অবলুপ্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন মুসলমান শাসনকালকে। ঔপনিবেশিক পটভূমিতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় শত্রু-সন্ধান অবশ্য একটি স্বীকৃত নীতি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি ইতিহাস-রচয়িতারা এই শত্রু-সন্ধানের লক্ষ্য হিসেবে সমসাময়িক ইংরেজ শাসনকে চিহ্নিত করেন নি, করেছিলেন ভূতপূর্ব মুসলমান শাসনপর্বকে।

২.

সন্দেহ নেই উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাঙালির জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চেতনার উদ্‌বোধনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৪-এর মধ্যে লিখিত অন্তত ছয়টি[১১] প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বলতে বঙ্কিম অবশ্যই রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝতেন, যদিও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-কে তাঁর মনে হয়েছিল 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস'। শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' (১৮৭৫)-কে বঙ্কিম 'ঘটকের কুলজী' ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন নি। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন যে, 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের উত্তরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন : "বঙ্কিম, কেবল রাজারাজড়ার কথা আর লড়াই-ঝগড়ার কথা লইয়াই একটা দেশের ইতিহাস নয়, সমাজ-গঠন, সামাজিক উন্নতি-অবনতির কারণ, শ্রেণীবিভাগও ইতিহাসের একটা প্রধান অঙ্গ। যে শ্রেণীবিভাগ পাঁচ সাত শত বছর ধরিয়া আমাদের দেশে রহিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিলে বাঙ্গালার

ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"[১২]

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য নিয়ে যথেষ্ট বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অমি শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিতুলনার জন্য ১৮৭৯-তে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের "ভারত-কলঙ্ক" নামক প্রবন্ধটির একটি চুম্বক উপস্থাপিত করতে চাই।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ইয়োরোপিয় পদ্ধতিতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের ও ঐতিহাসিক সময়ের আলোচনা করেছেন। পুরাণকে বঙ্কিম পুরাবৃত্তের মর্যাদা দেন নি। তিনি বলেছেন : ১. ভারতবর্ষীয়রা পরাধীন, কারণ তারা হীনবল; প্রাচীন ভারতবাসীরা কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতা হারাবার আগে বিশেষ বলশালী ছিল। ২. যেহেতু প্রাচীন ভারতবাসীদের কোনো ইতিহাস নেই, তাই তাদের শ্লাঘনীয় সমর-কীর্তিও লোপ পেয়েছে। ৩. মুসলমান বা ইংরেজদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস নির্ভরযোগ্য নয়; অতএব তাদের বর্ণিত ভারতীয়দের কাপুরুষতার বিবরণ অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস করা উচিত। মুসলমানেরা তিনশ বছর চেষ্টা করেও সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষ অধিকার করতে পারে নি। হিন্দুদের ধর্মানুরাগ নয়, তাদের রণনৈপুণ্যই এই মুসলমান-শাসন প্রতিরোধের কারণ। তাহলে হিন্দুরা সাত শত বছর ধরে পরাজিত ও পদানত হয়ে রয়েছে কেন? ৪. বঙ্কিম বলছেন যে, মুসলমানদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কালে হিন্দুর স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে। 'খ্রীষ্টীয় অব্দে পূর্বাগত হিন্দুরা' অধিকতর বলবান ছিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দুদের এই বাহুবল ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল (লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমের ভাষ্যে হিন্দু ও ভারতবর্ষীয় কথা দুটি সমার্থক)। হিন্দুদের সমৃদ্ধির অবসানের তিনটি কারণ বঙ্কিম দর্শিয়েছেন : ক. হিন্দুর ইতিবৃত্ত নেই। 'আপনার গুণগান আপনি না গাইলে কে গায়?' খ. যে-সব জাতি পররাজ্য অধিকার করে তারাই অপর জাতির কাছে 'রণপণ্ডিত' বলে স্বীকৃতি পায়। যারা শুধুই আত্মরক্ষায় সন্তুষ্ট এবং পররাজ্যলোভী নয়, তারা বীর বলে গণ্য হয় না। ভারতবাসীরা নির্লোভ না হলেও, পররাজ্যগ্রাসে তৎপর হয় নি। গ. হিন্দুরা বহুদিন ধরে পরাধীন; পরাধীন জাতির বীর্যগাথা লেখা হয় না। ৫. হিন্দুজাতির দীর্ঘ পরাধীনতার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন বঙ্কিম : ক. আধুনিক ভারতবাসী স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-রহিত; রাষ্ট্র ও সমাজকে তারা স্বতন্ত্র বলে মনে করে। সুশাসন করলে স্বজাতীয়, বা পরজাতীয় দুই রাজাই সমান। সমাজ রাজবৃত্তের দ্বারা পরিচালিত হয় না। গ্রিকরা স্বাধীনতাপ্রিয়, হিন্দুরা স্বাধীনতাভিলাষী নয়; তারা 'শান্তিসুখের অভিলাষী'। বঙ্কিম একে বলেছেন 'জাতিগত স্বভাববৈচিত্রের ফল', স্বতন্ত্রে অনাস্থা 'হিন্দুদিগের চিরস্বভাব'। হিন্দু সমাজের ইতিহাস স্ব-তন্ত্রে অনাস্থার ইতিহাস, রাজ্যবিস্তারে নিশ্চেষ্টতার ইতিহাস। তিনহাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সমাজ তাতে অংশ নেয় নি। খ. এর কারণ, সমাজমধ্যে 'জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব'। বঙ্কিম বলেছেন, 'প্রাচীন ভারতবর্ষে, বৈদিক যুগে 'জাতিপ্রতিষ্ঠা... আর্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল।' তারপর সমাজভেদ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর ঐক্য

লুপ্ত হল। সমাজভেদ, ধর্মভেদ, ভাষার ভেদ, জাতিভেদ— ইত্যাদির ফলে ভারতবর্ষে এক মহাজাতি গড়ে ওঠে নি। মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু ঐক্য জন্মে নি। ৬. পরিশেষে বঙ্কিম ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের দুটি সুফল ও শিক্ষার কথা বলেছেন— স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা; 'ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।'[১৩]

৩.

প্রাচীন ভারতবাসী অথবা বাঙালির বাহুবলের যে ইতিবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলিতে বলেছেন, সেই শৌর্যগাথাই যে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে আমাদের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় প্রধান আশ্রয়-বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, সে-কথা আমরা সকলেই জানি। শুধু জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনাতেই নয়। সদ্যজাত উপন্যাস সাহিত্যও এই অতীত গৌরবের স্মৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে'— আমাদের সুপরিচিত। উক্ত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে রচিত বাঙালির শৌর্য-বীর্য-সম্বলিত কিশোরপাঠ্য দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনিগুলিও এই অতীত-গৌরব চেতনার সম্প্রসারণ বলে ধরা যেতে পারে।[১৪]

কিন্তু যে-কথাটা আমরা প্রায়শই মনে রাখি না সেটা এই যে, ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের দুর্গতি ও দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার সম্পদ বলে ঘোষণা করলেন মাত্র দুই দশক পরেই। মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কিত ধারণা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার মূলধারার অনুগামী নয়। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ইতিহাস-চেতনাকে জাতীয়তাবাদী পরিকাঠামোর মধ্যেই বিস্তারিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসবো। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ, এমন-কি ঐশ্বর্যকে পর্যন্ত খর্ব করিয়া মঙ্গলকেই যেভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন আর কোথাও হয় নাই। অন্য-দেশে ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব-অর্জনের জন্য, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে সর্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে; কারণ, স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা ইংরাজের ছাত্র আজ বলিতেছি, এই প্রতিযোগিতা এই হানাহানির অভাবে আমাদের আজ দুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলন্ড, ফ্রান্স, জর্মানি, রাশিয়া, আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে... তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতা প্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনমতেই প্রবৃত্তি হয় না।"[১৫] এই প্রবন্ধ রচনার দুবছর পরে রবীন্দ্রনাথ আবার

বললেন : "ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই, সর্বত্র শান্তি সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।"[১৬]

এই উদ্ধৃতি দুটি বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার পার্থক্যটি স্পষ্ট করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বলতে বুঝতেন তথ্য-সম্বলিত রাজবৃত্ত নয়, তত্ত্বাশ্রয়ী লোকবৃত্ত, সামাজিক ও সমাজমনের ইতিবৃত্ত— সংক্ষেপে, ধর্মসাধনার ইতিহাস। "যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মতন্ত্রমূলক সেইজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস কুয়াশার মতো আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে।"[১৭] ১৯০১ সালেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই 'কুয়াশাবৃত সত্য'কে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলেন : "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে-উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[১৮] ছাব্বিশ বছর পরে, ১৯২৭-এর জুলাই মাসে পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ-অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্‌কালে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদায় সংবর্ধনার অভিভাষণে একই কথা বলেছিলেন : "ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা; সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসর পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি ... বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।"[১৯]

বস্তুত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আজীবন আলোচিত প্রতিপাদ্যগুলি আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি : ১. ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক ও ধর্মমূলক, রাজনৈতিক নয়। ২. প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষ সাধনার বিষয় থাকে। ৩. সামাজিক ও ধর্মীয় বিরোধের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধনাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলধারা এবং প্রধান সাধনা। এই প্রতিপাদ্যগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে মুখ্যত তিনটি প্রবন্ধে এবং গৌণত অন্যান্য অসংখ্য রচনায়। তিনটি প্রধান প্রবন্ধ হল। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৯০২), "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" (১৯১১) এবং "ভারত-ইতিহাস-চর্চা" (১৯২০)। ১৯১১ সালে রচিত "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান আকররূপে ধরে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইতিহাসের প্রথম যুগে আর্য ও অনার্য জাতির সংঘর্ষ ক্রমশ একটি

সমন্বয়ে পরিস্ফুট হয়েছিল। মহাভারতে ব্যাসদেব সমগ্র ভারতের ইতিহাস ও পুরাণকে একত্রে গ্রথিত করে নানা বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে আর্যজাতির ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ঐক্য, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে গঠিত সত্য। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যা আমরা দেখতে পাই তা হল বিরোধী শক্তির সংঘাতের মধ্যে মিলন ও ঐক্যের প্রচেষ্টা— মহাজাতি গঠনের অভিপ্রায় : "জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহেই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা, কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে— ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে— নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না; অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গন্তব্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখাইয়াছিল।"[20]

লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের আবহমান ইতিহাসের কেন্দ্রস্থিত একটি মূল সত্যের কথা বলছেন; একই সঙ্গে তিনি এই সত্যকে ইতিহাসের অভিপ্রায় বলেও বর্ণনা করছেন। এমনও বলা যায় যে, ইতিহাসের সত্য ও ইতিহাসের অভিপ্রায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনো পার্থক্য করছেন না। প্রয়াত অধ্যাপক হিতেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছিলেন: "ইতিহাসের তত্ত্বগত প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন দুজন প্রখ্যাত ফরাসি ইতিহাসবিদের কাছ থেকে।" এই দুজন ইতিহাসবিদ হলেন ফ্রাঁসোয়া গিজো (Francois Guizot) ও এর্নেস্ত রেনঁ (Ernest Renan)। হিতেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাষায়, "ইউরোপীয় সভ্যতা যে ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথে চলেছে গিজোর এই মতও রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস সম্পর্কীয় চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে।"[22] বস্তুত, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিধাতা-নির্দিষ্ট অভিপ্রায় এবং সামঞ্জস্য ও ঐক্যের তত্ত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তিহীনভাবে বলেছেন তাঁর অসংখ্য রচনায় ১৯০৪ সাল থেকেই। "স্বদেশী সমাজ" নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : "বহু-র মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন— ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। ... আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটিকে যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব।"[23]

ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন ও রাজ্যশাসনকেও রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট অভিপ্রায় বলে মনে করতেন। "স্বদেশী সমাজ" রচনার ছয় মাস পরেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন : "বিধাতার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।"[24] এই অভিমতকে আরও বিশদ করলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৯০৮-এ লিখিত "পূর্ব ও পশ্চিম" নামক প্রবন্ধে : "সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ

আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার বাহির হইতে হইবে... আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চয় করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।"[25] পঁচিশ বছর পরে রচিত "কালান্তর" (১৯৩৩) শীর্ষক প্রবন্ধেও ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একই কথা বলেছিলেন।[26]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে বিধাতার অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এক মহাজাতি গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে : "ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ-নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে— ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।"[27]

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের সত্য ও অভিপ্রায়কে ভিন্ন করে দেখেন নি। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চর্চা তথ্য-নির্ভর নয়, ভাষ্য-নির্ভর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি যা খুঁজছিলেন তা তথ্যের যাথার্থ্য নয়; তিনি খুঁজছিলেন ইতিহাসের দর্শন এবং একেই তিনি বলেছেন ভারত-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্য ও অভিপ্রায়। কিন্তু তথ্যের সাক্ষ্য ভিন্ন ঐতিহাসিক ইতিহাসের সত্যে উপনীত হবেন কি ভাবে? তথ্যের সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতাই বা কতখানি, বিশেষত নিরঞ্জন তথ্যের ধারণাটাই যখন তর্কসাপেক্ষ?

ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের এই বিতর্ক সমস্ত উনবিংশ শতক জুড়ে ইয়োরোপের ইতিহাসবিদদের ভাবিয়ে ছিল, বিশেষত কান্টের (Immanuel Kant) *Critique of Pure Reason* (1781)-এর প্রকাশের পর। সম্প্রতি একজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন: "Since Kant all theory of history had to come to terms with the theories of knowledge advanced by him and his followers. The idea that the perceptions of the senses belong to the perceiving 'subject' and are caused by something called 'the thing in itself' lent itself readily to historical application. Thus this idea gave rise to a lengthy struggle over the possibility of attaining an ideal of 'objectivity' and to clarify history as 'the real past' and not only as an 'object' depending on the perceptions of the 'subject'. The investigating 'subject' was assumed

to set its mark on the result, and objectivity came to be an ideal out of reach."[২৮]

এই বিতর্কের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান অবশ্য আজও পাওয়া যায় নি। অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কিত এই অনিশ্চয়তার জন্যই উনবিংশ শতকের ইয়োরোপে ইতিহাসবিদেরা ইতিহাস-রচনার মেথডলজির দিকে যতটা ঝুঁকে-ছিলেন, ইতিহাসের তত্ত্বের দিকে ততটা নয়। মেথডলজির উৎকর্ষতার মধ্যেই তাঁরা খুঁজেছিলেন ইতিহাসের সত্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা। আধুনিক ইতিহাস-চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাঙ্কে (Leopold von Ranke) ইতিহাসের সত্য বলতে বুঝেছিলেন নানা সূত্র থেকে আহৃত সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত তথ্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে অনুরূপিতা (correspondence)। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ, *History of the Latin and Germanic Nations from 1414 - 1514* (1824)-এর ভূমিকায় রাঙ্কে বলেছিলেন : "To history has been assigned the office of judging the past, of instructing the present for the benefit of the future ages. To such high offices this work does not aspire. It only wants to show what actually happened ... The strict presentation of the facts, contingent and unattractive though they may be, is undoubtedly the superior law."[২৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উনিশ শতকের ইতিহাস-চর্চায় এটাই একমাত্র অবস্থান ছিল না।

তথ্য ও সত্যের এই ইয়োরোপিয় বিতর্ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতদূর অবহিত ছিলেন আমরা জানি না। ফরাসি ইতিহাসতত্ত্ববিদ গিজো ও রেনাঁর রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ১৯০১ সালে রচিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি গিজোর উল্লেখ করেছেন এবং সম্ভবত গিজোর রচনাতেই তিনি ইতিহাসতত্ত্বের বিকল্প অবস্থানের সন্ধান পেয়েছিলেন।[৩০] অবশ্য ১৮৯৮ সালে ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মত ব্যক্ত করেছিলেন সেখানে ইতিহাসের নৈতিক বিধান অথবা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের কোনো প্রসঙ্গ ছিল না; সেখানে বরং তথ্য ও ব্যাখ্যার অনুরূপিতাকেই তিনি সমর্থন করেছিলেন : "... ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে, বাস্তব ঘটনার সহিত মানব-মন মিশ্রিত হইয়া, যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য।"[৩১] কিন্তু ১৯১১ তে লিখিত "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যময়। রামায়ণে আর্য-অনার্য সভ্যতার যোগবন্ধনের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আর্য-অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে-একটি মহা-উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বমিত্র ও রামচন্দ্র। ... এই জনক বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, *কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী।*"[৩২] (বক্ররেখ আমার)। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'ভাবগত'

সত্যের তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের অবদান। উল্লেখিত প্রবন্ধের একাধিক অনুচ্ছেদে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তিনটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করছি : ক. "এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব, কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।" (পৃ. ২৮) খ. "আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা-অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে। কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এই সমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্য-সমাজের ইতিহাসের সত্যস্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত-সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট, কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসংগত কিছু বা পরস্পর বিরুদ্ধ— মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।" (পৃ. ৪৩) গ. "আমরা এই যে-মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ মনে না করেন— ইহা ভাবগত যুগ— অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না।" (পৃ. ৪৭)

উদ্ধৃতি তিনটিতে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলতে চাইছেন সেটি এইরকম— ইতিহাসের সত্য কোনো নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ কালসীমায় আবদ্ধ থাকে না; এই সত্যকে পাওয়া যাবে আপাত বিচ্ছিন্ন আখ্যানগুচ্ছের আসঞ্জনে (coherence), সংগতিপূর্ণ ভাষ্যে। স্পষ্টতই, রবীন্দ্রনাথ যাকে ইতিহাসের 'ভাবগত' সত্য বলছেন, সেটি ঐতিহাসিক কাল-সংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। ঐতিহাসিক কাল বলতে আধুনিক ইতিহাসবিদেরা এক নিরপেক্ষ ও স্বপ্রতিষ্ঠ (absolute) সময় বুঝে থাকেন, যার কোনো একটি বিন্দুতে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা আখ্যানকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ ঘটনা বা আখ্যান এক্ষেত্রে একান্তভাবে কালাশ্রয়ী। নির্দিষ্টকাল চিহ্নিত ঘটনা ও তার ব্যাখ্যার আনুরূপ্যের মধ্যেই ইতিহাসের সত্য নিহিত। ঐতিহাসিক কালের এই ধারণাটি সপ্তদশ শতকের ইয়োরোপের অবদান, একজন মার্কিন ঐতিহাসিকের মতে নিউটনের আবিষ্কার।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক সময়কে অস্বীকার করেন নি; কিন্তু ইতিহাসের সত্য উপলব্ধির জন্য তিনি অনেক বেশি নির্ভর করেছেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর 'ভাবগত' ঐক্যের উপর। তাঁর ইতিহাস-চেতনায় ঘটনা কালাশ্রিত নয়, কাল ঘটনা বা আখ্যানাশ্রয়ী। এই কারণেই তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহকে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের আকর বলে ঘোষণা করেছেন : "শাস্ত্র-পুরাণ জনসমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস না হইলেও তাহা ধর্মসমাজের ইতিহাস। ধর্মমণ্ডলী আপন ধর্মের মহত্ত্ব সৌন্দর্য প্রাচীনতা সাধুদৃষ্টান্তমালা পুরাণে শাস্ত্রে গ্রথিত করিয়া ধর্মমতপ্রবাহকে অখণ্ড আকারে কাল হইতে কালান্তরে সঞ্চারিত করিয়া রাখে এবং সেই পুরাতন ঐক্যসূত্রে

আপন সম্প্রদায়কে দূরকাললব্ধ বৃহৎ এবং সুদৃঢ় করিয়া তোলে। এইজন্য ঘটনার তথ্যতা রক্ষা করা পুরাণের উদ্দেশ্য নহে। তাহা কেবল ধর্মমত—ধর্মবিশ্বাসের ইতিবৃত্ত। তাহার কাল্পনিক অমূলক উক্তি সকলও বর্ণিত ধর্মনীতির আদর্শকেই ব্যক্ত করে। সাময়িক ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ তাহার লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না।"[৩৪]

৪.

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা বঙ্কিম-প্রদর্শিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের প্রধান ধারাটির অনুসরণ করে নি— এ-কথা অগেই বলেছি। কিন্তু প্রধান ধারাটি অনুসরণ না করলেও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের পরিবৃত্তের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিপাদ্যকে বিস্তারিত করেছেন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের অগ্রগণ্য লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" ('ভারতী', বৈশাখ, ১৩০৫) শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্যকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : ইতিহাসে এই প্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যম্ভাবী তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাস-পাঠের পীড়ন কেন সহ্য করিব? আমরা যে ইতিহাস-সংকলন করিব তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না, কিন্তু ইতিহাসর যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রবৃত্তির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।"[৩৫] দুমাস পরে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'র আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার ইংরেজ-রচিত ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে নব-উন্মেষিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচয়িতাদের রচনার তুলনা করে বললেন : "কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তুলনায় কোন্‌টা গুরুতর— ইংরেজ লেখকগণ গল্পে প্রবন্ধে ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচ্যজাতীয়দের প্রতি নানা আকারে যে নিন্দা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন, যাহা অধিকাংশ স্থলেই যুক্তিগত তথ্যগত নহে, জাতীয় সংস্কারগত— অধিকাংশস্থলেই যাহার সুগভীর মূল কারণ স্পেক্‌টেটর যাহাকে বলিয়াছেন 'the dislike for aliens'— ইহাই? অথবা বাংলা ইতিহাস, যাহা শিক্ষিত বাঙালিদেরও বারো আনা লোক বাংলায় লিখিত বলিয়াই পড়িতে অনাদর করিবে, তাহা?... ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ এবং লোকচরিত্র সমন্ধে ভূয়োভূয়ঃ কাল্পনিক মিথ্যাবাদ ও অত্যুক্তি-দ্বারা পরিপূর্ণ ইংরাজি গ্রন্থের পত্রসংখ্যার সহিত তুলিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের ভালোমন্দ পাঠ্য-অপাঠ্য সমস্ত গ্রন্থ আপন ক্ষীণতাক্ষোভে লজ্জিত হইয়া উঠে।"[৩৬]

'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত আঠারোটি প্রবন্ধকে আমরা রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চর্চার ইতিবৃত্ত বলতে পারি। উনিশ শতকের শেষার্ধে, বিশেষত বাংলাদেশে, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার উদ্দীপনাকে রবীন্দ্রনাথ 'ইতিহাসবুভুক্ষা' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই ইতিহাস-বুভুক্ষাতেই রয়েছে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার ন্যায্যতা। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বলতে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বুঝেছিলেন সমাজ ও সমাজ-মনের ইতিহাস, রাষ্ট্রবৃত্ত নয়। এই সামাজিক

ইতিহাস রচনায় কিভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে সে-বিষয়েও পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে : "সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাংলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে 'ঐতিহাসিক চিত্র' [অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক পত্রিকা] তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিকপত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ ও সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা— এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। *যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে। তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।*"[৩৭] (বক্ররেখ আমার)। ১৯০৫ সালে জাতীয় ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন : "আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। ... যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথীরাজ, গুরু গোবিন্দ, শিবাজী, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন? এমনকি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন?"[৩৮] তাঁর সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচয়িতাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের নবজাগ্রত ইতিহাস-রচনার উদ্যম যেন গৌরব অনুষ্ঠানের দুর্গম পথে অবসিত না হয়, 'সেদিকে গৌরব না থাকিতেও পারে'। তবু পুরাবৃত্তের অনুসন্ধানে আমরা সচেষ্ট হব কেন? "তবু আমাদিগকে এই পঙ্কিল জটিল বক্রপথের দিকে আকর্ষণ করিতেছে কে? জাতীয় আত্মশ্লাঘা নহে, স্বদেশের প্রতি নবজাগ্রত প্রেম। আমরা দেশকে প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষরূপে সম্পূর্ণরূপে জানিতে চাই... আপনাকে ভুলাইতে চাই না।"[৩৯]

"ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন : "আর্য-অনার্যের যুদ্ধ যখন সুদীর্ঘ কালের প্রান্তে এসে তার তীব্রতা হারিয়েছে, যখন বৌদ্ধ-বিপ্লবও অবসানের মুখে, অনতিবিলম্বে ইসলামের আক্রমণে পশ্চিম ভারতে হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটবে, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিবৃত্তকথা থামিয়ে দিলেন, তিনি আর মধ্যযুগের কথায় প্রবেশ করলেন না। এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে কাহিনী শুনিয়েছেন তা প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্ত... যাকে প্রাচীন যুগ বলে সেইটুকু যেন ভারতবর্ষ, এর পরে যেন আর ইতিহাস নেই। যেন ইসলাম আসে নি, মধ্য-যুগ মায়া, ইংরেজ আসে নি, ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রবাহ আধুনিক যুগে পৌঁছয় নি, পলাশীর যুদ্ধ এখনও ঘটে নি... বিনা কৈফিয়তে রবীন্দ্রনাথ [ভারতবর্ষের ইতিহাসকে] ইসলাম-পূর্ব যুগেই সমাপ্ত করে দিলেন।"[৪০]

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রধান রচনাগুলির কথা মনে রাখলে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের এই অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য প্রধান প্রবন্ধগুলির বাইরে অন্য অনেক রচনায় রবীন্দ্রনাথ মুসলমান যুগ সম্পর্কে কখনও কখনও বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। আবদুল করিম রচিত 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালে লিখেছিলেন : "... তথাপি যখন মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতালাভ স্বার্থসাধন সিংহাসনপ্রাপ্তির নিকটে, স্বাভাবিক স্নেহ দয়াধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়— ভাই-ভাই পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রী প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব হয়... তখন ভাবি শ্রেয়ের পথ কোন দিকে।"[৪১] এই মন্তব্যের পঁয়ত্রিশ বছর পরে, পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান শাসনের সার-সংক্ষেপ করলেন এইভাবে : "বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংগঠন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র ছিল না। এই জন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল.. তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। ... বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙা ভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।" এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান শাসনপর্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ থেকে আমাদের মুক্তি দিল ইংরেজ শাসন : "তারপরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য ইউরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে।"[৪২]

কিন্তু এ-কথাও স্মরণযোগ্য যে, রাষ্ট্রশাসনের ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে, বিশেষত নিম্নবর্গের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সেতুবন্ধন ১৯০৪ সালেই : "হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী-কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব সমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।"[৪৩] ভারতবর্ষে মহাজাতি গঠনের ইতিহাসে মুসলমান সমাজও যে সমানভাবে উপস্থিত, সে কথা বলেছেন ১৯০৮ সালে "পূর্ব ও পশ্চিম" নামক প্রবন্ধে।[৪৪] এবং ১৯১৮ সালে রচিত "স্বাধিকার প্রমত্তঃ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্র সাম্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা

করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন।"[৪৫] বস্তুত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঐক্যতত্ত্বে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতো ইতিহাসের পর্ববিভাগকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।

৫.

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ভাবনার সঙ্গে তাঁর অবস্থানগত পার্থক্য যদুনাথ সরকার নিজেই স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তাঁর শেষ জীবনে লিখিত "রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত" নামক প্রবন্ধে। তথ্যনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস-রচনায় বিশ্বাসী যদুনাথ ইতিহাসের দর্শন নিয়ে মাথা ঘামান নি; ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস রচনাতেও প্রবৃত্ত হন নি। তিনি লিখেছেন রাষ্ট্রশাসনের ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। কিন্তু ইতিহাস-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যকে নির্দেশ করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। উল্লিখিত প্রবন্ধে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন : "যদুনাথ বর্তমান ভারতের বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনাপ্রণালীর জনক আখ্যা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে যথার্থভাবেই রাঙ্কে, নাইবুর ও মমসেনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতে ইতিহাস-রচনা প্রণালীকে উন্নত করিবার কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই।"[৪৬] সন্দেহ নেই, যদুনাথ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থাকেই ইতিহাস-চর্চার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য রীতি বলে মনে করতেন; কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ইতিহাসের দর্শনকে তিনি ইতিহাস সাধনার শেষ লক্ষ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অবশ্য দর্শনের স্তরে উন্নীত হবার জন্য ইতিহাসের যে কঠিন ও তথ্যনিষ্ঠ প্রস্তুতির প্রয়োজন— সে-কথাও জানাতে ভোলেন নি তিনি: "We have yet to collect and edit our materials and to construct the necessary foundation— the bedrock of ascertained and unassailable facts, on which alone the superstructure of philosophy of history can be raised by our happier successors. Premature philosophising based on unsifted facts and untrustworthy chronicles, will only yield a crop of wild theories and fanciful reconstruction of the past."[৪৭]

এই মন্তব্য করার সময়ে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের 'তপোবন' (১৯০৯) ও 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" (১৯১১) প্রবন্ধ দুটির কথা ভাবছিলেন কিনা বলা শক্ত; কিন্তু এ-কথা বোধ হয় বলা যায় যে, তথ্যের অপ্রতুলতার কারণেই তিনি ইতিহাসের দর্শনের দিকে না ঝুঁকে ইতিহাসর তথ্য-সংগ্রহ ও তথ্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। যদুনাথ বিশ্বাস করতেন যে তথ্যের যাথার্থ্য নির্ণয় ও বিচারের দ্বারাই আমরা ইতিহাসের সত্যে উপনীত হতে পারি।

ইতিহাসের সত্য বলতে যদুনাথ বুঝেছিলেন ঘটনা ও ব্যাখ্যার আনুরূপ্য। ইতিহাসের অভিপ্রায়ের কথা স্বতন্ত্র। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপে ইতিহাসের তথ্য ও সত্য সম্পর্কিত বিতর্কের কথা আমরা বলেছি। সন্দেহ নেই, যদুনাথ এই বিতর্ক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং বিতর্কে নিশ্চিতভাবে রাঙ্কের অনুগমন করেছিলেন।

নির্ভুল তথ্যের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস-রচনার রীতিকেই যদুনাথ বলেছেন 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'। ইতিহাস রচনার এই পদ্ধতি আমাদের দেশে ইয়োরোপিয় জ্ঞানচর্চার অবদান। "আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ" নামক প্রবন্ধে যদুনাথ লিখেছিলেন : "ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ঐতিহাসিক প্রণালী এবং ইতিহাসের উদ্দেশ্য লইয়া ইউরোপে যে যুগান্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার প্রবাহ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে পৌঁছিল। ইতিহাসের মূল উপাদান সমসাময়িক দলিলপত্র; তাহার অধিকাংশই অপ্রকাশিত; এগুলির আবিষ্কার, সংশোধন, যথার্থ ব্যাখ্যা এবং তুলনামূলক সমালোচনা ভিন্ন কোনো ইতিহাসকেই অটল ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা যায় না, এই সত্য আজ সভ্য জগত স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপেও অতি অল্পদিন হইল এই মত পরিবর্তনটি ঘটিয়াছে; লর্ড য়্যাকটন্ পর্যন্ত 'অপ্রকাশিত দলিলগুলি'র (documents inedites) প্রতি কতকটা অশ্রদ্ধা ও সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যদিও তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ফন্ রাঙ্কে এই সত্য প্রচার করেন।"[৪৮] রাঙ্কের প্রতি যদুনাথের বিশেষ অনুরক্তির কথা লিখেছেন ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগোও।[৪৯] বস্তুত, শুধু ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাখ্যার যাথার্থ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই নয়, তথ্য থেকে ইতিহাসের মর্মে উপনীত হবার আদর্শেও যদুনাথ রাঙ্কের অনুগামী। ১৮৩০ সালে রাঙ্কে লিখেছিলেন : "Nevertheless those historians are also mistaken who consider history simply as an immense aggregate of particular facts, which it behooves one to commit to memory. Whence follows the practice of heaping particulars upon particulars, held together only by some general moral principle. I believe rather that the discipline of history— at its highest— is itself called upon, and is able, to lift itself in its own fashion from the investigation and observation of particulars to a universal view of events, to a knowledge of the objectively existing relatedness."[৫০] পঁচাশি বছর পর, রাঙ্কের বক্তব্যের প্রায় প্রতিধ্বনি করে যদুনাথ বললেন: "ঘটনার সত্যনির্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ, তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায়; কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পরিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজা, রাজ্য পরিবর্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না।"[৫১] অবশ্য রাঙ্কের সঙ্গে যদুনাথের একটি গুরুত্বপূর্ণ

পার্থক্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। রাঙ্কে ইতিহাসের নিজস্ব ও অন্তর্লীন বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধানে (যেমন moral principle) বিশ্বাস করতেন না। পক্ষান্তরে, যদুনাথ কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে ইতিহাসের ধারায়, রবীন্দ্রনাথের মতোই, বিধাতার অভিপ্রায়ের কথা বলেছেন: "শুধু কাহিনী লিখিলে, প্রমাণ সংগ্রহ করিলে চলিবে না। ... ইতিহাস নিশ্চয়ই দেখাইবে যে জগৎ স্রষ্টার অভিপ্রায়, তাঁহার অপরাজেয় বিধি, কিরূপে মনুষ্য-বিশেষের মতই জনসমষ্টি অর্থাৎ নেশন-বিশেষের উপর নিজের শক্তিপ্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার ন্যায়বিচারে দণ্ড ও পুরস্কার অনিবার্য্য প্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"[৫২] ঔরঙ্গজেবের ইতিবৃত্তে তিনি লক্ষ করেছেন এক অদৃশ্য ও দুর্জ্ঞেয় নিয়তির উপস্থিতি।

ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রসঙ্গে যদুনাথ সবিস্তারে প্রথম বলেছিলেন ১৯১৫ সালে, বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণে। তারপর, তাঁর সারা জীবনের ইতিহাস সাধনায় বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত অন্তত পনেরোটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছেন ক্লান্তিহীনভাবে। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার জন্য যে নিবিষ্ট নিষ্ঠা ও কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন তার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত যদুনাথ স্বয়ং। যদুনাথের গবেষক-ছাত্র যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী জানিয়েছেন: "রাঙ্কে যেমন মৌলিক তথ্যের সন্ধানে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন যদুনাথও তেমনি একই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুনঃপুনঃ গমন করিয়া অনেক মৌলিক মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।"[৫৩] বিভিন্ন ভাষায় রচিত মৌলিক উপাদান ব্যবহারের জন্য তাঁকে বহু ভাষা শিখতে হয়েছিল। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ও উর্দু ছাড়াও তিনি শিখেছিলেন ফার্সি, মারাঠি, পর্তুগিজ, ফরাসি, অসমিয়া ও রাজস্থানি ভাষা। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস (১৯১২-১৯২৪) রচনার জন্য যদুনাথ ঔরঙ্গজেব ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের পাঁচহাজারেরও বেশি চিঠি সংগ্রহ করেছিলেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।

১৯১৫-তে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে যদুনাথ ঘোষণা করেছিলেন : "ইতিহাস-চর্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা।"[৫৪] 'বৈজ্ঞানিক পন্থা' বলতে কি বোঝায় তার বিশদ আলোচনা করেছেন যদুনাথ এই মূল্যবান প্রবন্ধে, ইতিহাস-গবেষকদের অবশ্যমান্য কর্তব্যগুলির স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। যদুনাথ বলেছেন, ইতিহাস-গবেষকদের নিরাসক্ত ও মুক্তমন হতে হবে, কারণ "সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির পর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে... সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত সত্যের বিরোধী হউক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না।"[৫৫] কি পদ্ধতিতে গবেষক ইতিহাসের তথ্য ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সত্যে উপনীত হতে পারেন? যদুনাথ নির্দেশ দিয়েছেন যে, গবেষককে "প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।"[৫৬] প্রমাণ বলতে যদুনাথ অবশ্য ইয়োরোপিয় এনলাইটেনমেন্টের জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) থেকে আহৃত সূত্রাবলি বোঝেন; অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যের সাক্ষ্য থেকে যুক্তিশাস্ত্র-বাহিত অনুমান;

স্বপ্রতিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ কালে (absolute time) সংঘটিত ঘটনা ও তার ব্যাখ্যার আনুরূপ্য— বিভিন্ন ঘটনাবলির আসঞ্জন (coherence) অথবা রবীন্দ্রনাথের 'ভাবগত' সত্য নয়। যদুনাথ বলেছেন : "সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন,— (১) সর্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information অর্থাৎ প্রথম সাক্ষ্যের নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে তো? পুলিস ডায়েরীর নকল কি করিয়া পাওয়া যায়? (২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে? (৩) মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি? প্রত্যেক ইতিহাস-লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধ ভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত।"[৫৭]

'প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্বপ্রথম কার্য'— বলেছেন যদুনাথ, এবং সাক্ষ্যের সত্যতা নির্ধারণের জন্য যে পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন সেটি ব্যবহারশাস্ত্রের (Jurisprudence)-এর প্রচলিত পদ্ধতি। যদুনাথ লিখেছেন: "ইতিহাস লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রু পক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্র পক্ষ উহা বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে— এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত ঘটনার প্রকৃতস্বরূপ জানা যায়।"[৫৮] মৃত্যুর ছয় বছর আগে, বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ কর্তৃক অর্ঘ্যদান উপলক্ষ্যে আচার্যের অভিভাষণেও যদুনাথ সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন : "গবেষণার এই নবীন প্রণালীর দুইটি ধারা— প্রথমটি এই যে, গবেষককে একেবারে আদিতম ঐতিহাসিক উপাদান অর্থাৎ দলিলে পৌঁছিতে হবে। সর্বপ্রথম সাক্ষীর এজাহার যতদূর সম্ভব বাহির করিতে হইবে এবং তাহা আদি ও অবিকৃত আকারে, অর্থাৎ সাক্ষীর নিজের কথাগুলি পড়িতে হইবে, তাহার অনুবাদ বা পরবর্তী কালের অন্য লেখকের গ্রন্থে দেওয়া সংক্ষিপ্তসার পড়িলে চরমসত্যে পৌঁছান যায় না। ... নবীন প্রণালীর দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে এই যে, সবগুলি সাক্ষীকে এক জায়গায় করতে হবে। যত বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন স্থানে আমার নির্বাচিত বিষয়ের উপাদানগুলি আছে তাহা সংগ্রহ করে পড়তে হয়; ভিন্ন ভিন্ন দলের সাক্ষীর জবানবন্দীর ঘাতপ্রতিঘাত সন্দেহের চোখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তবে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা যায়।"[৫৯]

এই ব্যবহারশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে রচিত ইতিহাসের মূল্য সম্বন্ধে যদুনাথের মনে কোনো সংশয় ছিল না। ১৯৪৮ সাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে আয়োজিত সংবর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন : "... ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর একটি বিশেষ মূল্য আছে। এরূপ একান্ত সত্যনিষ্ঠাকে পাথুরে ইতিহাস বলে

উপহাস করবার দিন চলে গেছে। ... আমার শিষ্য অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগোর ইতিহাস গ্রন্থগুলির সঙ্গে রজনীকান্ত গুপ্তের লেখা ভারত ইতিহাস তুলনা করলেই নবীন ও পুরাতন লেখকদের মধ্যে গবেষণার প্রণালী এবং ফলপ্রসূতিতাতে কত পার্থক্য তা স্পষ্ট হবে।"[৬০]

ইতিহাস-রচনার মেথডলজি সম্পর্কিত যদুনাথের লেখাগুলি অনুধাবন করলে দুটি জরুরি সূত্র আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত, যদুনাথের সিদ্ধান্তে ইতিহাসের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সত্যসন্ধান ও সত্যপ্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের সত্য বলতে যদুনাথ বুঝেছিলেন তথ্য ও ব্যাখ্যার নির্বিঘ্ন সমীকরণ। কিন্তু কান্ট পরবর্তী ইয়োরোপিয় ঐতিহাসিকদের মতো যদুনাথও জানতেন যে, নিরঞ্জন তথ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই; তথ্যের তথ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাখ্যার সাহায্যে। তাই ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাখ্যাতার সততা একটি আবশ্যকীয় শর্ত। এই শর্ত পালিত না হলে কোনো নৈবর্তিক ইতিহাস রচিত হতে পারে না। ইতিহাসের সত্য ও নৈবর্তিকতা এ-ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সমার্থক। কিভাবে ঐতিহাসিক এই নৈবর্তিকতা (objectivity) অর্জন করতে পারেন? যদুনাথ বলেছেন, সংগৃহীত তথ্যই যেহেতু ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য, তাই সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিরাসক্ত ও পক্ষপাতশূন্য হতে হবে। যদুনাথের কথায় : "সত্য-নির্দ্ধারণের প্রণালী কি? সর্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তোলা। যশ, ধন, বা প্রতিপত্তি লাভের লালসা দূর করিয়া, নিজের অন্তরের অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া, সব পূর্ব-সংস্কার ত্যাগ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে— মোরা সত্যের পরে মন/আজি করিব সমর্পণ।... সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব বুঝিব গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।"[৬১] পরিণত বয়সে লিখিত আর একটি প্রবন্ধে যদুনাথ বলেছিলেন : "... ঐতিহাসিক গবেষণার সত্যসন্ধানী নিষ্কাম সাধককে দেশ-কাল-সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইবে, স্বদেশী লোকের শস্তা বাহবা পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে হইবে। হোগলকুড়ীয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই রচনার জন্য ডাক্তার উপাধি দিবেন, অথবা ছকু খানসামা লেনের সাহিত্যসভা আমার এই গ্রন্থ পুরস্কৃত করিবেন— এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত গবেষকের আদর্শ হইতে পারে না।"[৬২]

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস-রচনার মেথডলজি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যদুনাথ এত অসংখ্যবার ব্যবহারশাস্ত্রের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন যে মনে হয় ইতিহাস রচনার আদর্শ হিসেবে তিনি ব্যবহারশাস্ত্রকেই মডেল নির্বাচিত করেছিলেন। এই মডেলে ঐতিহাসিক একজন নিরপেক্ষ বিচারক; দল নির্বিশেষে সাক্ষীদের জেরা করার পরই তিনি কোনো যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন; ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ব্যাখ্যাসূত্রে যদুনাথ বলেছিলেন : "যেমন, ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মোকদ্দমায় সবজজের সামনে কুমারের পক্ষে এক হাজার এবং রাণীর পক্ষে ৯৯৯ জন সাক্ষী—অথবা ঐমত—ডাকা হয়। যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত একতরফা বিচারের রায় মাত্র তাহা স্থায়ীভাবে গৃহীত হতে পারে না।"[৬৩] আচার্য যদুনাথের ঘনিষ্ঠতম গবেষক

ছাত্র ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগোও লিখেছেন : "The historian's [Jadunath's] mission was to discover 'the truth, the whole truth and nothing but the truth about the past', which had unfortunately become a live issue at the time of writing the third volume and was heading to the first triumph by the Montagu-Chelmsford Reforms of 1919, the year of the publication of the fourth volume of the *History of Aurangzib.* The whirlwind of political passions could not disturb the *juristic equanimity of the stern historian,* equally indifferent to praise and blame by any but the illuminati of humanity."[৬৪] (বক্ররেখ আমার)।

৬.

যদুনাথ প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখেন নি, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিকল্পিত জাতীয় ইতিহাস, *A New History of the Indian People*-এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে যদুনাথ ১৯৩৭-এর ১৯ নভেম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য : "National history, like every other history worthy of name and deserving to endure, must be true as regards the facts and reasonableness in the interpretation of them... The first duty of our national historian will be to depict all aspects of our national life in the past... He will not suppress any defect of the national character, but add to his portraitue those higher qualities which, taken together with former, help to constitute the entire individual."[৬৫]

কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন : "আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছিলেন বাঙালীর ঠাকুর দেবতা; ঐতিহাসিক [যদুনাথ] ধ্বংস করিয়াছেন বাঙালীর মনগড়া প্রতাপাদিত্য। যে মোগলসেনানী স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি সমসাময়িক বাঙ্গালার বিস্তারিত ইতিহাস Baharstan-i-Ghaibi লিখিয়াছেন। ইহা একমাত্র যদুনাথেরই আবিষ্কার। ইহার পর আমাদের 'বঙ্গবীর' গণ সাধারণ বিদ্রোহীর পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিয়াও রেহাই পান নাই। এই ইতিহাস পাঠান ওসমানকে বাঙ্গালীর পূজ্য বীরের আসনে বসাইয়াছে। স্বদশীযুগে দেশপ্রেমে মাতোয়ারা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দিরে আলীবর্দ্দী সিরাজউদ্দৌলার মনগড়া মূর্তি স্থাপন করিয়া ভক্তির অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছিল। যদুনাথের আঘাতে ঐগুলি ভাঙিয়া পড়িয়াছে..."[৬৬]

কিন্তু ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও যদুনাথ জাতীয়তাবাদের চেতনার পরিমণ্ডলেই জাতীয় ইতিহাস রচনা করেছেন। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রথম স্তরে ঐতিহাসিকের দেশাত্মবোধের উদ্ভাসকে যদুনাথ অবজ্ঞা করেন নি। তিনি

বলেছিলেন : "সব দেশেই দেখা গিয়াছে যে যখন হৃদয়ে মাতৃভূমির বোধ প্রথম উন্মেষিত হয়, জাতীয় জীবনের সেই অতি প্রত্যূষে, দেশের লুপ্ত কাহিনী জানিবার জন্য, অতীত-গৌরব-বাহিনী বাণী প্রচার করিবার জন্য, জনসেবকদের মনে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে। ইহার মধ্যে যে জ্যোতি অপেক্ষা তাপ বেশী, জ্ঞান অপেক্ষা আবেগ বেশী, তাহা সত্য হইলেও নিন্দার কথা নহে; কারণ এই আবেগই যুগ-যুগব্যাপী বদ্ধমূল অন্ধকার নিশ্চেষ্টতার বাধাকে অতিক্রম করিবার উপযোগী ধাক্কা জাতির মনকে দেয়। তাহার পরিণত ফল পরে ফলে।"[৬৭] যদুনাথের ইতিহাস সাধনা এই পরিণত মনের ফসল। বস্তুত, ইতিহাসের সত্য-সন্ধান ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের মধ্যে কোনো বিরোধ যদুনাথ দেখতে পান নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলায় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার অন্যতম পুরোধা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও ১৯১২ সালে প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌররাজমালা'র উপক্রমণিকায় (পৃ.৩-৪) লিখেছিলেন : "ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভালো করিয়া আমাদের হৃদয়ংগম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ... এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগবিরাগ আমাদিগকে পূর্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।"[৬৮]

এই সূত্রে আরেকটি জরুরি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার। ইংরেজি সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র যদুনাথ তাঁর গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ভারতীয় ইতিহাস; কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তিনি প্রাক-ব্রিটিশ যুগের মুসলমান শাসনপর্বের ইতিহাস রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন কেন? তিনি তো অনায়াসেই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্ব নিয়ে কাজ করতে পারতেন, দলিল দস্তাবেজও, মুঘল ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের তুলনায়, অনেক বেশি সহজলভ্য হত? আর, 'ইংরেজভক্ত' যদুনাথের পক্ষে তা অসংগতও হত না। দুঃখের বিষয়, দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া, যদুনাথ-পরবর্তী ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা কেউই প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন নি। ব্যতিক্রমীদের একজন, কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন : "আমার মনে হয় তিনিও [যদুনাথ] প্রথমে প্রাচীন ভারত বিষয়ে গবেষণার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন; পরে তিনি উহা ত্যাগ করিলেন কেন? এই সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বৃদ্ধ ভাণ্ডারকরের কৃতিত্ব মধ্যন্দিন রেখায় পৌঁছিয়াছে, প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্র সংকীর্ণতর এবং উদীয়মান গবেষকগণের ভীড়ও বেশী, কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থা হয়ত যদুনাথের পশ্চাৎ অপসরণের কারণ নয়। নূতন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা প্রাচীন ভারত অপেক্ষা মুসলমান ইতিহাসে বেশী... হরিলুটের বাতাসায় সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যক্তি যদুনাথ ছিলেন না; তাঁহার প্রতিভা, উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্ভবত নাদিরসাহী লুটের আশায় ময়ূর সিংহাসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল।"[৬৯] কালিকারঞ্জনের ব্যাখ্যার আলোতে যদুনাথকে একজন উপায়কুশল ও সুযোগসন্ধানী গবেষক বলে বলে মনে হয়, এবং যদুনাথের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে মনে রাখলে এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া কঠিন।

আর একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন : "যদুনাথ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের পংক্তিভূক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দলভুক্তও ছিলেন না। তাঁর প্রধান কাজ ছিল অনেকটা এলিয়ট-ডাউসনের কাজের পরিপূরক। কিন্তু যদুনাথ এমন বিষয় প্রথমে বেছেছিলেন যেটা এলিয়টরা ধরেন নি। অনেক দূর থেকে, অপ্রত্যক্ষভাবে, যদুনাথ দেখালেন যে এলিয়টের মূল্যায়ন কত সীমিত...।"[১০] তৃতীয় আর একজন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, জানিয়েছেন : "তিনি প্রথমেই আধুনিক ভারতের ইতিহাস তথা ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার জন্য মনস্থির করেছিলেন। এইজন্য তিনি সংগ্রহ করেন অনেক গ্রন্থ, তথ্য, দলিলদস্তাবেজ। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদুনাথ এটা অনুধাবন করেন যে, নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া ভারতের এই মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে সত্যিকার মূল্যায়নের পক্ষে অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। বিশেষত এখনো দেশে চলেছে উপনিবেশিক শাসনের পালা। এখান থেকে যদুনাথ দৃষ্টি দেন ভারতীয় ইতিহাসের মুঘল শাসনামলের দিকে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, তখনো পর্যন্ত মুঘল ইতিহাস নিয়ে কোনো প্রামাণ্য গবেষণা সম্পন্ন হয় নি।"[১১]

প্রাচীন ভারত অথবা ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার কথা যদুনাথ কখনো ভেবেছিলেন কিনা— প্রশ্নটি আসলে তেমন জরুরি নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, যদুনাথ তাঁর আজীবন ইতিহাস-সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় মুসলমান যুগকে তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ও ভারতীয় ইতিহাসের ইংরেজ রচয়িতারা মুসলমান শাসনপর্বকে প্রধানত অন্ধকারাচ্ছন্ন 'মধ্যযুগ' বলে বর্ণনা করেছেন যেখানে— রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর এক দল উঠিয়া পড়ে— পাঠান মোঘল পর্তুগীজ ফরাসী ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিতেছে।"[১২]

যদুনাথ এই প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে 'দুঃস্বপ্ন'-এর আর একটা দিক আবিষ্কার করে দেখালেন : "The birth of the New India in which we live was preceded by the death of a political and social order under which the millions of this country had been nurtured for two centuries and a half and which had done great things for them. The Mughal Empire, established in 1556, had united much of the Indian continent under one sceptre, given it a uniform civilisation whose conquering light had penetrated beyond the bounds of that empire, and on the whole promoted the general happiness of the people in a degree

unapproached except in the mythical past. *It broke the isolation of the provinces and the barrier between Indian and the outer world, and thus took the first step necessary for the modernisation of India and the growth of an Indian nationality in some distant future... The dissolution of the old order in India did not form a dark age,* during which the activity of the human mind ceased or the human brain and the human hand left no memorial of their working. On the contrary, the Eighteenth century in India is illumined for its historian by a host of witnesses of the most diverse races, creeds and tongues..."[১৩] (বক্ররেখ আমার)।

যদুনাথের কাছে ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা মুসলমান শাসনকালের আগেই শেষ হয়ে যায় না; এমন কি ভারতীয় ইতিহাসের প্রথাগত পর্ববিভাজনেও তিনি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন বলে মনে হয় না। ১৯২৮ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Sir William Mayer— বক্তৃতামালায় তিনি বলেছিলেন : "We usually study the history of India as divided into watertight compartments or periods. One great defect of this method of treatment is that *we thereby lose sight of the life of the nation as a whole, we fail to realize that India has been the home of a living, growing people, with a continuity running through all the ages*— each generation using, expanding, or modifying what its line of predecessors had left to it."[১৪] (বক্ররেখ আমার)। অন্য অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও যদুনাথের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কিত দার্শনিক প্রত্যয় থেকে আদৌ দূরে নয়। এই বক্তৃতাতেই যদুনাথ ভারতবর্ষের চারহাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে চারটি যুগসন্ধিক্ষণের কথা বলেছেন : "Four distinct races or creeds, have, each in its own age, determined this country's destiny. The Vedic Aryans, the Buddhists, the Muslims, and the British have introduced a new element into India; each of them has conferred gifts which have worked through the succeeding ages and modified our life and thought, no less than our political history."[১৫]

যদুনাথের ইতিহাস-সাধনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটি এইরকম : 'ইতিহাসকে তিনি [যদুনাথ] দেখেছেন সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান এক বিকাশ প্রক্রিয়া হিসাবে— যা সমাজবদ্ধ মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রবাহের ভেতর দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে।"[১৬] ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস নির্মাণে এটাই যদুনাথের সবচেয়ে বড়ো অবদান।

সূত্রনির্দেশ

১. "রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত," 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩৬২; পৃ. ৪১৪-১৫।
২. উদাহরণত, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" (১৯০১), "ভারতবর্ষীয় সমাজ" (১৯০১), "বারোয়ারিমঙ্গল" (১৯০২), "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪), "সফলতার সদুপায়" (১৯০৫), "পথ ও পাথেয়" (১৯০৮), "পূর্ব ও পশ্চিম" (১৯০৮), "সত্যের আহ্বান" (১৯২১), "বৃহত্তর ভারত" (১৯২৭), "কালান্তর" (১৯৩৩) ইত্যাদি।
৩. "রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত"; পৃ. ৪১৪।
৪. "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", 'বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৪০১; পৃ. ২৯১।
৫. 'বাংলার ইতিহাস সাধনা', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি [১৯৯২], ২০০১; পৃ. ১০৩, পাটী ১।
৬. 'বারোমাস', এপ্রিল, ১৯৯১।
৭. স্বল্পখ্যাতদের কয়েকজন হলেন, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামসদয় ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮. "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৭৫), 'বঙ্কিম রচনাবলী ২'; পৃ. ২৮৬।
৯. "ইতিহাসের উত্তরাধিকার"; পৃ. ৩।
১০. কলকাতা : থীমা, ২০০৩।
১১. প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে "বাঙ্গালীর বাহুবল" (১৮৭৪), "বাঙ্গালার ইতিহাস", "ভারত-কলঙ্ক" (১৮৭৯), "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (১৮৮০), "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" (১৮৮০-৮১), "বাঙ্গালার কলঙ্ক" (১৮৮৪)।
১২. 'স্মৃতিতে সেকাল', কলকাতা, ২০০৯; পৃ. ৪৪-৪৫।
১৩. "ভারত-কলঙ্ক", 'বঙ্কিম রচনাবলী' ২য় খণ্ড; পৃ. ২০৫-২১০।
১৪. দ্র. সত্যচরণ চক্রবর্তী, 'রাক্ষসের দেশ' (১৯২৬), হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'আবার যখের ধন' (১৯৩৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৭), জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্তী, 'রাক্ষুসে আফ্রিকা' (১৯৪০) ইত্যাদি।
১৫. "বারোয়ারি-মঙ্গল", রর ৪; পৃ. ৪২৯।
১৬. "স্বদেশী সমাজ", (১৯০৪) স্বদেশী সমাজ', সংকলন ও সম্পাদনা : পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩; পৃ. ৩০।
১৭. "ভারত-ইতিহাস-চর্চা" (১৯২০), 'ইতিহাস'; পৃ. ৮২।
১৮. "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৯০১) 'ইতিহাস'; পৃ. ১০।
১৯. "বৃহত্তর ভারত", রর ২৪; পৃ. ৩৭০।
২০. "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা", 'ইতিহাস'; পৃ. ৪৪।
২১. "রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা ও সাংকেতিক নাটক", 'রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক : নব সমীক্ষা', কলকাতা : চয়নিকা, ১৯৯৪; পৃ. ৯৪।
২২. তদেব; পৃ. ৯৫।
২৩. "স্বদেশী সমাজ"; পৃ. ৩১-৩২।

২৪. "সফলতার সদুপায়" (চৈত্র, ১৩১১), রর ৩; পৃ. ৫৫৯।
২৫. রর ১২; পৃ. ২৬৩-৬৪।
২৬. রর ২৪; পৃ. ২৪৩-২৫২।
২৭. "পূর্ব ও পশ্চিম", রর ১২; পৃ. ২৬২-৬৩।
২৮. Rolf Torstendahl, "Fact, Truth, and Text : The Quest for A Firm Basis for Historical Knowledge around 1900", *History and Theory* 42, October, 2003; P. 306.
২৯. See, *Varieties of History,* ed. Fritz Stern, Cleaveland : World, 1956; p. 57.
৩০. "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা", রর ৪; পৃ. ৪১৬-৪৪০। দ্র. Francois Guizot, *The History of Civilisation in Europe : Lectures given at the Sorbonne, 1828-30,* London, 1887.
৩১. "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ (১৮৯৮), 'ইতিহাস'; পৃ. ১২২।
৩২. "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা", 'ইতিহাস'; পৃ. ১৯-২০।
৩৩. Donald J. Wilcox, *The Measure of Time Past : Pre-Newtonian Chronologies and the Rhetoric of Relative Time*, Chicago : The University of Chicago P. 1987; pp. 16-50.
৩৪. "ঐতিহাসিক চিত্র" (১৮৯৮), 'ইতিহাস'; পৃ. ১৩৭।
৩৫. "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ", 'ইতিহাস'; পৃ. ১২২।
৩৬. "সিরাজদ্দৌলা ২" ['ভারতী', শ্রাবণ, ১৩০৫], 'ইতিহাস'; পৃ. ১৩০-৩১।
৩৭. "ঐতিহাসিক চিত্র : সূচনা", 'ঐতিহাসিক চিত্র', জানুয়ারি, ১৮৯৯, 'ইতিহাস'; পৃ. ১৪৮।
৩৮. "ইতিহাস কথা", 'ভাণ্ডার', আষাঢ়, ১৩১২, 'ইতিহাস'; পৃ. ১৬৩-৬৪।
৩৯. "ইতিহাস কথা", 'ভারতী', ভাদ্র, ১৩০৫। 'ইতিহাস'; পৃ. ১৪১।
৪০. 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা', কলকাতা : বাউলমন প্রকাশন, ২০০২; পৃ. ৪৫।
৪১. 'ইতিহাস'; পৃ. ১৫৫।
৪২. "কালান্তর' (১৯৩৩), রর ২৪; পৃ. ২৪৪।
৪৩. 'স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪), 'স্বদেশী সমাজ'; পৃ. ২৭।
৪৪. রর ১২; পৃ. ২৬১।
৪৫. রর ২৪; পৃ. ৩৯৩-৯৪।
৪৬. যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার', বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৮৯; পৃ. ২৭-এ উদ্ধৃত।
৪৭. *Studies in Mughal India* (1917), 2nd.ed., Calcutta, 1917; p. 266.
৪৮. 'রজত-জয়ন্তী : ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯১১-৩৫)', সম্পাদক : কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলকাতা, জুন, ১৯৩৫; পৃ. ১৮।
৪৯. "ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকার", 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬; পৃ. ১৫৭।
৫০. *Varieties of History.* Cited in Donald J. Wilcox; p. 37.
৫১. "ইতিহাস চর্চার প্রণালী", 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩২২; পৃ. ২৯।

৫২. "আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ"; পৃ. ১৮।

৫৩. 'যদুনাথ সরকার'; পৃ. ২৮।

৫৪. অভিভাষণটি "ইতিহাস-চর্চার প্রণালী" শীর্ষকে প্রথম মুদ্রিত হয় 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩২২ সংখ্যায়। পৃ. ২৫।

৫৫. তদেব; পৃ. ২৫।

৫৬. তদেব; পৃ. ২৬।

৫৭. তদেব; পৃ. ২৬।

৫৮. তদেব; পৃ. ২৮–২৯।

৫৯. "বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা", 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩৫৭; পৃ. ২৬০–৬১।

৬০. 'সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা', ৪র্থ সংখ্যা, ৩৫৫। মণি বাগচী, 'আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা', কলকাতা, ১৯৭৫; পৃ. ১৪৪-এ উদ্ধৃত।

৬১. "ইতিহাস-চর্চার প্রণালী"; পৃ. ২৫।

৬২. "বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা"; পৃ. ২৬২।

৬৩. তদেব; ২৬১। ভাওয়াল সন্যাসী মামলার বিচারক পান্নালাল বসু ঢাকার আদালতে তাঁর ৫২৫ পাতার রায় পড়ে শোনান ১৯৩৬ সালের ২৪ আগস্ট। এই মামলায় বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সবশুদ্ধ ২৫৪২। দ্র. Partha Chatterjee, *A Princely Imposter? The Kumar of Bhawal and the Secret History of Indian Nationalism,* Permanent Black, 2000.

৬৪. "Jadunath Sarkar as a Historian", *Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar,* ed., H.R. Gupta, Punjab University, 1958; p. 59.

৬৫. যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 'যদুনাথ সরকার'-এ উদ্ধৃত; পৃ. ৫৫–৫৬।

৬৬. "ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার'; পৃ. ১৫১।

৬৭. "আধুনিক ভারতে ইতিহাসের ধারা"; পৃ. ১৭।

৬৮. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা'য় উদ্ধৃত; পৃ. ৮৩।

৬৯. "ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার", 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৬৬; পৃ. ২০–২১।

৭০. অনিরুদ্ধ রায়, 'যদুনাথ সরকার', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯; পৃ. ২০–২১।

৭১. 'যদুনাথ সরকার', ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮; পৃ. ২৫।

৭২. "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৯০২), 'ইতিহাস'; পৃ. ৫।

৭৩. 'Foreword', *Fall of the Mughal Empire,* vol. I, 1739-1754 (1932), 3rd. ed., Calcutta : M.C. Sarkar and Sons, 1964; pp. iii-iv.

৭৪. *India Through the Ages* (1928), Qrient Longman, ed., 1998; p. 1.

৭৫. তদেব; পৃ. ৮।

৭৬. 'যদুনাথ সরকার', পৃ. ৭৪।

রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী ও যদুনাথ সরকার

১৯২০–২১-এ প্রায় চোদ্দ মাস ইয়োরোপ-আমেরিকা সফর শেষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন পৌঁছলেন ১৯২১ সালের ১৮ জুলাই। তিন সপ্তাহ পরে, ১৯২১-এর ৭ আগস্ট তিনি যদুনাথ সরকারকে লিখেছিলেন : "দেশে ফিরে এসে অবধি আপনাকে দেখবার জন্যে একান্তমনে কামনা করেছি। কটকে আপনাকে পত্র লিখতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে আপনার পত্র ও বই কয়টি পাওয়া গেল। কবে দেখা হবে? যদি ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে আপনার আসবার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে তাহলে সময় পেলে আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাই।"[১] এই চিঠির যদুনাথ-প্রদত্ত উত্তর বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত নেই। এই সময়ে দুজনের কোনো সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা তাও জানা যায় না। যদুনাথ তখন কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করছেন। আর বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান রচনা নিয়ে কবি তখন ব্যস্ত ও মগ্ন।

সাক্ষাতের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাকুলতার একটি কারণ নিশ্চয়ই বিশ্বভারতী সম্পর্কে আলোচনা; দ্বিতীয় কারণ, সিলভ্যাঁ লেভির শান্তিনিকেতনে আসন্ন আগমন (লেভি সস্ত্রীক আশ্রমে আসেন ১৯২১-এর ৯ নভেম্বর)। কাছাকাছি কোনো সময়ে একটি তারিখহীন চিঠিতে সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ যদুনাথকে জানিয়েছিলেন : "The poet has asked me to write to you and ask if it would be possible for you to come to Calcutta towards the end of this week ... He has very much that he wishes to talk over with you and he is very anxious indeed to see you."[২] এই চিঠিরও যদুনাথ-প্রদত্ত উত্তর রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে নেই।

আরও মাস চারেক পরে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদসভার প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হল। ১৯২১-এর ২৩ ডিসেম্বর আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হাতে উৎসর্গ করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ' ও বিশ্বভারতী পরিচালনার জন্য নির্মীয়মান সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্তরূপ গৃহীত হল। নেপালচন্দ্র রায় সংবিধানের সংক্ষিপ্তরূপ উপস্থিত করে প্রস্তাব করলেন : "আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অধিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া লইবেন।"[৩] অনুরূপভাবে শিশিরকুমার মৈত্রও উক্ত সংবিধানের ১২, ২৩ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে 'প্রথম তালিকা প্রস্তুত করিবার এবং

কর্মসমিতি ও শিক্ষাসমিতির প্রথমবর্ষের সভ্য নিযুক্ত করিবার ভার' অর্পণ করার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। এই সভায় যদুনাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন না।

বিশ্বভারতীর খসড়া সংবিধানের এই পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সময়েই ১৯২২-এর ২১ মে যদুনাথ সরকারকে বিশ্বভারতী-সংসদের সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিঠিটি অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের ৩১ মে, ১৯২২ তারিখের পত্রে এই চিঠির উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যদুনাথ ৩১ মে (১৯২২) যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন ও তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ২ জুন (১৯২২)-এর পত্র— এই দুটি চিঠি নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য। দুটি চিঠিরই পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রয়েছে। যদুনাথের স্বহস্তে লিখিত ষোলো পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠি ও রবীন্দ্রনাথের ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী উত্তর— এই দুটি পত্রই বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী', চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্যায় এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সম্পাদনায় 'চিঠিপত্র ১৫'তে সংগৃহীত হয়েছে। 'প্রবাসী'তে প্রকাশের সময়ে যদুনাথ তাঁর পত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। সেই কারণে আমার আলোচনায়, যদুনাথের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির পাঠ অনুসরণ করব। দুটি চিঠিরই তাত্ত্বিক পটভূমি এতই বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির যথাযোগ্য আলোচনার প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে আমি ফিরে আসবো। ইতিমধ্যে যদুনাথ-বিশ্বভারতী ইতিবৃত্তটি আর একটু অনুধাবন করা যাক।

যদুনাথের চিঠির উত্তরে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ২ জুন, ১৯২২-এ লিখিত পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে লিখলেন: "আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন। ...কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব।"[৪] একই তারিখে (২ জুন, ১৯২২) তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখলেন: "যদুনাথ সরকার মহাশয়ের একখানি দীর্ঘপত্র পেয়েছি। তার সারমর্ম এই যে তিনি বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করতে অসম্মত। সমস্ত চিঠিটা দেখলে বুঝতে পারতে একটা প্রবল প্রতিকূলতা এর মধ্যে আছে... যদুবাবুর মধ্যে খুব একটা সত্য আছে— তিনি আমাকে অনাদর করলেও আমি তাঁকে করতে পারিনে— সেইজন্যই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়ে আমি এমন ব্যথা বোধ করছি। যাই হোক্ ওঁর নামটা কেটে দিতে হবে।"[৫] প্রশান্তচন্দ্রকে এ-চিঠি লেখার কারণ এই যে তিনি তখন নবজাত বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিব (অন্যজন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ঠিক একমাস পরে, ২ জুলাই, ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথ আবার প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন: "রামানন্দবাবুকে কি যদুবাবুর চিঠি ও আমার উত্তরটা দেখিয়েচ? যদুবাবুর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে কি?"[৬] ১৯২২-র জুন মাস থেকে ১৯২৭-র নভেম্বর মাস পর্যন্ত যদুনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো পত্রবিনিময় হয় নি, কিন্তু কবি

যদুনাথ প্রসঙ্গ থেকে দূরেও থাকেন নি।[৭] ইতিমধ্যে ১৬ মে, ১৯২২-এ বিশ্বভারতীর সংবিধান ও নিয়মাবলী রেজিষ্ট্রি ও মুদ্রিত হয়েছে। ২ জুন (১৯২২)-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথের নাম প্রত্যাহরণের কথা লিখেছিলেন; প্রশান্তচন্দ্রকেও একই নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মুদ্রিত সংবিধানের সদস্য তালিকা থেকে যদুনাথের নাম প্রত্যাহৃত হয় নি। 'রবিজীবনী'-কার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন: "কিন্তু এর আগেই সংবিধান ছাপা হয়ে গিয়েছিল বলে যদুনাথের নাম বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি, আমরা যে কপিটি দেখেছি তাতে নামটি কাটা নেই।"[৮] তথ্যটি সম্ভবত নির্ভুল। কিন্তু তাহলে তো বলতে হয় যে সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আগে যদুনাথের সম্মতি নেওয়া হয় নি। বিশ্বভারতীর সংবিধান প্রস্তুতিপর্বে, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'ট্রাস্টি, জেনারেল কমিটির সদস্যদের নাম আর একটু অপেক্ষা করে নির্বাচন করলেই ভালো হয়। তেমন তাড়াতাড়ি নেই। আপাতত শিক্ষাসমিতি আর কর্মসমিতি নিযুক্ত করে দিলেই চলবে। কর্মসমিতিতে জেনারেল কমিটির পক্ষ থেকে ৪ জন আর আপনি নিজে একজন নিযুক্ত করবেন কথা আছে। সুরেনবাবু, রামানন্দবাবু, নেপালবাবু, হীরেনবাবু, আর যদুবাবুর নাম প্রথমেই মনে আসে—'[৯] হয়তো এইভাবেই সদস্য-তালিকায় যদুনাথের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল— যদুনাথের সম্মতি ছাড়াই।

এই পর্যন্ত বিশ্বভারতী-যদুনাথ ইতিবৃত্তের অনুধাবনে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু একটু অবাক হতে হয় যখন দেখি যে বিশ্বভারতী-সংবিধানের রেজিষ্ট্রেশনের এক সপ্তাহ পর, ২৩ জুলাই, ১৯২২ তারিখে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী সংসদের প্রথম অধিবেশনেও যদুনাথ প্রসঙ্গ ওঠে নি। প্রতিবেদনের দুই নম্বর সিদ্ধান্তে তিরানব্বই জন সাধারণ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়; সেই নামের তালিকায় বিরানব্বইতম নামটি ছিল যদুনাথ সরকার। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।[১০] শুধু তাই নয়। সংসদের চতুর্থ অধিবেশন (১৯২২) অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, ১৯২২-এর ১৮ নভেম্বর তারিখে। অধিবেশনের তিন নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সংসদের কাছে আটজন নতুন সদস্যের মনোনয়নের জন্য তিপ্পান্নটি নাম সম্বলিত একটি মুদ্রিত বিজ্ঞাপ্তি উপস্থাপিত করেন। এই তালিকায় একুশ নম্বর নামটি ছিল যদুনাথ সরকারের। এই অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১১]

একমাস পরে, বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল শান্তিনিকেতনে, ১৯২২-এর ২৪ ডিসেম্বর তারিখে, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনের পাঁচ নম্বর সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হল: "The following Sadasyas were declared elected members of the Samsad (Governing Body) : Ramananda Chatterjee, Abanindranath Tagore, W.W. Pearson, Jadunath Sarkar, Meghnad Saha, Asit kumar Haldar, Hemlata Tagore and Pratima Tagore."[১২] অবশেষে, ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম

অধিবেশনে যদুনাথের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯২৩), শান্তিনিকেতনে। অধিবেশনের প্রথম সিদ্ধান্তটি এই রকম: "Read a letter from Jadunath Sarkar resigning membership of the Samsad as it will not be possible for him to attend its meetings from a distance. Resolved that the resignation be accepted with regrets."[১৩]

লক্ষণীয়, সংসদের উক্ত অধিবেশনে গৃহীত যদুনাথের পদত্যাগের কারণ হিসেবে বিশ্বভারতী সম্পর্কে তাঁর সংশয়ের কথাটি কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাই নি তা হল সংসদের সদস্য তালিকা থেকে যদুনাথের নাম প্রত্যাহরণের বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রতার কারণ কি এই যে দীর্ঘ সাত মাস ধরে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যদুনাথ হয়তো তাঁর মত পরিবর্তন করবেন? হয়তো রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে খানিকটা সচেষ্টও হয়েছিলেন; প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা তাঁর ২ জুলাই, ১৯২২-এর পূর্বোধৃত চিঠিতে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। নাকি, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যদুনাথের কাছ থেকে একটি বিধিসম্মত পদত্যাগপত্রের জন্য অপেক্ষা করছিলেন— এমন একটি পদত্যাগপত্র যাতে বিশ্বভারতী সম্পর্কে বিতর্কের কোনো প্রসঙ্গ থাকবে না?

২.

১৯২২-এর ৩১ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের দীর্ঘ পত্রটি দুটি কারণে বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। প্রথম কারণটি অন্য একটি প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।[১৪] সেখানে লিখেছিলাম, যদুনাথের দীর্ঘ পত্রের পেছনে স্পষ্টতই এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরের পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা। আরো লক্ষণীয় যে এই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণাদুটি কোনো ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক প্রতিক্রিয়া নয়— এদের পশ্চাদপটে রয়েছে ভিক্টোরিয় ইংলন্ডে বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত বিতর্কের দীর্ঘ অর্ধশতকের ইতিহাস। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন। তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা'। আর যদুনাথের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার বিতরণ।[১৫] বিষয়টি বিশদ করা প্রয়োজন এবং এই প্রবন্ধের শেষাংশে আমি সেই আলোচনায় ফিরে আসব।

দ্বিতীয় কারণটির গুরুত্ব প্রধানত ঐতিহাসিক। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে যদুনাথের দীর্ঘ চিঠিটিই সম্ভবত বিশ্বভারতীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বারংবার তাঁর চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে ও ভাষণে তাঁর দেশবাসীর বিশ্বভারতী-বিরোধিতার কথা বলেছেন। ১৯১৯-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি ত্রিচিনাপল্লী থেকে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: "শান্তিনিকেতন যদি সত্যকার জিনিস না হয় এবং স্থায়ী না হয় তবে মলে আমার সে লজ্জা যাবে না। বাইরের

লোকে ওকে যেরকম করে দেখচে আমাদের অধ্যাপকেরা এখনো সেরকম করে দেখ্‌তে পাচ্চেন না। সেইজন্যই আমি উদ্বিগ্ন আছি।"[১৬] ২৪ মার্চ, ১৯১৯-এ বিশ্বভারতীর ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মরণীয় নিবন্ধ "The Centre of Indian Culture" শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান। পাঠান্তে অধ্যাপকেরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলেন; কিন্তু কোনো অর্থবহ আলোচনা বা বিতর্ক হয়েছিল কিনা জানা যায় না। ২৭ এপ্রিল, ১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : "জানি না আমার মধ্যে কি একটা ত্রুটি আছে যেজন্য আমার দেশের লোককে আমি আমার কাজে আহ্বান করে সঙ্গে পাই নে। আসল কথা, দল বাঁধতে গেলে খাঁটি সোনায় বিস্তর মিথ্যার খাদ মিশাতে হয়— অনেক ভরং এবং লোকের মন জোগাবার জন্যে অনেক অত্যুক্তি দরকার হয়ে পড়ে, তাতে কর্মসাধনার বিশুদ্ধতা এবং তার স্বাধীনতা নষ্ট হয়।"[১৭] প্রায় তিনবছর পর, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ তারিখে অম্বিকাচরণ উকিলকে লিখেছিলেন: "বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দেশের লোকের মন চঞ্চল আছে বলিয়া আমার এ কাজকে এখনো সাধারণে গ্রহণ করে নাই, বরঞ্চ বাধা পাইতেছি। চিরদিন বিনা সহায়ে ও প্রতিকূলতার মধ্যেই কাজ করিয়া আসিয়াছি এখনো তাহাই করিতে হইবে— তাহাতে ক্ষতি হইবে না।"[১৮] শুধু চিঠিপত্রেই নয়, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছর ধরে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন— যে ভাষণগুলি 'বিশ্বভারতী' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়— সেই রচনাগুলিতেও তিনি দেশবাসীর বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন বার বার।[১৯]

প্রায় তিন দশক আগে "বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাপর্বে রবীন্দ্র-বিরোধিতা" নামক একটি প্রবন্ধে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছিলেন: "বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালেও... দেশের শিক্ষিতদের একদল গুরুদেবের এই নতুন শিক্ষাচিন্তাকে স্বীকৃতি দিতে ত চাইলেনই না, উপরন্তু বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনেরও সৃষ্টি করেছিলেন।"[২০] সমস্ত নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক রচনা, বক্তৃতা ও চিঠি থেকে সংকলিত উদ্ধৃতি দিয়ে ভরা। কিন্তু বিশ্বভারতীর আদর্শ ও লক্ষ্যের কোনো মননশীল ও অ্যাকাডেমিক সমালোচনার উল্লেখ তিনি করেন নি। বিরুদ্ধবাদীদের শান্তিদেব তৎকালীন অসহযোগ-আন্দোলনকারীদের একাংশ হিসেবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ছাড়া যে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন, সেটি 'নারায়ণ' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় [১৩২৮?] প্রকাশিত শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়ের "বর্তমান ভারত ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। এই উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রীর ধারণা সম্পর্কে অনেক কথা থাকলেও, বিশ্বভারতীর কর্মকান্ড সম্পর্কে কিছুই নেই। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২১-এ আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাস-রচিত সভাপতির অভিভাষণের উল্লেখও করেছেন শান্তিদেব। সেই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কিছু তীক্ষ্ণ মন্তব্য ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার

অভিপ্রায় ও পটভূমি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। বস্তুত, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় নবজাত বিশ্বভারতী সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার নজরে পড়ে নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকান্ডকে ঘিরে জাতীয়স্তরে কোনো বিতর্কের সূচনা হয় নি। রবীন্দ্রনাথকে জনান্তিকে অনেক কটুকথা শুনতে হয়েছে, অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়েছে; কিন্তু বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে কোনো চিন্তাশীল আলোচনা নজরে পড়ে না। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রধানত এ-বিষয়ে নিঃসাড় ছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম যদুনাথ সরকার। রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সেই প্রসঙ্গে আসার আগে আরেকটি সংশ্লিস্ট বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

সম্প্রতি অধ্যাপক অভ্র ঘোষ "বিশ্বভারতী ও 'অবজ্ঞাপূর্ণ নিষ্ঠুর' একটি চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন : "১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পর কবির নাইটহুড ত্যাগের ঘটনা রাজভক্ত রোটেনস্টাইনকে খুবই বিচলিত করেছিল। জনসমক্ষে কবির কোনো কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁর দ্বিধা ছিল। সেই প্রেক্ষিতেই ১৯২০-তে বিশ্বভারতীর সংকল্প প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে যান তখন *রোটেনস্টাইন কপটতার আশ্রয় নিয়েই কবির সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।*"[২১] (বক্ররেখ আমার)। অভিযোগটি গুরুতর, তাই একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

এ-কথা ঠিক যে ১৯২০-২১-এ ইয়োরোপ ও আমেরিকা সফরের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডে তাঁর বন্ধুদের ব্যবহারে উষ্ণতার অভাব লক্ষ করেছিলেন। কারণটা নিঃসন্দেহে কবির নাইটহুড বর্জন। তাঁর দিনপঞ্জীতে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "Father felt that his acquaintances wanted to keep aloof because he had given up his title... It is quite true that Father's reception here has been cold this time. We have all felt that (19 June, 1920)." ২৭জুন, ১৯২০-এর দিনলিপিতে রথীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন : "I heard from Pearson that the lecture [Tagore's lecture, "The Message of the Forest" at Oxford on 18 June, 1920] was well received in Oxford... Father did not meet either Masefied or Robert Bridges who were there— neither did Rothenstein turn up as he had promised. He afterwards gave a lame excuse of not finding the hotel and also told Pearson that R. Briddges had written to Father asking him to stay as his guest. Father never got any letter— so there can be no truth in that."।[২২] উদ্ধৃতির শেষাংশটি অবশ্য সত্য নয়। রবার্ট ব্রিজেস বাস্তবিকই এরকম একটি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, ১৫ জুন, ১৯২০-তে। সে-চিঠি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ চিঠিটি রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত রয়েছে।[২৩]

কিন্তু এই প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও ১৯২০-এর জুন-জুলাই মাসে রোটেন-স্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা ব্যাহত হয় নি। রথীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন :

"June 17, 1920 : Of course we are seeing a lot of the Rothensteins. Father goes there quite frequently, but not so often as he used to when he came last time... However, he has been able to meet many of his old friends and acquaintances at Rothenstein's house."[২৪] সম্ভবত এই সব সাক্ষাৎকারের সময়েই রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের মধ্যে বিশ্বভারতী সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। তাঁর পঞ্চম বিদেশ সফরের (১৯২০-২১) সময়ে রবীন্দ্রনাথ, কেদার দাসগুপ্ত ও পিয়ার্সন সহ ইংলন্ড ছেড়ে আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দেন ১৯২০-এর ২০ অক্টোবর। দীর্ঘ সাড়ে চার মাস আমেরিকা ভ্রমণের শেষে তিনি আবার লন্ডনে ফিরে আসেন মার্চ (১৯২১) মাসের ৩১ তারিখে। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের পত্রালাপ রক্ষিত হয় নি। এবারেও কবি লন্ডনে থাকেন নি বেশিদিন। ইয়োরোপ সফরের উদ্দেশে তিনি সপরিবারে লন্ডন ত্যাগ করেন ১৬ এপ্রিল, ১৯২১-এ। প্যারিস থেকে ১৭ এপ্রিল (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লিখছেন : "Let me remind you of our conversation about the International University. *It was decided that a committee should be formed in England which would help the committee in India about the selection of teachers and students belonging to Europe and about other matters which would be more convenient for them to deal with.* I hope it will be possible for you with the help of Mr. Montagu, Lord Carmichael and other sympathisers to make a draft of rules and a list of names of those who will be likely to join us."[২৫] (বক্ররেখ আমার)। টীকায় রোটেনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলির সম্পাদিকা, মেরি লেগো, জানিয়েছেন: "Rothenstein hoped to recruit Herbert Fisher and Michael Sadler as well, altogether a group impressively influential, well-disposed, and well-informed."[২৬]

আশ্চর্যের কথা এই যে, পরের দিনই, অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। সেই দিন অ্যান্ড্রুজকে লিখলেন : "All my works have their roots in my dreams. But an International University needs a foundation, and not roots. It needs to be solidly built upon international boards and committees and funds... The whole thing will have to be established on a permanent basis; but this so called permanence is only bought at the cost of life and freedom. The cage is permanent, not the nest."[২৭] ২৪ এপ্রিল (১৯২১) অ্যান্ড্রুজকে আবার লিখলেন : "I have a suspicion in my mind that they want to kill my work in its infancy with the pelting of their help. At any rate they want to tame it and exhibit it with pride in their own managerie."[২৮] ইতিমধ্যে রোটেনস্টাইন

রবীন্দ্রনাথের ১৭ এপ্রিলের চিঠির উত্তরে জানালেন : "I went to dine with Lord Carmichael last night, to talk over your great scheme. He fully realises the importance of it and believes important things will come of it. He feels, as you know, as strongly as I do that a committee of Trustees should first be framed... Until you have something of the kind it will be difficult for you to get the people you want, true scholars, to go out to India, and as things are now, there is the danger of people whom you don't want streaming in. (23 April, 1921)"[২৯] রোটেনস্টাইনের চিঠি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পরের দিনই পেয়েছিলেন। সেইদিনই (২৪ এপ্রিল, ১৯২১) তিনি রোটেনস্টাইনকে অনাবশ্যকভাবে তীব্র ভাষায় লিখলেন : "When I sent my appeal to Western people for an International Institution in India I made use of the word 'University' for the sake of convenience... I should not allow my idea to be pinned to a word like a dead butterfly for a foreign museum... I saved my Santiniketan from being trampled into smoothness by the stream roller of your Education department ... I am proud of the fact that it is not a machine-made article perfectly modelled in your workshop— it is our very own... very likely I shall never be able to work in harmony with a board of trustees, influential and highly respectable, for I am a vagabond at heart." চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে জানালেন: "This letter of mine is only to let you know that I free myself from the bondage of help and go back to the great Brotherhood of the Tramp, who seem helpless, but who are recruited by God for his own army."[৩০] এই চিঠির একটি কপি রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকেও পাঠিয়েছিলেন।

ক্ষুব্ধ রোটেনস্টাইন ২৮ এপ্রিল (১৯২১) পত্রোত্তরে লিখলেন : "— indeed I am neither a believer in machines, nor an inspector of schools, nor an enemy of freedom, yet you wrote as though I were all those things." আর চিঠির শেষে জানালেন: "No more sensible words shall come from me to irk your spirit."[৩১] এরপরেও রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের মধ্যে দু-তিনটি চিঠির বিনিময় হয়েছিল, তারপর উভয়ের পত্রালাপ এক বছরেরও বেশি বন্ধ হয়ে যায়।

রোটেনস্টাইনের ২৩ এপ্রিল, ১৯২১-এর পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ২৪ এপ্রিলের চিঠির অসহিষ্ণুতা আমাদের একটু অবাক করে। কেন লিখেছিলেন তিনি ঐ চিঠি? বিশ্বভারতীর জন্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার অনুরোধ তো রবীন্দ্রনাথই জানিয়েছিলেন রোটেনস্টাইনকে মাত্র এক সপ্তাহ আগে, ১৭ এপ্রিল, ১৯২১-এর চিঠিতে? তাছাড়া ১৯২১-এর ডিসেম্বরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তো বিধিবদ্ধ সংবিধান প্রণয়ন ও নানাবিধ সমিতি ও উপসমিতির গঠন তাঁকে করতে হয়েছিল? এমন-কি, ১৯২৩-এর ২৬ জুলাই, রবীন্দ্রনাথ, নীলরতন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে বিশ্বভারতীর জন্য যথাবিধি ট্রাস্টিও গঠিত হয়েছিল?[৩২]

১ জুন, ১৯২২-এ রোটেনস্টাইন ক্ষোভ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : "...it would seem a little ungrateful if you had no thought for one who had so much of your confidence when you were here and with whom you discussed your Bolpur plans so intimately."[৩৩] এই চিঠির উত্তরে, প্রায় দেড় মাস পর, ১৩ জুলাই, ১৯২২-র লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর ১৯২১-এর এপ্রিল-মে মাসের সাময়িক উত্তেজনার কারণ জানিয়ে রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন: "When I was last in the United States... I realised more strongly than ever before how we and our work are suspiciously watched and judged by the ruling race principally from the point of view of British interest. I was in a bitter state of mind in consequence of this when your letter came to me with the suggestion that a board should be appointed in England ... I was afraid that such a board would be dominated over by bureaucrats whose policy is to view all our doings with distrust... But all this is not to discuss the subject but to offer you an explanation of my conduct. Now that is given it helps me to feel ashamed and sorry for having indulged in a fit of fretfulness for so lnog..."[৩৪]

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝতেন, রোটেনস্টাইন তা বুঝতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে রোটেনস্টাইনের মনে ছিল এক বিধিবদ্ধরূপ, সাংগঠনিক তৎপরতা এবং সরকারি সাহায্যের নিশ্চিন্ত আশ্বাস। এই ধারণার কথাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন তাঁর ২৩ এপ্রিল, ১৯২১-এর চিঠিতে। সেখানে রোটেনস্টাইন কোনো 'কপটতার আশ্রয়' নিয়েছিলেন বলে তো মনে হয় না।

৩.

২৪ এপ্রিল, ১৯২১-এ ফ্রান্স থেকে অ্যান্ড্রুজকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ইংরেজ ও মার্কিনি বন্ধুদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করেছিলেন। এই চিঠির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাঁর বিদেশি বন্ধুদের 'বিশ্বভারতী বিরোধিতা'য় রবীন্দ্রনাথ ততটা উদ্বিগ্ন হন নি, যতটা হয়েছিলেন তাঁর স্বদেশে অসহযোগ আন্দোলনের চেহারা দেখে। এই আন্দোলনের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন বিশ্বভারতীর প্রতি বিরুদ্ধতা। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিচর্চার মিলনকেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতীর রূপরেখা বাস্তবায়িত করতে

কৃতসংকল্প (বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপন ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮-তে হলেও কাজের সূচনা হয়েছিল ৩ জুলাই, ১৯১৯ সালে), তার কয়েকমাস পরেই ১৯২০-এর ফেব্রুয়ারিতে মহাত্মা গান্ধি ও মৌলনা আজাদ একত্রে অসহযোগ আন্দোলনের কমসূর্চি তৈরি করলেন। এই কর্মসূচি কলকাতায় অনুষ্ঠিত (সেপ্টেম্বর ৪-৮, ১৯২০) জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হল।

রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা ও কর্মসূচি যে তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রায় চোদ্দ মাস সফর শেষে রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে ফিরলেন (কবি মুম্বই পৌঁছন ১৯২১-এর ১৬ জুলাই) অসহযোগ আন্দোলন তখন তুঙ্গে। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো ক্লান্ত মুহূর্তে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সীতা দেবী তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন: "অসহযোগের বন্যা তখন (জুলাই ১৯২১) দেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে জিনিসটা বেশ কিছু বিচলিত করিয়াছে বোধ হইল। দেশে ফিরিয়াই তিনি এমন-সব চিঠি পাইতে ছিলেন এবং এমন-সব কথা শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার মন খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। এমন-কি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পও যেন আর তাঁহার মনে স্থির থাকিতেছিল না। তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত দুই-একজনের ব্যবহার তাঁহাকে এই কঠিন আঘাত দিয়াছিল।"[৩৫]

'রবিজীবনী'-কার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন : "রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক একটি জীবনচিত্র পাওয়া যায় 26 July [মঙ্গল ১০ শ্রাবণ] এডোয়ার্ড টমসনকে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি পত্রে। তিনি লেখেন, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে থাকার সময়ে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে এসে তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি খুবই ভুল করেছেন, এই পরিকল্পনা সফল হবার কোনো আশা নেই। রাজনীতিকরা কিভাবে তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত করেছেন তাঁর বর্ণনা দিয়ে প্রশান্তচন্দ্র লেখেন, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দু-তিন দিন এসে অসহযোগ ও 'the eternal charka'-র আদর্শ বোঝাবার জন্য দীর্ঘ বিতর্ক করেন। ...এমন-কি শান্তিনিকেতনেও গান্ধীবাদ এতটাই দৃঢ়মূল যে সেখানেও তাঁর মানসিক বিশ্রাম নেই।"[৩৬]

একই হতাশার সুর আমরা শুনতে পাবো টমাস স্টার্জ মুরকে লেখা একটি চিঠিতে। ২০ অক্টোবর, ১৯২১-এ লেখা সেই পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "The strenuous feeling of opposition struggling within me against the political fanaticism which has been blinding our vision, blurring our perspective of humanity was wearing me out, because it was alien to my own realm of truth. I know, as a poet, my work is not for achieving immediate results in urgent human affairs."[৩৭] সজনীকান্ত দাসও এই রাজনৈতিক উত্তাল অবস্থার স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে : "...কবির বিদেশে অবস্থানকালেই ১৯২০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গোড়া হইতে মহাত্মা গান্ধীর

অসহযোগতত্ত্ব সারা ভারতবর্ষে তোলপাড় তুলিল, ঢেউ গিয়া নিখিল বিশ্বের সহযোগকামী, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে বিশ্বের বিবুধমণ্ডলীর আমন্ত্রণবাহী রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করিল। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠারূপ সুমহৎ কার্যের প্রাক্কালেই এই জাতিগত বাধার আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরে অসহযোগকে কার্যকরী করার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই তাহা উত্তাল হইয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিল। সি.এফ. অ্যান্ড্রুজ ও বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদলাভে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাভূমি শান্তিনিকেতনেই অসহযোগ প্রবল আকারে দেখা দিল। দূর হইতে প্রেরিত সত্য-মিথ্যা নানা খবরে বিচলিত, বিরক্ত ও বিব্রত রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিরোধ পূর্ব ও পশ্চিমে ঘনাইয়া উঠিতেছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ তিনি আশ্রমে ফিরিয়াই 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১১ই অগস্ট কলিকাতায় আসিলেন।"[৩৮]

সাময়িক হতাশা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেছেন ক্লান্তিহীনভাবে। বস্তুত, রবীন্দ্র-জীবনের এই স্বল্পস্থায়ী পর্বকে অসহযোগীদের বিশ্বভারতী-বিরুদ্ধতা না বলে রবীন্দ্রনাথের গান্ধি-বিরোধিতা বলাই ভালো। এই সময়ে লিখিত তাঁর অসংখ্য চিঠি-পত্রে ও রচনায় গান্ধি-বিরোধিতার তীব্রতা লক্ষ করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ গান্ধির আদর্শের একটি বিকল্প ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিশ্বভারতীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। এই বিরোধিতার সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিদেশে অবস্থানকালেই। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন : "রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় রাজনীতির সংবাদ পৌঁছিতেছে, তিনি দূর হইতে দ্রষ্টার ন্যায় বিচার করিতেছেন।"[৩৯] ঠিক দ্রষ্টার মতো নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে হয়তো নয়। অসহযোগ আন্দোলনের খবরে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০-তে জগদানন্দ রায়কে লিখলেন : "Non-cooperation অকাজ— তার আবির্ভাব অন্তিমে ... অ-কাজ করার উপলক্ষে যে মিল সে কখনই সত্য ও স্থায়ী হতে পারে না।"[৪০] ইতিমধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের শেষে, গান্ধিজি বিশ্রামের জন্য সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এলেন ১১ সেপ্টেম্বর (১৯২০)। মহাত্মা গান্ধির আগমনে শান্তিনিকেতনেও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা দেখা দিল। অশীতিপর বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে আশীর্বাদ করলেন; অ্যান্ড্রুজ ও বিধুশেখর শাস্ত্রী গান্ধির অসহযোগতত্ত্বের সমর্থন করলেন অকুণ্ঠভাবে। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন : "বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে অসহযোগের প্রশ্ন লইয়া দুইটি দল হইয়া গিয়েছে। অ্যান্ড্রুজ, বিধুশেখর, অনিল মিত্র, সিন্ধি ডাক্তার চিমনলাল প্রভৃতিরা অসহযোগী, অপরপক্ষে জগদানন্দ রায়, প্রাক্তন ছাত্র যাঁহারা এখন শিক্ষক ও আমি।"[৪১]

এ-সব কথা অবশ্য অ্যান্ড্রুজই জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে। হয়তো

সেই কারণেই উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ ১৯২০-এর ৪ নভেম্বর তারিখে নিউইয়র্ক থেকে অ্যান্ড্রুজকে লিখলেন : "Keep Santiniketan away from the turmoils of politics. I know that, political problem is growing in intensity in India and its encroachment is difficult to resist. But all the same we must never forget that our mission is not political. Where I have my politics I do not belong to Santiniketan."[৪২] বস্তুত, এই পর্বে গান্ধি-অ্যান্ড্রুজ সখ্যতায় রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বিব্রতবোধ করছিলেন। অ্যান্ড্রুজের জীবনীকার হিউ টিন্‌কার (Hugh Tinker) লিখেছেন : "... Tagore seemed to believe that Andrews was encouraging Gandhi's campaign and bringing his ideas into Santiniketan. Worried about his new Visva-Bharati, he imagined that Andrews' political extremism would drive away Western scholars and Western money..."[৪৩] অসহযোগ সম্পর্কে অ্যান্ড্রুজ যে সম্পূর্ণ নিদ্বর্ন্দ্ব ছিলেন, মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরার পর (জুলাই ১৯২১) গান্ধিজির একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই একবার এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯২১-এর ১৪ সেপ্টেম্বর, গান্ধিজি অ্যান্ড্রুজকে লিখেছিলেন : "Mahadev has given me a graphic description of Santiniketan. It has made me sad. There is division there and even bitterness. You yourself are torn by internal conftict, he says. I know that you will find peace. Whether I lose you in the struggle or keep you, [you] will remain the same to me..."[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরার আগেই অবশ্য অসহযোগ-বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনে। আশ্রমের তিনজন অধ্যাপক— ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায় ও কালীমোহন ঘোষ— শান্তিনিকেতন ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।[৪৫] ১৯২১-এর ৮ মার্চ তারিখে শিকাগো থেকে রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে লিখেছিলেন : "আমার দেশে ফেরবার সময় কাছে এসেছে। একদিকে মন যেমন খুশি হচ্ছে, তেমনি আর-একদিকে ভয় লাগ্‌ছে পাছে দেশের লোকের সঙ্গে আমার সুর না মেলে। Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগলিক অপদেবতা... সেই ভূত ছাড়াবার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তারি আয়োজন করছি। দেবতার নাম করলে তবেই অপদেবতা ভাগে... আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথ্‌চি। দেশের নাম করে এখানে যদি আমরা কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি তাহলে দেবতার প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়া হবে। যে ভারতবর্ষকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী একঘরে করে রেখেছে সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করবার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম— পাছে কিছুতে এই নিমন্ত্রণের পথ রোধ করে সেই আমার ভয়... সেদিন যখন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেই দিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে..."[৪৬]

একই দিনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকেও লিখছেন : "দেশে নন্‌-কোঅপারেশনের যে বান ডেকেচে তার প্লাবন আমাদের আশ্রমে এসেও প্রবেশ করেচে তা বেশ বুঝতে পারচি। ... কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। ...আমরা মানবের কল্যাণকামনা ও লোকহিতানুষ্ঠান করব, কিন্তু সেকি কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের অনুগত হয়ে? ... শান্তিনিকেতনকে আমরা যদি কোনো একটা রাষ্ট্র-বিপ্লবের কেন্দ্রস্থান করে তুলি তাহলে কি আমাদের আশ্রমের অসম্মান হয় না? ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের সঙ্গে আড়ি করে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা আমি লজ্জাকর বলে মনে করি। ...একথা নিশ্চয় জেনো যে প্রমত্ততাকে পক্ষভুক্ত করে যখন কোনো কল্যাণকর্ম করবার চেষ্টা হয় তখন যত ধানের বীজ বোনা হয় তার চেয়ে কাঁটার বীজ বেশি পড়ে। বেড়া দেবার জন্য কাঁটা গাছেরই দরকার, ধান গাছের নয়— অতএব পোলিটিক্যাল রাগারাগির বেড়া, নন্‌-কোঅপারেশনের বেড়া যেখানে তুলতে হবে সেখানকার মালী সেখানকার নিয়মেই কাজ করুক— কিন্তু বিশ্বনীড়ে আমরা বিশ্বদেবের নামে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করেছি। সেখানে সকল রকম বেড়া ভাঙতে হবে।"[৪৭]

৮ মার্চ, ১৯২১-এ জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত পত্রটি 'প্রবাসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রতিবাদ করেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রতিবাদটি মুদ্রিত হয় 'প্রবাসী'তে, আষাঢ়, ১৩২৮ সংখ্যায়। আর মডার্ন রিভ্যুর (*The Modern Review*) মে, ১৯২১ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল অ্যান্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনটি চিঠি (চিঠিগুলির তারিখ যথাক্রমে ২, ৫, ১৩ মার্চ, ১৯২১)। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আশ্রমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য বিধুশেখর তাঁর প্রতিবাদে লিখেছিলেন : "রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইয়াছে বর্তমান অসহযোগ-আন্দোলন ভারতকে বিশ্বের সহিত যুক্ত না করিয়া তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে; ভারত ইহাতে বিশ্বের আলোককে বহিষ্কৃত করিয়া নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করিতে বসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এত দূর দেশে থাকিয়া এখানকার বিষয় প্রত্যক্ষত কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। সত্য তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে, কিন্তু অসত্য ও অর্ধসত্য সংবাদও যে তাঁহার নিকট প্রচুর যাইতেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার এই চিঠিখানাও তাহার একটা প্রমাণ। ... আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ এখানে উপস্থিত থাকিলে ও কথা বলিতেন না। মনে হয় তিনি তখন বরং ইহাই বলিতেন, এই আন্দোলনে ভারতের সহিত বিশ্বের যোগ-সাধনের বাধা ক্রমেই দূর হইতেছে, এবং ভারত নিজেরই অন্ধকারকে বহিষ্কৃত করিয়া বিশ্বের আলোককে পূজা করিতে বসিয়াছে...রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনে ভারতে ইংরেজ-বিদ্বেষের আশঙ্কা করিতেছেন। অমি তাঁহাকে এ বিষয়ে সান্ত্বনা দিতে পারি। আমি দেখিতেছি যে পদ্ধতিতে এই আন্দোলন চলিতেছে তাহাতেই এই ইংরেজ-বিদ্বেষ মূলত নষ্ট হইবে এবং হইতেছে।"[৪৮]

জগদানন্দ রায়কে লেখা ও 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮) মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের চিঠির ইংরেজি অনুবাদ গান্ধিজি পড়েছিলেন। 'ইয়াং ইন্ডিয়া' (*Young India*)

পত্রিকার ১ জুন, ১৯২১ সংখ্যায় গান্ধিজি কবির বক্তব্যের উত্তর দিলেন: "I have read his [Tagore's] letter to the Manager of Santiniketan. I am sorry to observe that the letter is written in anger and in ignorance of facts." এবং উত্তরের উন-শেষ অনুচ্ছেদে লিখলেন: "I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any."[৪৯] একই দিনে ইয়াং ইন্ডিয়া (১ জুন, ১৯২১)-তে গান্ধিজি লিখেছিলেন "The Poet's Anxiety" শীর্ষক আরেকটি ছোটো নিবন্ধ— অ্যান্ড্রুজকে লেখা ও মডার্ণ রিভিয়্যু পত্রিকার মে, ১৯২১ সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত তিনটি পত্রের উত্তরে। প্রায় আচার্য বিধুশেখরের ভাষাতেই গান্ধিজি সেই নিবন্ধে বললেন : "In all humility, I shall endeavour to answer the Poet's doubts... I would like to assure him and India that Non-coperation in conception is not any of the things he fears, and he need have no cause to be ashamed of his country for having adopted Non-cooperation... Nor need the Poet fear that Non-cooperation is intended to erect a Chinese wall between India and the West. On the contrary, Non-cooperation is intended to pave the way to real, honourable and voluntary cooperation based on mutual respect and trust."[৫০]

কিন্তু গান্ধিজি অথবা বিধুশেখর শাস্ত্রী— কারো কথাতেই আশ্বস্ত হন নি রবীন্দ্রনাথ। দেশে ফেরার কিছুদিন আগেও ২৬ মে, ১৯২১-এ সুইডিশ আকাদেমিতে অনুষ্ঠিত নোবেল-বক্তৃতায় নাম না করে গান্ধিজির অসহযোগ-আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "I do not think that it is the spirit of India to reject anything, reject any race, reject any culutre. The spirit of India has always proclaimed the ideal of unity... Now, when in the present time of political unrest the children of the same great India cry for rejection of the West I feel hurt."[৫১]

দেশে ফিরে আসার পর গান্ধিজির অসহযোগতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা তীব্রতর হয়েছিলে বলে মনে হয়। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন ১০ আগস্ট, ১৯২১-এর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ "আশ্রমবাসীদের সমক্ষে 'শিক্ষার মিলন' পড়িয়া শুনাইলেন।"[৫২] চিঠিপত্রের বাইরে, দেশের মধ্যে, গান্ধিজির অসহযোগনীতির এটাই প্রথম প্রকাশ্য সমালোচনা। প্রবন্ধটি কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আশুতোষ চৌধুরির সভাপতিত্বে দ্বিতীয়বার পঠিত হয় ১৫ আগস্ট, ১৯২১-এ, এবং ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে তৃতীয়বার পঠিত হয় ১৮ আগস্ট তারিখে অ্যালফ্রেড থিয়েটারে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে। প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তিকা ছাড়াও 'সবুজপত্র' ভাদ্র, ১৩২৮ এবং 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'-এর আশ্বিন, ১৩২৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[৫৩]

এই প্রবন্ধ অসহযোগ-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন "শিক্ষার বিরোধ" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। প্রবন্ধটি চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[৫৪] অসহযোগ-সমর্থকদের সমালোচনা ও শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য বিশদ করলেন "সত্যের আহ্বান" শীর্ষক নিবন্ধে। নিবন্ধটি ১৯২১-এর ২৯ আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে পঠিত হয় এবং 'প্রবাসী'-র কার্তিক, ১৩২৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[৫৫] "সত্যের আহ্বান"-এর ইংরেজি অনুবাদ "The Call of the Truth" প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভ্যু পত্রিকার ১৯২১-এর অক্টোবর সংখ্যায়। ইতিমধ্যে গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের বহু আলোচিত সাক্ষাৎকার ঘটেছে ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২১-এ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। চার ঘন্টাব্যাপী এই আলোচনার কোনো বিশদ বিবরণ জানা যায় নি। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই আলোচনায় কবি ও মহাত্মা মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন নি। 'ইয়াং ইন্ডিয়া' (১৩ অক্টোবর, ১৯২১) পত্রিকায় গান্ধিজি "The Call of the Truth"-এর উত্তর দিলেন "The Great Sentinel" নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন : "His essay ["The Call of the Truth"] serves as a warning to us all who in our impatience are betrayed into intolerance or even violence against those who differ from us. I regard the poet as a sentinel warning us against the approaching enemies called Bigotry, Lethargy, Intolerance, Ignorance, Inertia and other members of that brood." কিন্তু তার পরের অনুচ্ছেদেই বললেন : "But whilst I agree with all that the poet has said as to the necessity of watchfulness lest we cease to think, I must not be understood to endorse the proposition that there is any such blind obedience on a large scale in the country today. I have again and again appealed to reason, and let me assure him that if happily the country has come to believe in the spinning wheel as the giver of plenty, it has done so after laborious thinking, after great hesitation."[৫৬]

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : "১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রত্যাবর্তনের পালা শেষ হইল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ সার আশুতোষের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গেল; নিয়মিত স্কুল কলেজ চলিতে লাগিল।"[৫৭] কিন্তু বিশ্বভারতী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ কাটে নি। ৩১ অক্টোবর, ১৯২১-এ তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখলেন : "বিদ্যা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সম্প্রতি যে ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহাতে মনে বড় বেদনা পাইয়াছি।... নিজেকে বড় একলা বোধ হয়।"[৫৮] ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী পরিষদ-সভার প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণের শেষেও গান্ধিজির অসহযোগ-তত্ত্বের কথা স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথ

বলেছিলেন : "কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হতে যাচ্ছে।"[৫৯] এমনকি ১৯২২-এও যখন অসহযোগ আন্দোলনের আগুন প্রায় নির্বাপিত— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ২ আগস্ট বিদ্যাসাগরের মৃত্যু সাংবাৎসরিক সভার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ গান্ধি ও অসহযোগতত্ত্বের প্রসঙ্গ তুলে ছিলেন। প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত-অনুলিখিত এই ভাষণটি 'প্রবাসী'র ভাদ্র, ১৩২৯ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই ভাষণের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয় যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা উভয়কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি।... তাই আমরা একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলছি যে বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাশ্চাত্যবিদ্যা আমাদের সইবে না।"[৬০]

'রবিজীবনী'-কার জানিয়েছেন : "বস্তুত শুধু এই ভাষণেই নয়, এই সময়ের আরও অনেকগুলি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ নাম না করে গান্ধীজির পাশ্চাত্য-বিরোধিতার নিন্দা করেছেন...।"[৬১] এই গান্ধি ও অসহযোগ-বিরোধী পর্বের সমাপ্তি সম্ভবত ১৯২২ সালের নভেম্বরে ঘটে। ১৪ নভেম্বর, ১৯২২-এ ত্রিবান্দ্রম থেকে কবি কালিদাস নাগকে লিখলেন : "শান্তিনিকেতন এখন আর বোলপুরের কোণে নেই— বেড়িয়ে পড়েছে— এখন তার রথযাত্রা। আমি এতদূর আশা করিনি— কারণ গান্ধি তাঁর সন্ন্যাসীর কম্বল দিয়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বের কাছ থেকে ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন। প্রথম যখন দেশে ফিরে এলুম তখন দেখতে পেলুম বিশ্বমণ্ডলী থেকে ভারতবর্ষ দূরে চলে গেছে। ভারি উদ্বেগ মনে জেগেছিল... যাই হোক্ এখন দেখতে পাচ্চি, মাঝে ভারতবর্ষের বিশ্বচৈতন্যকে জোর করে চাপা দেওয়া হয়েছিল বলেই সে নিজের বিরাটকে ফিরে পাবার দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য এই যে, আমি কোথাও এবার বাধা পাইনি। পথ এখন প্রতিদিন সুগম হয়ে আস্‌চে এখন কেবল সহকারী সুহৃদবৃন্দের দরকার। এ পর্যন্ত পশ্চিম মহাদেশ থেকেই আনুকূল্যের প্রস্তাব এসেছে। এখন দেশের লোকের সহযোগিতার প্রতীক্ষায় আছি।"[৬২]

৪.

গান্ধিজির অসহযোগতত্ত্বের প্রভাবে ও প্রসারে সদ্যজাত বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে— এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই, অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে স্বস্তি ফিরে পেলেন তিনি। কিন্তু কবির ভিতরে আর একটি দ্বন্দ্বের অবসান এত সহজে হয় নি— হয়তো কোনোদিনই হয় নি। সেই দ্বন্দ্ব

বিশ্বভারতীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে ঘিরে। সমসাময়িক চিঠিপত্রে এই দ্বন্দ্বের স্বরূপটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে অনেক জায়গায়। ১৯২০–১৯২২-এ এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তরের কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৯২১-এর ১৮ এপ্রিল তারিখে প্যারিস থেকে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তারও প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে আগে। একই সময়ে লিখিত আরেকটি চিঠিতেও (তারিখহীন) রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে লিখেছিলেন একই কথা : "Santiniketan has been the playground of my own spirit. What I created on its soil was made of my own dream-stuff. Its materials are few; its regulations are elastic; its freedom has the inner restraint of beauty. But the International University will be stupendous in weight and rigid in construction, and if we try to move it, it will crack... Beware of organisation, my friend! They say organisation is necessary in order to give a thing its permanence, but it may be the permance of a tombstone."[৬৩] স্টার্জ মুরকে লেখা যে চিঠির (২০ অক্টোবর, ১৯২১) অংশবিশেষ আগে উদ্ধৃত হয়েছে, সেই চিঠির শেষাংশেও বিধিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংশয় ব্যক্ত করে লিখেছিলেন : "What have I to do with establishing solid institutions, fixed and firm upon big funds and public approbation! I clearly feel that it is wasting my life setting up stone idols on costly altars, some day they will all come down with their own weight."[৬৪]

বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার (২৩ ডিসেম্বর, ১৯২১) প্রায় একবছর পরেও রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধকরণ সম্বন্ধে স্বস্তিবোধ করেন নি। ৩০ আশ্বিন, ১৩২৯-এ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন : "যখন মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়— তখন বুঝতে পারি যখন কবিত্ব রচনা করেছি সেই ছিল আমার বাস্তব কাজ, শুভানুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেচি এই হচ্চে মায়া। এ কি টিকবে? আইডিয়া জিনিসটা সজীব, কিন্তু কোনো ইনস্টিট্যুশনের লোহার সিন্দুকেও তো তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না— মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল।"[৬৫] বস্তুত, এই সংশয় রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত ও পীড়িত করেছে আজীবন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ ও ২২ এপ্রিল, ১৯৩৭-এর দুটি চিঠিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রথম চিঠিতে (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) তিনি অসহযোগ-আন্দোলনের কালে বিশ্বভারতী-বিরোধিতার কথা স্মরণ করে বলেছেন : "যখন বিশ্বভারতীর আইডিয়াটাকে নিয়ে পড়েছিলুম, সেই আইডিয়াটা আমার কাছে ক্রমাগতই আকার দাবী করছিল। ... আমার এই কথাটা আমার সহযোগীরা কেউ গভীরভাবে সত্যভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এমন-কি পিয়ার্সনও নয়। অতএব *বিশ্বভারতী প্রায় একলা আমার মনে*

আইডিয়া রূপেই রয়ে গেল। কিন্তু তুমি জানো, আমি রূপকারের জাতি। আকারহীন আইডিয়া আমার কাছ থেকে কেবলি রূপের দাবি করে— যতক্ষণ সেই দাবী ব্যর্থ হতে থাকে ততক্ষণ আমি নিরন্তর দুঃখ পাই। ... আমার দুঃখ এই যে, আমি মনের মধ্যে স্পষ্টই দেখতে পেলুম, কিন্তু উপাদান জোগাড় হল না বলেই ওকে রূপ দিতে পারলুম না। তখন থেকে যে কষ্ট ভোগ করে এসেছি সে হচ্ছে সেই রূপকারের কষ্ট, যার পট কেনবার তুলি রং কেনবার সামর্থ্য নেই।" (বক্ররেখ আমার)।[৬৬] আর দ্বিতীয় চিঠিতে (২২ এপ্রিল, ১৯৩৭), তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "কনস্টিট্যুশনের ফাঁদে পড়ে আমার হাত থেকে এ এখন দশজনের হাতে পড়েছে। দশজনে মালমসলা জুটিয়ে গড়তে পারে, নিজের আনন্দে নিভৃতে সৃষ্টি করতে পারে না। তাদের কাজে নানা প্রকার জোগাড়যন্ত্রের দরকার এবং ভিড়ের হাটে যে জিনিষটার প্রচলিত মূল্য বেশি তারি পরে তাদের ঝোঁক বেশি। সেই জন্যেই বহু আপত্তি করেও কলেজটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলুম না। বাইরের দিকের অতি-বাড়ে এখন সব জিনিষটাই অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। অথচ এখনো এর দায় আমার এবং এর মান অসম্মান সমস্তই আমারি। ভাবের দিকে এ যতই শস্তা, ভারের দিকে ততই দুর্বহ।"[৬৭]

এই দ্বন্দ্ব ও সংশয় সত্ত্বেও বিশ্বভারতীকে বিধিবদ্ধ রূপ দিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেই। গড়তে হয়েছিল সাংগঠনিক পরিকাঠামো, আপোস করতে হয়েছিল তাঁর নানা অনিচ্ছা ও প্রতিকূলতার সঙ্গে, প্রধানত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তাগিদে। সেই ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তে, আর সেই ইতিবৃত্তেই নিহিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের দুই বিরুদ্ধ মতাদর্শের সূত্র। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে আমি অবশ্য আমার আলোচনাকে মূলত বিদ্যাভবনের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখব। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপরেখাটি মনে রাখলে এ-কথা বোধ হয় বলা চলে যে বিদ্যাভবনকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর জ্ঞানকাণ্ড এবং শ্রীনিকেতনকে ঘিরে তার কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের পটভূমি এতই ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ যে স্থানাভাবে আমার নিবন্ধে তার আলোচনার অবকাশ নেই। একই কারণে আমি কলাভবন ও সংগীতভবনের আলোচনা থেকেও বিরত থাকব।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঠিক কবে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে জানা নেই। একথা ঠিক যে উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্তের দাবি অথবা বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় নি। বিশ্বভারতী প্রায় আদ্যন্ত নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টা। এখানেই তাঁর স্বদেশচিন্তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার যোগসূত্র। তাঁর স্বদেশচিন্তায় যেমন, শিক্ষাভাবনাতেও তেমনি দুটি প্রত্যয়ের কথা বার বার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ : আত্মশক্তি ও আত্মপ্রকাশ। আত্মশক্তির কেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রক্রিয়া; প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের ভাষায়, "হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া। আমি নিজে যা, তা-ই 'সজ্ঞানভাবে, সকলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে'

হয়ে ওঠা। অর্থাৎ, 'নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে' জাগানো।"[৬৮] আত্মশক্তির বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, যার আয়োজন তিনি করেছিলেন বিদ্যালয়ে। আত্মপ্রকাশের জন্য ক্ষেত্র প্রয়োজন, কারণ সেখানেই হবে বিদ্যার উৎপাদন, সৃজনশীলতার চর্চা, জ্ঞান ও জ্ঞানীর সমবায়। আজকের ভাষায় এই কেন্দ্রকে বলতে পারি community of scholars। এটাই গবেষণার ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রের কথাই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তাঁর বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : "১৯১৮ সনের পূজাবকাশের পূর্বে একদিন কবি এন্ড্রুজ ও রথীন্দ্রনাথের কাছে তাঁহার বিদ্যালয়কে ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র করিয়া তুলিবার কথা ব্যক্ত করিলেন। কবি কলিকাতায় আসিলে এন্ড্রুজের চেষ্টায় স্থানীয় গুজরাটি ব্যবসায়ীরা জোড়াসাঁকোয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কবি তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথম তাঁহার 'বিশ্বভারতী' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন (৫ অক্টোবর, ১৯১৮)।"[৬৯] এই সব আলোচনার কোনো বিশদ বিবরণ রক্ষিত হয় নি। ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮-তে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হল। এই উপলক্ষে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষণের কোনো অনুলিপি অথবা মুদ্রিত পুস্তিকাটি পাওয়া যায় নি। প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন, পুস্তিকাটির বক্তব্যের কিছুটা আভাস হয়তো 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত "বিশ্বভারতী" প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।[৭০] তাঁর অনুমান যদি ঠিক হয় তবে বলতেই হবে যে ১৯১৮-তেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "... শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। *বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা-দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের* উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।"[৭১] (বক্ররেখ আমার)

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিশ্বভারতীকে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার কথা এখনও ভাবছেন না। প্রাচ্য সংস্কৃতি-চর্চা কেন্দ্রই তাঁর অন্বিষ্ট। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি কোনোদিনই জ্ঞান বিতরণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতে পারেন নি। তাই, শান্তিনিকেতনে কোনো teaching university গড়ে তোলার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তিনি খুঁজছিলেন বিদ্যা উৎপাদনের ক্ষেত্র, স্থাপন করতে চেয়েছিলেন গবেষণা-কেন্দ্র, গঠন করতে চেয়েছিলেন বুধমণ্ডলীর সমবায়। রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ের কথাই রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন শ্রীমতী সেমুরকে (Mrs Mayce Seymour), ১৭ এপ্রিল, ১৯১৯-এ লেখা একটি চিঠিতে : "The school will be only a part of a more

comprehensive scheme of education ... a true university— not in the European sense— but more like what we had in ancient Nalanda... The method of education will be quite different from that followed in our present day universities, especially in India. In every important branch of learning, there will be one or two teachers who by the merit of their own research or work attract students to live with them and while learning help in carrying out the work they are engaged in."[১২]

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে এই সব ভাবনাই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করলেন দক্ষিণ ভারত সফরের সময়ে (৬ জানুয়ারি, ১৯১৯-১৭ মার্চ, ১৯১৯) তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, বিশেষত মাদ্রাজে, অ্যানি বেসান্ট প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আচার্যরূপে পঠিত তিনটি প্রবন্ধে (১০ মার্চ-১২ মার্চ, ১৯১৯)। প্রবন্ধ তিনটির নাম যথাক্রমে, "The Centre of Indian Culture", "The Message of the Forest" এবং "The Spirit of Popular Religion." দক্ষিণ ভারত সফরের শেষে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন ১৯১৯-এর ১৭ মার্চ তারিখে। তিন দিন পর, ২১ মার্চ এমপায়ার থিয়েটারে কবি পড়ে শোনালেন তাঁর "The Centre of Indian Culture"। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, আশুতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক গেডিস্‌, অধ্যক্ষ জনস্টন, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সরলা রায়, সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য এবং অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন : "কলিকাতায় বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইহাই কবির প্রথম বক্তৃতা, এবং ইহাই বোধ হয় এদেশে কবির প্রথম ইংরেজি বক্তৃতা।"[১৩] কয়েকদিন পরে ২৪ মার্চের সন্ধ্যায় একই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনালেন শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের। সীতা দেবী জানিয়েছেন : "প্রবন্ধটি বেশ বড়ো ছিল, পাঠের পর কিছুক্ষণ আলোচনাও হইল।"[১৪]

"The Centre of Indian Culture" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের উপস্থাপনা করলেন। প্রথমত, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য সম্পর্কে বললেন : "... The primary function of our university should be the constructive work of knowledge. Men should be brought together and full scope given to them for their work of intellectual exploration and creation; and *the teaching should be like the overflow water of this spring of culture,* spontaneous and inevitable. Education can only become natural and wholesome when it is the direct fruit of a living and growing knowledge." (বক্ররেখ আমার)। দ্বিতীয়ত, এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছাত্র সংগ্রহ নয়, বিদ্যার সমবায় স্থাপন : "... when in our attempts at founding national universities we begin from the wrong end— the students come first in our mind, and then we cast about for the teachers... let us for once throw to the

winds all anxiety as to syllabuses, and as to students also ... We must know that this concentration of intellectual forces of the country is the most important mission of a university, for it is like the nucleus of a living cell, the centre of the creative life of the national mind."

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন : "My suggestion is that we should generate somewhere a centripetal force, which will attract and group together from different parts of our land and different ages all our materials of learning and *thus create a complete and moving orb of Indian culture.*" (বক্ররেখ আমার)। চতুর্থত, এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, ভারতীয় বিদ্যাচর্চাকে শক্তিশালী করে তোলার অর্থ পাশ্চাত্যবিদ্যার বিরুদ্ধতা নয় : "It is this which makes me urge that all the elements in our own culture have to be strengthened, not to resist the western culture, but truly to accept and assimilate it, and use it for our food and not as our burden..."। পঞ্চমত, তাঁর পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার বিষয়গুলি বিশদ করে রবীন্দ্রনাথ জানালেন : "So, in our Centre of Indian learning, we must provide for co-ordinated study of all these different cultures— the Vedic, the Puranic, the Buddhist, the Jain, the Islamic, the Sikh, and the Zorastrian. And side by side with them the European— for only then shall we be able to assimilate the last."[১৫]

লক্ষণীয় যে, ইয়োরোপীয় বিদ্যার আত্তীকরণের কথা বললেও রবীন্দ্রনাথ এখনো বিশ্বভারতীকে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র হিসেবে ভাবছেন না। বিশ্বভারতীর ভিত্তিপত্তন হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮-তে; তার কর্মকাণ্ড শুরু হল আরো ছয় মাস পরে, ৩ জুলাই, ১৯১৯-এ। ইতিমধ্যে জগদানন্দ রায়ের সম্পাদনায় ১৩২৬-এর বৈশাখ থেকে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের সূচনারূপে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন (৩ জুলাই, ১৯১৯), তার প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়েছিল 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায়। বিধুশেখর শাস্ত্রীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষণে বলেছিলেন একসময়ে বিধুশেখর আশ্রম ত্যাগ করে 'জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয়' করার উদ্দেশে স্বগ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। নানা কারণে তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনলেন— "এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী— তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারিদিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই, আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না।"[১৬]

এই ভাষণে নবজাত বিশ্বভারতীর যে উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ সেটি এইরকম : "আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীম শাস্ত্রী মহাশয়।"[৭৭] বস্তুত, ছবিটি ততটা উজ্জ্বল ছিল না। লক্ষণীয় যে, উক্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীর উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতনের কর্মী এবং বিদ্যালয়ের উত্তর-বিভাগ, অর্থাৎ নবজাত বিশ্বভারতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি লিখেছেন : "কবি তখন মনে করিতেন বাহিরের সাময়িক ছাত্র দ্বারা স্থায়ী বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র গড়িতে পারা যাইবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আশ্রমের শিক্ষক ও অন্যান্য আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে জ্ঞানচেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে বিদ্যা স্থায়ী ফলপ্রসূ হইবে। আশ্রমের শিক্ষকদের কেবলমাত্র স্কুলমাস্টার হইলে চলিবে না, তাঁহারা জ্ঞানতপস্বী হইবেন— এই ছিল কবির ইচ্ছা। শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমতো এক-একটি বিষয় নির্বাচন করিয়া অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যে ব্রতী হইবেন, এই ছিল আদি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা।"[৭৮]

'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ, ১৩২৬ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী-ষাণ্মাসিক বিবরণ : ১৮ই আষাঢ় হইতে ৯ই পৌষ, ১৩২৬ সাল" শীর্ষকে 'শিক্ষণীয় বিষয়, ব্যাখান, অধ্যাপনা ও পাঠ' সংক্রান্ত বিশদ কার্যক্রম প্রকাশিত হল (পৃ: ৭-৮)। নতুন অধ্যাপকদের মধ্যে এসেছেন সিংহল থেকে ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির ও মিথিলা থেকে কপিলেশ্বর মিশ্র। কিন্তু জ্ঞানচর্চার জন্য আশ্রমের শিক্ষক ও বাসিন্দারাই শুধু বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী হবেন— রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন : "মহাস্থবিরের বক্তৃতায় প্রথম প্রথম আমরা সকলেই যাইতাম; কিন্তু দিন যতই যায় শ্রোতার সংখ্যা ততই হ্রাস পায়। ... মোট কথা, এই বক্তৃতা শুনিবার উৎসাহ প্রায় সকলেরই নিভিয়া আসিল। শেষ পর্যন্ত দেখিলাম শ্রোতাদের মধ্যে দুইজন টিকিয়া আছেন— একজন বিধুশেখর, অপরজন রবীন্দ্রনাথ। কবি নিশ্চল হইয়া ধর্মগুরুর জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পাণিনির ব্যাকরণ অধ্যায়নের ফল আরো শোচনীয়। ... শিক্ষকদের অনেকেই যোগদান করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেঁকেন নাই একজনও। ... সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতী বিশেষ কোনো খ্যাতি অর্জন করিতে পারে নাই। অথচ এইটি ছিল কবির অন্তরের অন্তরতম বাসনা।"[৭৯]

প্রমথনাথ বিশী এই সময়েই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পাঠ শেষ করে বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করেন। তিনি এবং অন্ধ্রদেশীয় বিদ্যার্থী চলমায়াই সম্ভবত বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্র। প্রমথনাথ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "আমাদের দুজনের অধ্যাপনা ও পরিচালনার ভার শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরে পড়িল। ঠিক কিভাবে আমাদের চালনা করিতে হইবে সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা কাহারো ছিল না। ... এইটুকুমাত্র স্থির ছিল যে, সংস্কৃত প্রাকৃত পালি আমাদের খুব করিয়া শিখিতে হইবে। *কারণ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে*

ইন্ডোলজি বা ভারততত্ত্ব।"[৮০] (বক্ররেখ আমার)। প্রমথনাথ আরো বলেছেন : "মিশ্রজীর [কপিলেশ্বর মিশ্র] এই মিশ্রবয়সের ক্লাসে পাণিনির অধ্যয়ন যে কিরকম চলিতে ছিল তাহা গোপন রাখাই উচিত।" তারপর পাণিনি-অধ্যয়নের করুণ পরিসমাপ্তির এক কৌতুকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন প্রমথনাথ।[৮১]

প্রভাতকুমার ও প্রমথনাথের বিবরণ থেকে মনে হয় বিশ্বভারতীর কার্যক্রম তখনও কোনো নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ রূপ পায় নি, যদিও 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩২৬ সংখ্যায় ও অন্যত্র বিশ্বভারতীর আধ্যাপকদের নাম ও পঠনীয় বিষয়গুলির বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক মন্ডলীও গঠিত হয়েছিল। প্রভাতকুমার লিখেছেন : "বিশ্বভারতী বলিতে তখন উচ্চ জ্ঞানচর্চার জন্য যে বিভাগ উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাকে বুঝাইত... এই বিভাগের অধ্যক্ষ পদপ্রাপ্ত হন বিধুশেখর..." [৮২] তদানীন্তন বিশ্বভারতীর প্রথম কর্মকর্তারা ছিলেন : সভাপতি- বিধুশেখর শাস্ত্রী; সম্পাদক- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর; অন্যান্য সদস্য- নেপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ভীমরাও শাস্ত্রী ও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।[৮৩]

কিন্তু কার্যক্রমের শিথিলতা সত্ত্বেও, ভারতবিদ্যাচর্চাই যে ছিল বিশ্বভারতীর মূল লক্ষ্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত "বিদ্যাসমবায়" নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিশ্বভারতীতে পাশ্চাত্যবিদ্যাচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন : "... আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। ... ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে।" কিন্তু ইয়োরোপীয় বিদ্যাচর্চাকে দেখেছেন প্রধানত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অনুসঙ্গরূপে : "অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।"[৮৪] আর, এই সময়েই রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছিলেন : "বিশ্বভারতীর বিদ্যায়তনের শিক্ষা প্রভৃতির যে আদর্শ খাড়া করা হয়েছে সে সম্বন্ধে অনেক তর্কের বিষয় আছে। আর একবার সকলে বসে না আলোচনা করলে চলবে না। *যে কথা বলে আমি ভারতবর্ষের লোককে বিশেষভাবে আপীল করেছি সে হচ্ছে বিশ্বভারতীতে ভারতীয়বিদ্যার সমবায়।* এখানে বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পারসী প্রভৃতি সকল বিদ্যার একটা সমন্বয় ক্ষেত্র হবে তোদের আদর্শের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই।"[৮৫] (বক্ররেখ আমার)

এই চিঠির প্রেক্ষিতেই শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবের কয়েকদিন পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ড. ফুশে (Founcher) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভারততত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দের আশ্রমে আগমন ও বিশ্ব-

ভারতীতে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা (২৯-৩০ ডিসেম্বর, ১৯১৯) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ, ১৩২৬ সংখ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রদ্যোৎকুমার সেন এই বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে লিখেছিলেন : "নৃতত্ত্ব ও ভারতের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বভারতীতে কিরূপ নিয়মে অনুসন্ধানের কার্য চলা উচিত শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি [রমাপ্রসাদ চন্দ] তাহার প্রণালী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।"[৮৬] হয়তো এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ "ভারত-ইতহাস চর্চা" প্রবন্ধটি 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার চৈত্র, ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি পরে 'ইতিহাস'-গ্রন্থে সংকলিত হয়। সংকলকেরা (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিনবিহারী সেন) জানিয়েছেন : "বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালে তথায় 'ভারতের প্রকৃত ইতিহাস' অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থার কথা যে কালে কবি পর্যালোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই প্রবন্ধ রচিত। প্রবন্ধ শেষে লিখিয়াছিলেন— 'বিশ্বভারতীতে কোনো ছাত্র যদি এই [মহাযান বৌদ্ধপুরাণ-সকলের] অনুশীলনে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে আনন্দের বিষয় হইবে। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য সিংহলের মহাস্থবির মহাশয় আছেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী সংস্কৃত অধ্যাপনার অধ্যক্ষতা করিতেছেন, অতএব এখানে এই কাজ আরম্ভ করার সুযোগ আছে।"[৮৭]

৫.

১৯২০ সালের ১৫ মে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে মুম্বই থেকে প্রায় দেড় বছরের জন্য ইয়োরোপ-আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ। সম্ভবত এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২১-এর ৩০ মার্চ তারিখে শ্রীমতী সেমুরকে লেখা একটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "The idea of such a University [International University] had been steadily growing in his mind and formulated itself more concretely during the voyage from India. He felt the need of an institution where the intellect and cultures of all the Eastern and Western countries would be brought together. I will not explain this idea in detail, as the pamphlet I am enclosing will tell you more eloquently than I could ever hope to."[৮৮] চার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'The Appeal for an International University' শীর্ষক পুস্তিকাটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রয়েছে। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল জানা যায় না। আবেদনের "Aims and Objects" অনুশীর্ষকে বলা হয়েছে : "The University at Santiniketan tries to realize its harmony with the history and spirit of India itself, gathering together the different cultures of Asia, and along with it to accept the best culture that the west has produced in science, literature, philosophy

and the arts."[৮৯] এ রকম আরো আটটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার রচিত আবেদন (মুদ্রিত, টাইপ-করা অথবা রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা) রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে পাওয়া যাবে।

প্রভাতকুমারও জানিয়েছেন : "কবি এন্ড্রুজকে কয়েকদিন পূর্বে লেখেন (১৭ ডিসেম্বর, ১৯২০) যে, কিছুকাল পূর্বে তিনি যখন ভারত হইতে য়ুরোপ যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মনে ছিল শান্তিনিকেতনে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন— সর্বভারতীয় বিদ্যার কেন্দ্রমাত্র। কিন্তু য়ুরোপীয় মহাদেশে উপনীত হইয়া তিনি অনুভব করিলেন যে তিনি পাশ্চাত্য জাতিদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের কার্য বা মিশন বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যার সমাধান, অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সাধন।"[৯০]

এই সময়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও পঠিত প্রবন্ধের বিষয়গুলির দিকে লক্ষ রাখলে, রথীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। ১৯২০-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি— এই পাঁচ মাসের মধ্যে, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অন্তত আটবার রবীন্দ্রনাথ "Meeting of the East and West" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। তাছাড়াও, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন কবি। তদানীন্তন ভারতবর্ষে, বিশেষত শান্তিনিকেতনে, গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অসহযোগ আন্দোলন তাঁর পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শকে বিপন্ন করে তুলতে পারে— এই উদ্বেগ যে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন গান্ধি-বিরোধিতার পেছনে নিহিত ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আশ্রমে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার অভিপ্রায়ে বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক ক্লাশ তুলে দেওয়া নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বিতর্ক। এই বিতর্কে ম্যাট্রিক তুলে দেওয়ার পক্ষে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন অ্যান্ড্রুজ, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও নেপালচন্দ্র রায়, এবং বিরোধিতা করে ছিলেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও জগদানন্দ রায়। ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে লিখলেন : "You have asked for my permission to abolish the Matriculation classes from our school. Let it go."[৯১] কিন্তু একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে সুহৃতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : "ম্যাট্রিক তুলে দেওয়া নিয়ে তোদের যখন ঝুটোপুটি চলছিল আমি চুপ করেছিলুম। ... আমি পারতপক্ষে আমার মত জোর করে চালাতে চাইনে... ম্যাট্রিক আমার মনের মতো জিনিস নয়— কিন্তু দেশের অধিকাংশ যখন এটা চায় তখন ছেলেদের জোর করে ম্যাট্রিক থেকে ছিন্ন করে আশ্রম থেকে বহিষ্কৃত করতে আমি এ পর্যন্ত পারি নি। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণ পাকা করে তুলে মাত্রিক এবং অমাত্রিক এই দুই ধারা রক্ষা করব— শেষকালে দুই ধারা একে এসে মিলবে। ... এ

সমস্ত সত্ত্বেও ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে করি নে— ... কিন্তু আমার আপত্তি এই যে, বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে এই সংস্কার হল না, এটা হল নন্‌-কোঅপেরেশন পর্বের একটা অধ্যায়রূপে।"[৯২] শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিক ক্লাশ তুলে দেবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩২৭ সংখ্যায় এই সংবাদ মুদ্রিত হল : "সকলেই শুনিয়া খুশি হইবেন যে, এ বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষার জন্য বালকদিগকে আশ্রমে শিক্ষাদান করা হইবে না। তাহাদিগকে আমাদের নিজের পাঠক্রম অনুসারে পড়ানো হইবে।"

অসহযোগ-আন্দোলন বিরোধী প্রভাতকুমার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : "১৯২১ সনের গোড়া হইতে শান্তিনিকেতনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের জন্য পঠন-পাঠন-পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু বিকল্প পাঠক্রম রচিত হইল না। ... সুতরাং বিশ্বভারতীতে 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের চর্চা'র পরিবেশ সৃষ্টির কথা উঠিল— ডিগ্রির প্রতি মোহশূন্য ছাত্রদের গবেষণাকেন্দ্র রচনার কল্পনা। *কিন্তু ম্যাট্রিক ও গবেষণা কার্যের মধ্যে যে প্রস্তুতি পর্ব আছে সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না।*"[৯৩] (বক্ররেখ আমার)। উল্লেখ্য যে, বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ঠিক একই সমালোচনা করেছিলেন যদুনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ৩১ মে, ১৯২২-এর দীর্ঘ পত্রে। সেই আলোচনায় আমরা এই প্রবন্ধের সপ্তম পরিচ্ছেদে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২০-তে অ্যান্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : "We are all so thankful that the Matriculation can now be finally abandoned. Now the prepatory will have to decide for themselves with their parents. I think that some are certain to join Visva-Bharati. We shall certainly get all the children we need. I trust that they will come more from other provinces ... These would be, as it were, the background, and then there would be our teachers who themselves were research students and learners and we should be one family together. The idea of All Souls', Oxford, has always deeply interested me, which is almost purely a college for research and where the conventional student who wishes to take 'degrees', etc, is not encouraged."[৯৪] উল্লেখ করা দরকার যে ১৯১৯-২০ তে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতীর শিক্ষাক্রমে যোগ দিয়েছিলেন জনা দশেক ছাত্র, বহিরাগতদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী।

বিদেশ সফরের শেষে রবীন্দ্রনাথ মুম্বই পৌঁছলেন ১৬ জুলাই, ১৯২১-এ, এবং শান্তিনিকেতনে ১৮ জুলাইয়ে। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের জীবনীকার অশোক রুদ্র, রাণী মৈত্র (মহালানবিশ)কে লেখা প্রশান্তচন্দ্রের একটি চিঠি (ইংরেজি অনুবাদে) উদ্ধৃত করেছেন। সেই চিঠিতে প্রশান্তচন্দ্র লিখেছিলেন : "After the return of the poet from Europe, alighting at Bardhaman, his first words were about Gandhi, and then he talked about the union of the East and the West. I

then heard, for the first time, from his own lips, about what he wanted to do in Visva-Bharati. One day Rathinbabu proposed the formation of a Visva-Bharati Friend's Association in Calcutta... It was at this time that the Poet asked Suren Tagore and myself to draft a constitution for Visva-Bharati. Work on that draft continued till 7th Pous."[৯৫] অশোক রুদ্র এই চিঠির তারিখ উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত, চিঠিটি ১৪ ডিসেম্বর, ১৯২২-এ রাণী মৈত্রকে লেখা পত্রের ইংরেজি অনুবাদ। মূল চিঠিতে অবশ্য রয়েছে: "কবি সুরেনবাবু (ঠাকুর) ও আমাকে ডেকে একটা constitution খাড়া করতে বললেন— আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে।"[৯৬] একই ভাষায় প্রশান্তচন্দ্র তাঁর 'দিনলিপি'তেও (তারিখহীন) লিখেছিলেন: "এমন সময়ে কবি সুরেনবাবু (ঠাকুর) ও আমাকে ডেকে একটা constitution খাড়া করতে বললেন— August কিংবা September মাসে।"[৯৭] আর, রথীন্দ্রনাথ ৯ ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে শ্রীমতী হ্যারিয়েট মুডি (Harriet Moody) কে লিখেছিলেন : "We are now very busy dressing up a new constitution for the whole institution."[৯৮]

এই চিঠিপত্র ও প্রশান্তচন্দ্রের দিনলিপি থেকে যে জরুরি তথ্যটি আমরা জানতে পারি সেটা এই যে, বিদেশ থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে একটি বিধিবদ্ধ রূপ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। কেন এই ব্যস্ততা? মাস তিনেক আগেও তো তিনি রোটেনস্টাইনকে জানিয়েছিলেন : "Very likely I shall never be able to work in harmony with a board of trustees, influential or highly respectable, for I am a vagabond at heart."[৯৯] আরেকটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি অ্যান্ড্রুজকেও বলেছিলেন যে প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বস্তুত সমাধির স্থায়িত্বেরই নামান্তর।[১০০] মনে হয়, কবির এই ব্যস্ততার পেছনে ছিল অসহযোগ-আন্দোলনের প্রভাব থেকে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করবার ও অসহযোগের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠা করবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

বিশ্বভারতীর সংবিধান রচনা-রত প্রশান্তচন্দ্র ১৮ ডিসেম্বর, ১৯২১-এ কলকাতা থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : "কাল কালীমোহনবাবুর [কালীমোহন ঘোষ] সঙ্গে কনস্টিটিউশন-এর খসড়াটা পাঠিয়েছি। আপনারা একবার দেখে যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় ফেরৎ দেবেন। সুরেনবাবু বলছেন যে ওটা একবার উকিলদের দেখিয়ে নিতে হবে। মঙ্গলবারের মধ্যে ফেরৎ দিলে ৯ই পৌষের আগেই ছাপিয়ে দেওয়া চলবে, ... বাংলা অনুবাদ করতে হবে, কিন্তু ইংরাজিটাকেই প্রামাণ্য বলে মানতে হবে— নইলে অসুবিধা হতে পারে।

অবজেক্টস-এর প্রথম দু-তিনটি ধারা আপনি ভালো করে দেখে দেবেন, এর মধ্যে আইনের কোনো কথা নেই..."[১০১]

চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে যে ধারাগুলির কথা বলেছেন প্রশান্তচন্দ্র তাদের আদিতে রয়েছে সেই স্মরণীয় ঘোষণা : "To study the mind of Man in its realisation

of different aspects of truth from diverse points of view". ধারাগুলি রবীন্দ্রনাথের সংযোজন নাকি মূলের পরিমার্জন আজ তা জানার উপায় নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার এ-বিষয়ে অন্য একটি তথ্য জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "১৯২১-এর ডিসেম্বরে বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন লিখেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আর তার উদ্বোধন মন্ত্রগুলি সংকলিত করেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন।"[১০২] তথ্যটি ভুল নাও হতে পারে।

১৯২১-এর ২৩ ডিসেম্বর তারিখে বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বভারতীকে 'সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ' করার কথা ঘোষণা করলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই অনুষ্ঠানেই সংযোজন সাপেক্ষে বিশ্বভারতীর সংবিধান গৃহীত হল। যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সংবিধানের নানা ধারায় বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রতিষ্ঠাতা আচার্য), দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর (অর্থসচিব), রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (যুগ্ম কর্মসচিব), পিঠাপুরমের রাজাবাহাদুর, জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চার্লস, এফ. অ্যান্ড্রুজ (প্রধান)। চার মাস পরে, ১৯২২-এর ১৬ মে এই সংবিধান সরকারি নথিভুক্ত হয়। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বিশ্বভারতী, বিশদ স্ট্যাটুট ও নানা সমিতি-উপসমিতি সহ এক বিধিবদ্ধ ও বহুলাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের রূপ পেল।

৬.

'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ ১৩২৭ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল : "1. The Visva-Bharati is for higher studies. 2. The system of Examinations will have no place whatever in the Visvabharati, nor is there any conferring of degrees. 3. The students will be encouraged to follow a definite course of study, but there will be no compulsion to adopt it rigidly. Subjects : At present there are four departments of studies here, viz, i. Language and Literature, ii. Philosophy, iii. Arts, iv) Music." (পৃ: ৫৭৩)। প্রভাতকুমার লিখেছেন : "বিশ্বভারতী উত্তর বিভাগ এখনো সংগঠিত হয় নাই— এন্ড্রুজ উপস্থিত থাকিলে ইংরেজি পড়ান; মরিসের কাছে ফরাসি, নরসিংহভাই পাটেলের নিকট জার্মান, বিধুশেখরের নিকট পালি, সংস্কৃত— যে যেমন পারে শিখিতেছে।"[১০৩]

খানিকটা শিথিল কার্যক্রমের মধ্যেই বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি-অধ্যাপক, প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, সিলভ্যাঁ লেভি ৯ নভেম্বর, ১৯২১-এ শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন। রবীন্দ্রনাথ তার মাস চারেক আগে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। বহুভাষাবিদ লেভি 'বিশ্বভারতীতে আসিয়া... চীনা ও তিব্বতি ভাষা শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা হইতে লেভির কাছে চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য

আসিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচি। ... লেভির স্থানীয় ছাত্র জুটিলেন বিধুশেখর, প্রভাতকুমার ও ফণীন্দ্রনাথ বসু।'[১০৪] নিয়মিত ক্লাশ নেওয়া ছাড়াও, লেভি প্রতি সপ্তাহে 'পশ্চিম জগতের সহিত প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধ' বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। প্রথমনাথ বিশী লিখেছেন : "বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে ইউরোপ হইতে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে আসেন; কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিরাই তাঁহাদের কাছে আসিত। *একবার কেবল দলবৃদ্ধির জন্য সিলভাঁ লেভির সাধারন ক্লাসে গিয়া অমি বসিয়াছিলাম।*"[১০৫] (বক্ররেখ আমার)। সেই সময়কার বিদ্যাভবনের ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রাসঙ্গিক বিবরণটি আরো বিশদ ও কিঞ্চিৎ বিবাদময়। তিনি জানিয়েছেন : "যেদিন প্রথম বক্তৃতা [সিলভাঁ লেভির] আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র। তারাও একজন রসায়নের ছাত্র— আর পাঁচজন যে রকম 'বোলপুর দেখতে' আসে এই সুযোগে সেও সেইরকম এসেছে।

বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা তখন বারোজনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।

এই দুটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) বক্তৃতা দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত লেভি। রবীন্দ্রনাথ বড়ো মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাসের পুরোভাগে খাতা কলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। লেভির আর কোনো খেদ না থাকারই কথা।"[১০৬] ছাত্র-নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ছিল না কখনও। কিন্তু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর তাঁকে ছাত্র ও উচ্চতর গবেষণার জন্য ছাত্রের যথোচিত প্রস্তুতির কথা ভাবতে হয়েছে।

লেভি-দম্পতি বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বেশি দিন যুক্ত থাকেন নি। নেপালের উদ্দেশে তাঁরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ১৪ মার্চ, ১৯২২-এ। অবশ্য আগস্ট মাসে আবার তাঁরা কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন। ১৯২২-এর ৯ আগস্ট তারিখে শান্তিনিকেতনে লেভি-দম্পতির বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হল এবং কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুরূপ বিদায়-সংবর্ধনা আয়োজিত হয়েছিল ১৮ আগস্ট, ১৯২২ তারিখে। সেইদিনই, অনুষ্ঠানের শেষে, বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "স্বদেশের সঙ্গে এর [বিশ্বভারতীর] যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এমন-কি, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। ... কিন্তু আমার আশা আছে

যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না।"[১০৭]

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় অতিথি-অধ্যাপক হয়ে আসেন মরিস উইনটারনিটস্ (Moriz Winternitz), ১৯২২-এর ১১ ডিসেম্বরে, লেভির মতই মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে।[১০৮] ইনিও লেভির মতোই সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারতত্ত্ববিদ, প্রাগ শহরের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। উইনটারনিটসের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর ছাত্র ভিনসেন লেসনি (Vincenc Lesney), নব প্রতিষ্ঠিত চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক। কিন্তু 'পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ'-এর জন্য সেই সময়ে রীতিমতো ব্যস্ত হতে হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও; উত্তর বিভাগের ছাত্রেরা যাতে বিদ্যাভবনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে সেজন্য প্রথাসম্মত শিক্ষণের আয়োজন করতে হয়েছিল তাঁকে। স্থায়ী অধ্যাপকপদে ছিলেন বিদেশিদের মধ্যে ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদ মার্ক কলিন্স (Mark Collins) ও বেনোয়া (F. Benoit)। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে যোগ দিলেন বগদানফ (L. Bogdanov)। তাছাড়া ছিলেন হিরজিভাই পোস্তানজি মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, নরসিংহ পাটেল। এঁরা ছাড়াও অস্থায়ী অধ্যাপক হিশেবে সপ্তাহান্তে কলকাতা থেকে আসতেন সরোজকুমার দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে এলমহার্স্টের নেতৃত্বে সুরুলের গ্রাম-পুনর্গঠন কেন্দ্র Institute of Rural Reconstruction (১৯২৩-এর ২৬ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী সোসাইটির বার্ষিক পরিষদের সভায় এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম 'শ্রীনিকেতন সমিতি' নামে অভিহিত হয়), নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে কলাভবন ও ভীমরাও শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সংগীতভবন তাদের আপন স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আমার আলোচনার পরিধির বাইরে।

বিশ্বভারতী স্থাপনার (১৯১৯) প্রায় চারবছর পরে রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে আরো নিয়মিত ও প্রসারিত করতে প্রয়াসী হলেন। গবেষণা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যে তিনি তখনো নিবিষ্ট এবং বিশ্বভারতী যাতে তার আদর্শকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে সেজন্য সচেষ্ট। কিন্তু তার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে আরেকটি মাত্রা— ছাত্রদের গবেষণার উপযুক্ত করে তোলার জন্য পৃথক শিক্ষণের ব্যবস্থার চেষ্টা। গুজরাত ভ্রমণের প্রাক্‌কালে, ২৭ অক্টোবর, ১৯২৩-এ রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখলেন : "আমাদের বিশ্বভারতী ক্রমশই য়ুনিবার্সিটির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। আমি তাহাতে অন্তরের মধ্যে পীড়া অনুভব করিতেছিলাম। তাহার এই দেহান্তরপ্রাপ্তির আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার একটি আদর্শ খাড়া করিয়া কর্মপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। আশাকরি ইহার মধ্যে আপনার অনভিপ্রেত কিছুই নাই। ইহা অবলম্বন করিলে বিশ্বভারতী ও সেই সঙ্গে আপনারাও মুক্তি পাইবেন। আশা ছিল আপনি ফিরিয়া আসিলে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিব। ... নিজের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়াই বিশ্বভারতীর নিয়ম বাঁধিয়া দিলাম। নিয়মগুলি কাগজেই বাঁধা না থাকে, যাহাতে সম্পূর্ণই কাজে

খাটে, সে সম্বন্ধে আপনার আনুকূল্য ও সতর্কতা প্রার্থনা করি।"[১০৯]

এই মূল্যবান দলিলটির প্রসঙ্গে আমরা একটু পরেই ফিরে আসব। তার আগে বিধুশেখরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর একটি চিঠির কথা বলা দরকার। চিঠিটি তারিখহীন এবং প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন পত্রটি নভেম্বর ১৯২৩-এ লেখা।[১১০] গুজরাতের পোরবন্দর থেকে প্রেরিত এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "উত্তর-বিভাগের যে-সব ছাত্র এখন আছে— বিশ্বভারতীর জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলতে হবে, সেইজন্যে তাদের দুই বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকা থেকে তাদের দুই বা দুইয়ের অধিক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে হবে।"[১১১] শিক্ষণীয় বিষয়ের যে তালিকা তিনি এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, সেটি প্রধানত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার জন্য পরিকল্পিত। তালিকাটি এই রকম : বৈদিক সংস্কৃত, সংস্কৃত সাহিত্য, পালি, প্রাকৃত, আবেস্তা, ভারতের পুরাতত্ত্ব, বাংলা (বাংলার বাইরের ছাত্রদের জন্য), আয়ুর্বেদ, প্রাচীন হিন্দীসাহিত্য, তিব্বতি, চিনা, ফার্সি, আরবি ও দ্রাবিড়ীয় ভাষা (যদি অধ্যাপক জোটে) জর্মন (যখন জর্মন পণ্ডিত পাওয়া যাবে), ফরাসী, য়ুরোপীয় ইতিহাস (নেপালবাবুর কাছে), শব্দতত্ত্ব (Collins-এর কাছে), ইংরেজি সাহিত্য (এখনও পড়াবার লোক পাওয়া যায় নি)— অমিয় [অমিয় চক্রবর্তী?] অনায়াসে এই ভার নিতে পারেন); য়ুরোপীয় দর্শন (সরোজবাবুর কাছে); ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত ইত্যাদি। "দুই বৎসর পরে পরীক্ষার পর অথবা অধ্যাপকদের মতে যে ছাত্র উপযুক্ত গণ্য হবে তাদের নেওয়া হবে।... তালিকা আমার আন্দাজমতো করে দিলুম। আপনারা বিচার করে এর থেকে পরিবর্জন, পরিবর্ধন করে মনের মতো তালিকা তৈরি করে নেবেন।"[১১২]

এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের দুই ভাগে ভাগ করার নির্দেশ দিলেন— আচার্য ও অধ্যাপক। আচার্য-তালিকায় ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, মার্ক কলিনস্, কালিদাস নাগ, নন্দলাল বসু ও লেনার্ড এলম্‌হারস্ট। অধ্যাপকদের তালিকায় ছিলেন নেপালচন্দ্র রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, বেনোয়া, প্রেমচাঁদ লাল, কপিলেশ্বর মিশ্র, রমেশচন্দ্র সাংখ্য তীর্থ, ভীমরাও শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ কর ও সরোজকুমার দাস। আচার্য ও অধ্যাপকদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "*অধ্যাপকদের প্রধান কতর্ব্য ছাত্রদের বিশ্বভারতীর জন্য তৈরি করে তোলা; আচার্যদের প্রধান কর্তব্য হবে অনুসন্ধান ও তত্ত্ব প্রচার।* বিশ্বভারতীর উপযুক্ত ছাত্রদের মধ্যেও কাউকে কাউকে কোনো কোনো বিষয়ে গোড়ার দিক থেকে শেখানো দরকার হবে... *এঁদের খেয়াপার করবার ভার অধ্যাপকদের* উপর। বলা আবশ্যক, বিশেষ প্রয়োজনস্থলে বা স্বেচ্ছাক্রমে আচার্যরাও এই ভার গ্রহণ করতে পারেন। ... নতুন অধ্যাপক ও আচার্য নিয়োগের সামর্থ আমাদের বেশি নেই। কেবল আমার ইচ্ছা কালিদাস নাগকে আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়— তাঁর কাছ থেকে অনেক বিষয়েই আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করি। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক দরকার হবে। চেষ্টা করে দেখছি যদি এদিক থেকে কাউকে পাওয়া যায়..."[১১৩] (বক্ররেখ আমার)।

রবি-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন যে ২৭ অক্টোবর, ১৯২৩ সালে বিধুশেখরকে লেখা চিঠির (পূর্বোধৃত) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নির্দেশলিপি পাঠিয়েছিলেন "[সেই] মূল্যবান দলিলটি আমরা দেখতে পাইনি।"[১১৪] কিন্তু বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন কর্মী, চিত্তরঞ্জন দেব, বিশ্বভারতীর কর্মধারা-প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা একটি নির্দেশ লিপির সন্ধান দিয়েছেন প্রায় তিন দশক আগে লেখা তাঁর "বিশ্বভারতীর কর্মধারা প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত নির্দেশ" নামক একটি ছোটো নিবন্ধে। সেই নিবন্ধে উল্লিখিত নির্দেশলিপির ফ্যাকসিমিলিও মুদ্রিত করেছেন লেখক। তারিখহীন মূল পাণ্ডুলিপিটি, চিত্তরঞ্জন দেব লিখেছেন, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষিত।[১১৫] এই নির্দেশলিপিতে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতীর চারি অঙ্গের পরিষ্কার একটি ছক এঁকে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "*যাঁহারা পাণ্ডিত্যে প্রবীণ ও জ্ঞান সাধনায় কালক্ষেপ করিতে প্রস্তুত তাঁহারা আচার্যরূপে বিশ্বভারতীতে আশ্রয়, অবকাশ ও আনুকূল্য পাইবেন, ইহাই বিশ্বভারতীর মুখ্য উদ্দেশ্য*। যাঁহারা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে যথোচিত অধিকার লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জ্ঞানচর্চার উদ্দেশে বিশ্বভারতীতে ছাত্ররূপে যোগ দিতে পারিবেন। ছাত্রদিগকে যাঁহারা অধ্যাপনার দ্বারা সাহায্য করিবার যোগ্য সেই বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে গৃহীত হইবেন। যাঁহারা বিশ্বভারতীর সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া রচনার দ্বারা, ব্যাখ্যানের দ্বারা, অর্থ দান বা অর্থ সংগ্রহের দ্বারা অথবা যে কোনো উপায়ে ইহার সাহায্য করিবেন তাঁহারা বিশ্বভারতীর বান্ধবরূপে গণ্য হইবেন।"[১১৬] (বক্ররেখ আমার)।

বিশ্বভারতীর চার অঙ্গ— আচার্য, ছাত্র, অধ্যাপক ও বান্ধব— এর উল্লেখ করে প্রত্যেক অঙ্গের কাজ ও লক্ষ্যকে বিশদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আচার্য' সম্বন্ধে বলেছেন: "বিশ্বভারতী যাঁহাদিগকে আচার্যরূপে বরণ করিয়া লইবেন সংসার ভাবনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিমাসে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিবেন। তাঁহারা আশ্রমে বাসস্থান পাইবেন এবং সেখানে যে গ্রন্থাগার আছে তাহা ব্যবহার করিতে তাঁহাদের বাধা থাকিবে না।

বৎসরে অন্তত ছয়টি করিয়া ব্যাখ্যান বিশ্বভারতী তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিবেন। এই ব্যাখ্যান গ্রন্থাকারে বা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে অথবা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। ছাত্রদের মধ্যে কেহ অধ্যয়নের বিষয় সম্বন্ধে আচার্যদের সাহায্য প্রার্থী হইলে অবকাশমতো তাঁহারা সাহায্য করিবেন।"[১১৭] আচার্য তিন শ্রেণীর— 'আশ্রমস্থ, বহিঃস্থ ও অভ্যাগত'। বিশ্বভারতীর ছাত্রেরাও তিন শ্রেণীর- 'আশ্রমস্থ ছাত্র, বহিঃস্থ ছাত্র ও অভ্যাগত ছাত্র'। শুধু অধ্যাপক ও বান্ধবেরা দুই শ্রেণীর— আশ্রমস্থ ও বহিঃস্থ। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সমিতি কর্তৃক অবধারিত নিয়ম অনুসারে অধ্যাপনা করিবেন। অধ্যাপক অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিশেষ বিষয়ের চর্চার কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন এবং সে সম্বন্ধে বৎসরে অন্তত একটি করিয়া রচনা সমিতির হাতে দিবেন।"[১১৮]

বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৭ অক্টোবর, ১৯২৩ এর পত্র ও তৎসংলগ্ন নির্দেশলিপি এবং পোরবন্দর থেকে লেখা তারিখহীন চিঠির বক্তব্য অনুধাবন করলে সন্দেহ থাকে না যে বিশ্বভারতী স্থাপনার চারবছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত পরিকল্পনায় কতকগুলি সংযোজন ও পরিমার্জন করেছেন। প্রথমত, বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক ও কার্যক্রমের খানিকটা ঢিলেঢালা চেহারা এখন ক্রমশ অধিকতর বিধিবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালের ২৬ জুলাই রবীন্দ্রনাথ একটি দলিল রেজিস্ট্রি করেছেন; সেই দলিল অনুসারে তিনজন সদস্যকে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) নিয়ে বিশ্বভারতীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ট্রাস্টি-সভা গঠিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর আদি পরিকল্পনায় এই সাংগঠনিক বিধিবদ্ধতা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। দ্বিতীয়ত, ছাত্র-নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ কখনো ভাবেন নি। কিন্তু এখন, ১৯২৩-এর শেষে, আচার্য, অধ্যাপক ও বান্ধবদের মতো 'ছাত্র' ও বিশ্বভারতীর চার অঙ্গের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ বিদ্যার উৎপাদন; বিদ্যার বিতরণ তার গৌণ কাজ। কিন্তু এই গৌণ কাজটি কালক্রমে ক্রমশ জরুরি হয়ে দাঁড়ালো। বিশ্বভারতী এখন আর শুধু আচার্যদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়; বিদ্যালয় ও বিদ্যাভবনের মধ্যে সেতু রচনার জন্য আগ্রহী ছাত্রদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার— যদুনাথ সরকার যাকে বলেছিলেন— 'intellectual discipline and exact knowledge' — কথাও রবীন্দ্রনাথকে এখন ভাবতে হচ্ছে। অর্থাৎ, বিশ্বভারতীতে এখন শুধু আচার্যদের 'ব্যাখ্যান' (professorial system) নয়, 'অধ্যাপনার' (tutorial system) প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হল। এই স্বীকৃতির গুরুত্ব বিশ্বভারতীতে যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯২৪ সালে ৯ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলেজ স্থাপনের জন্য গৃহীত প্রস্তাবই তার প্রমাণ। গৃহীত প্রস্তাবটিতে বলা হয় : "Resolved the work of teaching and research be organised into 3 departments ... Patha-Vibhag, Siksha-Vibhag and Vidya-Vibhag and award of Adya, Madhya, Upadhi and other certificates."[১১৯] এই শিক্ষাবিভাগ— ১৯২৫ সাল থেকে যার নাম হবে 'শিক্ষাভবন'— বস্তুত বিদ্যালয় (পাঠভবন) ও বিদ্যাভবনের মধ্যবর্তী স্তর অথবা কলেজ। ১৯৩৭-এর ২২ এপ্রিল তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে বলেছিলেন : "... বহু চেষ্টা করেও কলেজটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলুম না।"[১২০] সম্ভবত তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনে ও উপাধি প্রদানের সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথকে সম্মত হতে হয়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি, 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ, ১৩২৭ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২১) সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা গ্রহণের ও ডিগ্রি প্রদানের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। চার বছর পরে, ১৯২৫-এর ২১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত

বিশ্বভারতী সংসদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে : "Regular students of Santiniketan Siksha-Bhavana who have obtained the Madhya and Upadhi certificates of Visva-Bharati shall be permitted, if they so desire, to sit for respectively the I.A. and B.A. Examinations of the Calcutta University..."[১২১] ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ করতে হত।

রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন শুধু শিক্ষাভবনেই নয়, "বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন বা গবেষণা বিভাগে এখন সার্টিফিকেট দিবার কথা উঠিতেছে (জুন, ১৯২৪)।" তিনি Vidya-Bhavana (Institute of Research) Bulletin 4, June 1924 থেকে এই অনুচ্ছেদটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করেছেন : "Regular students of Vidya-Bhavana, either resident or non-resident, may be granted certificates on satisfactory completion of their work and on presentation of an approved thesis which must first be published in some recognised journal. Every canditate will thereafter ordinarily be required to present himself before a public convocation for defending his thesis."[১২২] অবশ্য, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এখন 'বিদ্যার উৎপাদন' কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-কেন্দ্রিক রূপটির বিকাশে ততটা যত্নবান নন, যতটা 'বিদ্যার বিতরণ' সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের প্রসারে। চতুর্থ ও শেষ বিদেশি অতিথি-অধ্যাপক, কার্লো ফর্মিকি (Carlo Formichi) শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ৩ মার্চ, ১৯২৫ সালে; আচার্য তুচ্চি (Giuseppe Tucci) ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষে। ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৫-এ বিশ্বভারতী পরিষদের বাৎসরিক সভায় প্রতিষ্ঠাতা আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথ বললেন : "এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধিবিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণ ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ... কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তাহলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্ত রূপটি দেখতে পেতেন।"[১২৩] দুঃখের বিষয়, এ-কথা কেউ মনে রাখে নি, 'যজ্ঞকর্তারা' বিশ্বভারতীর 'মুক্তরূপ'টি দেখার জন্য যত্নবানও হন নি।

চতুর্থত, আমরা জানি যে বিশ্বভারতীতে পূর্ব-পশ্চিম মিলনের উদ্দেশে প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিচর্চার গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তিহীনভাবে বলে এসেছেন ১৯২০ সাল থেকে। কিন্তু কার্যত সেই পরিকল্পনা এখানে যথার্থভাবে রূপায়িত হয় নি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে যা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয়েছিল (অল্প কিছুকালের জন্য হলেও), তা হল প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। সাধরণভাবে ভাষা শিক্ষা ও কলেজের নির্দিষ্ট পাঠক্রম ছাড়া, গবেষণা স্তরে ইয়োরোপীয় বিদ্যাচর্চা অথবা প্রাচ্য ও পাশ্চত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনার কোনো আয়োজন এখানে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে যে-সব পণ্ডিতদের অতিথি-অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন— সিলভ্যাঁ লেভি (৯ নভেম্বর, ১৯২১ - ১৪ মার্চ, ১৯২২), মরিস উইনটারনিটস্ (১১ ডিসেম্বর, ১৯২২-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩), স্টেন কোনো (১৩ নভেম্বর, ১৯২৪ - জানুয়ারি ১৯২৫), কার্লো ফর্মিকি (২১ নভেম্বর, ১৯২৫ - ৩ মার্চ, ১৯২৬)— তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রাচ্য অথবা ভারততত্ত্ববিদ। এঁরা ছাড়া, লেসনি (ডিসেম্বর ১৯২২ - ২৩ এপ্রিল ১৯২৩) এবং তুচ্চি (নভেম্বর? ১৯২৫ - নভেম্বর? ১৯২৬)— উভয়েই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারত বিদ্যাবিশারদ। স্ট্যানলি জোনস্ (Stanley Jones) নামক একজন খৃস্টান পণ্ডিত অবশ্য ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনে বেশ কিছুদিন বাস করে ছিলেন। কিন্তু এঁর বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

পোরবন্দর থেকে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লেখা যে-চিঠির উল্লেখ একটু আগে করেছি, সেখানেও কবির প্রস্তাবিত শিক্ষনীয় বিষয়গুলির মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার আধিক্য আমাদের নজরে পড়ে। বস্তুত, স্বল্পকালের জন্য হলেও, বিশ্বভারতীতে ভারতবিদ্যাচর্চা যথেষ্ট ফলপ্রসু হয়েছিল। ১৯২৩ সালে বরোদা রাষ্ট্রীয় পুঁথিশালার প্রাক্তন কর্মী অনন্ত শাস্ত্রী কিছুদিন ধরে বিশ্বভারতীতে একটি পুঁথিসংগ্রহশালা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। অনন্ত শাস্ত্রীর সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথিগুলির সাহায্যেই বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় অতিথি-অধ্যাপক উইনটারনিটস্ পুণের ভাণ্ডারকর ইনস্টিট্যুটের সহযোগে মহাভারতের নানা-পাঠ সম্বলিত একটি সংস্করণ প্রস্তুত করার আয়োজন করেছিলেন বিশ্বভারতীতে। ১৩২৯ (১৯২২)-এর অগ্রহায়ণ মাসে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখেছিলেন: "মহাভারত প্রকাশ কার্যে অধ্যাপকের [উইনটারনিটস্] পরামর্শ গ্রহণের জন্যে পুণা ভাণ্ডারকর ইনস্টিটুট থেকে সম্ভবত তিনজন পণ্ডিত আমাদের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশ থেকে সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র কি কাউকে পাওয়া যাবে? উপযুক্ত ও যথেষ্ট ছাত্র না পেলে এই সকল পণ্ডিতের সমাগম ব্যর্থ হয়ে যায়। সম্প্রতি আশ্রমে ছাত্রদের মধ্যে তেমন কেউ আছে কি? অযোগ্য ছাত্র কর্তৃক বিশ্বভারতীকে ভারগ্রস্ত করা উচিত হবে না।"[১২৪] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : "তাঁহার [অনন্ত শাস্ত্রীর] এই সব সংগ্রহের মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের কয়েকখানি মূল্যবান পুঁথি ছিল; সেগুলি মহাভারতের বিবিধ পাঠযুক্ত সংস্করণ প্রস্তুতির সময়ে কাজে লাগিল। ... মহাভারতের বিভিন্ন পাঠ-সংকলনের জন্য শান্তিনিকেতন, লাহোর, মাদ্রাজ ও পুনা— এই ছয়টি স্থান নির্বাচিত

হয়। শান্তিনিকেতনে পূর্ব ভারতের পুঁথির পাঠ সংকলিত হইত; সেই পাঠ-সম্বলিত কাগজ লাহোর ও মাদ্রাজ ঘুরিয়া পুনায় যাইত— সেখানে শেষে সম্পাদন কার্য নিষ্পন্ন হইত। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর এই 'কোলেশন' কার্য চলিয়াছিল। বিধুশেখর ইহার স্থানিক কর্তারূপে কার্য পরিচালনা করিতেন...।"[১২৫]

বিশ্বভারতীতে ভারতবিদ্যাচর্চার উদ্দমের কথা বলেছেন তখনকার ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলীও। তিনি লিখেছেন : "তখন রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্বা-চার্যদের। তাঁরা এসে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করলেন, প্রধানত প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা (এবং সর্বপ্রধানত ইন্ডোলজি)— চীন, তিব্বতী ভাষাও বাদ গেল না..."[১২৬] কিন্তু প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার এই মান ও আগ্রহ বেশিদিন বজায় থাকেনি। তৃতীয় অতিথি - অধ্যাপক, স্টেন কোনোর (Sten Konow) অবস্থিতি কালেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও সুকুমার সেন প্রতি সপ্তাহে আচার্য কোনোর কাছে খোটানী, ধম্মপদ ও শক ভাষা শেখার জন্য বিশ্বভারতীতে আসতেন।[১২৭] ১৯২৫-এর পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যোৎসাহী ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপকদের জ্ঞানচর্চার উদ্দেশে বিশ্বভারতীতে আগমনের বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তখন বিশ্বভারতীতে ক্রমশই শিক্ষাভবনের গুরুত্ব বিস্তারলাভ করছে।

বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা অথবা ভারতবিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। লক্ষণীয় যে, ১৯২১ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন তাঁদের একজনও ভারতীয় নন। কেন এই অনুপস্থিতি? তৎকালীন ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে ভারতবিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিতের তো অভাব ছিল না? প্রবীনদের মধ্যে ছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রমথনাথ তর্কভূষণ। অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমাপ্রসাদ চন্দ ও পাটনার কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল। এঁরা দুজনেই নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে এসেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে ও ১৯২৩-এর জানুয়ারি মাসে। এঁরা ছাড়াও ছিলেন এলাহাবাদের গঙ্গানাথ ঝা, পুণের ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো বহু ভারতবিদ্যাসাধক। রবীন্দ্রনাথ কি কখনো এঁদের কাউকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, নাকি এঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি? আংশিক সময় অধ্যাপনার উদ্দেশে এবং অল্প কিছুকালের জন্য (১৯২৩-২৪) অবশ্য এসেছিলেন জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপোরেওয়ালা, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং কালিদাস নাগ। স্বভাবতই, এঁরা কেউই বিশ্বভারতীর ভারতবিদ্যাচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী হন নি অথবা এগিয়ে নিয়ে যাবার অবকাশ পান নি।

বিশ্বভারতীতে ভারতবিদ্যাচর্চার স্বর্ণযুগ যখন প্রায় অবসিত, সেই সময়ে "অত্যন্ত দীনভাবে 'কলেজ' আরম্ভ হইল।"[১২৮] শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবশ্য একমাসের (জুলাই-অগস্ট ১৯২৫) মধ্যেই পদত্যাগ করেন।[১২৯]

এই সময় থেকেই বিশ্বভারতীর কলেজের ছাত্রেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান। ১৯২৬ সাল থেকে, নেপালচন্দ্র রায়, জাহাঙ্গীর বকিল, প্রেমসুন্দর বসু ও নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতাকালে শিক্ষাভবন ক্রমশ বিস্তারলাভ করতে থাকে। ছাত্র সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কলেজে নিয়মিত অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা শুরু হয় নলিনচন্দ্রের অধ্যক্ষতার সময় থেকে (ডিসেম্বর ১৯২৮-সেপ্টেম্বর ১৯৩২)। ইতিমধ্যে দুটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমটি হল বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন (Lord Lytton)-এর নির্দেশে বাংলাদেশের তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ওটেন (E.E Oaten)-এর বিশ্বভারতী পরিদর্শন। ওটেন, কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, হারলে (A.H.Harley)-সহ বিশ্বভারতী পরিদর্শনে আসেন ১৯২৫-এর ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর অ্যান্ড্রুজ তখন শিক্ষাভবনের অস্থায়ী অধ্যক্ষ। ওটেন বিশ্বভারতীর শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, তাতে বিশ্বভারতীর নানা বিভাগের কাজের যথেষ্ট প্রশংসা ছিল। ওটেন লিখেছিলেন : "এখানে গবেষণার জন্য যে সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হচ্ছে তা অন্যান্য দেশের গবেষকদের কাছে ইতিমধ্যেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে... ফলত এমন একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে যা উৎসাহব্যঞ্জক ও আদর্শ হয়ে থাকবে... যে সব খ্যাতনামা পন্ডিত এখানে কাজ করছেন তাঁরা বিভাগটিকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন এবং এখন একে সংস্কৃত শিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের।[১৩০] (অনুদিত)। অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করে ওটেন জানিয়েছেন : "শেষ করার আগে আমি যা বলব— যা মি. অ্যান্ড্রুজ যথার্থই আমাকে বলেছেন— এখন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সাফল্য হল তিনটি— *প্রাচ্য বিদ্যায় গবেষণা, নন্দলাল বসুর অধীনে চিত্রকলা শিক্ষা* এবং *পল্লী সংগঠন*।"[১৩১] (বক্ররেখ আমার)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ওটেনের বিশ্বভারতী পরিদর্শনের প্রায় মাস তিনেক পরে সস্ত্রীক লিটনের শান্তিনিকেতনে আগমন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিটনের হাতে একটি আবেদনপত্র দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী যাতে তার নিজস্ব পাঠক্রম প্রস্তুত করার, পরীক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার ও ডিগ্রি প্রদানের অধিকার পায়— আবেদনপত্রে সেই অনুরোধ করা হয়েছিল। আবেদনপত্রটির একটি স্বাক্ষরহীন প্রতিলিপি (টাইপড্) রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রয়েছে এবং রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক, প্রয়াত সনৎকুমার বাগচী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রতিলিপিটি মুদ্রিত করেছেন।[১৩২] লিটন অবশ্য এই অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষমতা জানিয়ে ১৯২৫-এর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে লিটন লিখেছিলেন : "The Visvabharati appears to me to undertake *advance work in oriental languages alone. Its main activities seem to me to be diverted towards School and elementary University work.* I hardly feel therefore, that it has yet reached a

sufficiently advanced standard in a variety of subjects to justify its recognition as a university by Government."[১৩৩] (বক্ররেখ আমার)। বিশ্বভারতী একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পেয়েছে বলে লিটনের মনে হয় নি। কলেজ বিভাগের কাজকে তাঁর মনে হয়েছে প্রাথমিক, এবং গবেষণার কাজ সম্বন্ধে তিনি কোনো মন্তব্যই করেন নি।

বস্তুত, ১৯২৫-২৬ সালে শিক্ষাভবন ঠিকমতো সংগঠিত হয় নি। বছর ছয়েক পরে, নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় শিক্ষাভবন পুরোপুরি কলেজে পরিণত হল। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন : "বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবন বা কলেজ বিভাগ ড. নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর অধ্যক্ষতায় একটি বিশিষ্ট রূপ লইতেছে। কবি সকল সংবাদ পাইতেছেন; কিন্তু শিক্ষাভবনের এই আধুনিকীকরণ আশ্রমের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি বলিয়া কবির মনে হইতেছে।... বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ বিদ্যাভবন লইয়াও দুশ্চিন্তা কম নয়।"[১৩৪] রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মারবুর্গ থেকে ২৮ জুলাই, ১৯৩০-এ নলিনচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে : "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ষোলো আনা ফল পেয়েছ শুনে পত্রবাহক যোগে সাধুবাদ পাঠাচ্ছি। ... তবে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে, পরীক্ষার ফল যে খুব বেশি দামী এ-কথা আমি কোনোদিন মনে করিনে, বাল্যকালেই তার পরিচয় দিয়েছি— বৃদ্ধকালেও যে মতের পরিবর্তন হয়েছে তার লক্ষণ দেখিনে।... শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা প্রাণের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা... পরীক্ষা পাস করানো নয়। ... যে বিদ্যালয়কে নিজের প্রাণশক্তি দ্বারা ছাত্ররা প্রতিদিন সৃষ্টি না করে সে বিদ্যালয় বিদ্যার খাঁচা। তোমার ছাত্ররা যতদিন আমাদের আশ্রমের সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন না করবে ততদিন তাদেরও অগৌরব, আমাদেরও ব্যর্থতা। ... পরীক্ষা... ক্লিষ্ট জীবনের আশ্রুজল গ্রহণ কোরো না, কোরো ভারতীয় প্রসাদ থেকে অমৃতবিন্দু।"[১৩৫]

যদুনাথ সরকার ৩১ মে, ১৯২২-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : "বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাইস্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ পণ্ডিত ও মণীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে ৩য় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ) ও বেশ কার্যকর হইবে— যদি ছাত্র আসে। কিন্তু ২য় স্তরটি (অর্থাৎ সামুলী কলেজের ৪টি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই।"[১৩৬] বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় দ্বিতীয় স্তরটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে বিশ্বভারতীর ইতিহাস আদ্যন্ত একটি আপোসের ইতিবৃত্ত। দুঃখের কথা এই যে, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই আপোস সংঘটিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই। সেই ক্ষোভ, গ্লানি ও বেদনার কথা কবি বার বার ব্যক্ত করেছেন তাঁর জীবনের শেষ দশকে, সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট করে ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬-এ চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে। পত্রটি দীর্ঘ, কিন্তু নানা কারণে উদ্ধারযোগ্য। চারুচন্দ্রকে এই চিঠি লেখার কারণ এই যে তিনি তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। চিঠিটি এইরকম : "শান্তিনিকেতন, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬ :

চিঠিপত্র লিখতে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা হয়েছে তবু না লিখে থাকতে পারলুম না। ভালো করে হয়তো গুছিয়ে লিখতে পারব না তবু আপনি বুঝে নিতে পারবেন— কেন না যা বরাবর বলেছি সেই কথাই লিখতে বসলুম।

বয়স বেশি হওয়াতে জীবনের ক্ষেত্র থেকে মন দূরে চলে গিয়েছে। আজকাল একলা বসে সেই দূর দিগন্ত থেকে বার বার পিছন ফিরে দেখি। সেই দূরনিবদ্ধ মনের কথা আজ বলব।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হোলো প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভে নিঃসঙ্গ একলা বেরিয়ে পড়েছিলুম দুঃসাধ্য কাজের সংকল্প নিয়ে। না ছিল অর্থ না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা। এত যে সাহস পেয়েছিলুম তার একটা কারণ আইডিয়ালের প্রেরণা। সেই আইডিয়ালকে রূপ দেবার আনন্দে মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। আমার সেই আইডিয়ালের সঙ্গে আমার স্বদেশবাসীর অভ্যস্ত পন্থার সঙ্গে মিল ছিল না। প্রচলিত শিক্ষাবিধিকে উপেক্ষা করেই কাজে এগিয়েছি। দুঃখ পেয়েছি বিস্তর, দরদ পাইনি দেশের কাছ থেকে। নিজের সংসারকে বঞ্চিত করেছি।— কিন্তু কখনো অনুশোচনা করি নি।

ক্রমে আমার পথ প্রশস্ত হল, সে পথ নিকটের থেকে বহুদূরে গেল। আইডিয়ালের অনুসরণে দূরে যেতে পেরেছিলুম বলেই বিদেশের কাছ থেকে অসামান্য সম্মান পেয়েছি। শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্পের যে আদর্শ পৃথিবীর কাছে ধরেছি মণীষীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমন্ত্রণে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতেরা সমুদ্রপার হতে সাড়া দিয়েছেন।

অবশেষে একদিন কন্‌স্টিট্যুশনের খাল কাটা হোলো, বেনো জল ঢুকল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী মাতব্বর লোকেরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত হলেন। তখনো প্রলয়ের চেহারা সুস্পষ্ট দেখতে পাইনি।

বৎসরের পর বৎসর ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে লাগল আমার আদর্শ। যে আসন বানাতে বসেছিলেম সর্বকালের অতিথির জন্যে, তা সঙ্কীর্ণ হয়ে এল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ির কাছে। সব কিছুকে খর্ব করে একটা কলেজ শিং উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এমনি আমার দুর্ভাগ্য শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিশ্বভারতী আজ কলকাতা য়ুনিভার্সিটির ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা হয়ে কিছুমাত্র অগৌবর বোধ করছে না, সরকারী এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মনোরঞ্জন করে পুরস্কার লাভের ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে শনির মতো এই পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করেছে।

কলেজ বিশ্ববাসীর কাছে তার কোনো মূল্যই নেই আর স্বদেশে তার স্থান এক কোণে। যখন ভিক্ষা করতে বেরই তখন যে ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করি তিনি বিশ্বেরই ঠাকুর, কিন্তু দান যা পাই তা পড়ে এসে এই কলেজের ঝুলিতে। মনে পড়ছে একদিন এই কলেজের বিরুদ্ধে মাথা তুলেই একলা আমার তরী ভাসিয়েছিলুম— কিন্তু তরী আজ ঘুরে ফিরে এলো সেই কলেজের ঘাটেই। বসে বসে দেখছি আমার শান্তিনিকেতন আপন আইডিয়ালের গর্ব ভাসিয়ে দিয়ে আজ ছেলে পাস করাচ্ছে। অর্থের টানাটানি

পড়েছে আর আমি চলেছি ভিক্ষা করতে। শরীর নষ্ট করতে আমার কোনো আপত্তিই নেই— কিন্তু মনকে কত খাটোই করেছি। কোন লজ্জায় বাংলাদেশের কলেজের জন্যে হাত পাততে যাই অন্য প্রদেশের ধনীর দ্বারে। সেই লজ্জায় কথাটা স্পষ্ট করে বলিনে— যে বিশ্বজনীন সঙ্কল্প নিয়ে তপস্যা আরম্ভ করেছিলুম তারি দোহাই পাড়ি— কিন্তু সত্য করে বলুন দেখি সে তপস্যা আজ এখানে কোথায়? কিছু আছে কলা ভবনে— বিদ্যা ভবনে থাকতে পারত কিন্তু সে আছে কতকটা দুয়োরানীর অবস্থায়। তার মর্যাদা যে কলেজ প্রভৃতির সব কিছুর চেয়ে বড়ো। সেই যে সর্ব্বজনীন আসনের অধিকারী সেই চিত্তটা কলেজের আওতায় অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে এসেছে। ভাগ্যে আমি কাঠেবাড়ের টাকায় কলাভবনের ভিত্তি পাকা করে ছিলুম নইলে আজ সে টাকা যেত কলেজের পেট ভরাতে। কিন্তু এই কলেজ কি আমার। এর জন্যে প্রাণপাত করেও কি শ্যামাপ্রসাদ-বর্গের কাছে বাহবা পাব? ছাত্রদের কাছে সন্ধান করলে জানা যায় যথার্থ বুদ্ধিমান ছাত্র অভিভাবকেরা এখানে পাঠায় না। আমাদের জোটে ক্ষুদকুঁড়ো। তাদের নিয়ে এখানকার আবহাওয়ার উন্নতি হওয়া দূরে থাক্ উল্টোটাই হয়। মনের আক্ষেপে হয়তো অতুক্তি [য] করছি— মনে করা যাক এখানে আদর্শ কলেজই গড়ে উঠেছে— কিন্তু ততঃকিম।

একদিন নির্মল নির্ঝরিনী বেরিয়েছিল গিরি শিখর থেকে— প্রশস্ত নদীর গৌরবে তীরে চিত্তলোকের জন্যে তীর্থভূমির একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল— অবশেষে আজ সে এসে মজে গিয়েছে পাঁকের মধ্যে।

প্রশান্ত অপূর্বরা আমার উপরে এই পরাভবের বোঝা চাপিয়ে গেছে। আমার সমস্ত তপস্যা তার কাছে সম্পূর্ণ হার মেনেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড় হয়ে প্রণাম করি— কিন্তু অর্থ না পাই শান্তি পাইনে কেন? পরের পোষ্যপুত্রের পোষণের ভার আমার মতো গরীবের উপরে কেন? এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। আজ আমরা দেশের শ্রদ্ধা হারিয়েছি সে জন্যে দোষ দেব কাকে? রিপন কলেজ বিদ্যাসাগর কলেজ মিত্র ইনস্টিট্যুশনের প্রতিযোগী হয়ে শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করব কী দাবীতে? ভাগ্যে ছিল কলাভবন এবং শ্রীনিকেতন। আমার শেষ বয়সের সমস্ত চেষ্টা যদি ঐ কলাভবন সঙ্গীত ভবনের উন্নতি সাধনের জন্যে দিতে পারতুম তা হোলে আমি গর্বের সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতুম, এবং মরার আগে মনে করতুম জীবন সার্থক হয়েছে— কিন্তু এই কলেজটার জন্যে?"[১৩৭]

৭.

এতক্ষণে আমরা যদুনাথ-কৃত বিশ্বভারতীর সমালোচনা প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি। কি বলেছিলেন যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ৩১ মে, ১৯২২-এর দীর্ঘপত্রে? বিশ্বভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যদুনাথের প্রধান অভিযোগটি আমরা একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো সংযোগের সেতু দেখতে পান নি যদুনাথ, অথচ এই সংযোগ-সেতুই ছিল যদুনাথের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়। ১৯২৫-এর আগে বিশ্বভারতীতে কলেজের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, উত্তরবিভাগের ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পাঠক্রমও ছিল না। ১৯২১ সালে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় মুদ্রিত বিশ্বভারতীর পরীক্ষা ব্যবস্থা ও ডিগ্রি প্রদানের অবলুপ্তি এবং আবশ্যিক পাঠক্রমের শিথিলতা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি যদুনাথের চোখে পড়েছিল নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধেও যদুনাথের অনবহিত থাকার কোনো কারণ নেই। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভ্যিয়ু' পত্রিকার তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন। পরিচিত বিদ্বজ্জনদের কাছ থেকেও বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডের বিষয়ে শুনেছিলেন নিশ্চয়ই, যদিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরাসরি বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ কখনও আলোচিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসবেও (২৩ জানুয়ারি, ১৯২১) যদুনাথ উপস্থিত ছিলেন না।

অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে নিয়মনিষ্ঠ ও যুক্তিসিদ্ধ বিদ্যার সাধক যদুনাথের কাছে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও কর্মপ্রণালী একটু অস্পষ্ট ঠেকেছিল। উচ্চতর জ্ঞানচর্চার অনুধাবনের জন্য ছাত্রদের যে প্রস্তুতির দরকার বিশ্বভারতীতে তার একান্ত অভাব লক্ষ করে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : "যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত হইয়াছে, সে কিরূপে রিসার্চ অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে ও তাঁহার নির্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না; কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি— অর্থাৎ উচ্চ general knowledge এবং দুই বা তিন বিষয়ের সূক্ষ্ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ তাহাদের ঘটে নাই; তাহাদের মধ্য ভাগটা কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। যেমন যে ছাত্র এম্-এর ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায়, তাহার পক্ষে পূর্ব্বেই বি.এ-তে অর্থনীতি ও শাসনশাস্ত্র এবং একটি ভাষা রিসার্চ-বর্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত জানিলে চলিবে না, গ্রীসীয় হিস্ট্রী, মিশর ব্যাবিলনের ইতিহাস এবং Political philosophy-তে অগ্রে বি.এ পাস করা আবশ্যক, নচেৎ তাহার মনটা সংকীর্ণ থাকিয়া যাইবে। সিলভ্যাঁ লিভির বক্তৃতা শুনিয়া ফল পাইতে হইলে, আগে ভারতীয় দর্শন, পালিসাহিত্য, ভাল জানা চাই; এবং ফরাসী-ভাষায় লিখিত ইন্দোচায়না সম্বন্ধে কতকগুলি বই পড়িয়া রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ exact knowledge-এ পরের অর্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া, তাহার পরে ও উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌঁছিতে পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (ইহাকে grind বলিতে পারেন) মামুলী কলেজে হয়, বোলপুরে নহে।"[১৩৮]

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় নিয়ে যদুনাথের এই সমস্যা ছিল না। অন্তত তিনবার তিনি এসেছেন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ১৯১০ থেকে ১৯১৩-এর মধ্যে। প্রতিবারই তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক চিঠিতে বিদ্যালয় প্রসঙ্গে যদুনাথ বললেন : "... পূর্ব্বে যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রদের চরিত্র দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত হইয়া, পরে তাহারা মামুলী কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্কটা সংসারের

উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত। অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার অভাব বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে বোলপুরের কাজটা যে কাঁচা হইতেছে তাহা আপনিই আমাকে বলিয়াছেন।" (পাণ্ডুলিপি-ধৃত পৃষ্ঠা-২)। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা— বিশেষত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান— যে যদুনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে "The Vernacular Medium : Views of an Old Teacher" ও "Confessions of a History Teacher" নামক দুটি প্রবন্ধে।[১৩৯]

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ভিন্ন। যদুনাথ লিখেছেন : "কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি বৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই— (১) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যপনা বুঝিবার এবং উচ্চ প্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা, intellectual discipline and exact knowledge, পূর্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমন্ডলী এবং শিক্ষায় পরিপক্ক চরিত্রবান একনিষ্ঠ নেতা একজন। এই তিনটি থাকিলে টাকা বা জিনিষের অভাব হয়না, এবং এ অভাবও বেশীদিন থাকে না।" (পৃ: ২-৩)।

বস্তুত, সমস্ত চিঠিতে 'intellectual discipline' ও 'exact knowledge' বাক্যবন্ধ দুটি যদুনাথ এতবার ব্যবহার করেছেন যে সন্দেহ থাকে না শিক্ষা বলতে তিনি কোনো লব্ধ প্রতিষ্ঠ কলেজে (যেমন যদুনাথের ছাত্র বয়সের প্রেসিডেন্সি কলেজ অথবা তাঁর অধ্যাপনাকালে পাটনা কলেজ) অনুসৃত tutorial system-এর কথাই ভাবছেন, professorial system-এর কথা নয়। ১৯২৩-এ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত নির্দেশলিপিতে রবীন্দ্রনাথও 'ব্যাখ্যান' (professorial) ও 'অধ্যাপনা' (tutorial system)-র কথা বলেছিলেন; কিন্তু অধ্যাপনার প্রাধান্য স্বীকার করেন নি। তাঁর পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের ব্যাখ্যানই রচনা করবে 'বিদ্যার উৎপাদন'-এর কেন্দ্র, অধ্যাপকের 'বিদ্যার বিতরণ'-এর ক্লাস নয়। ঠিক বিপরীত মেরুতে যদুনাথের অবস্থান। তাঁর পরিকল্পনায় 'প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক'দের দ্বারা বিদ্যার বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ হওয়া উচিত। যদুনাথ মনে করেন একমাত্র এইভাবেই 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং উচ্চপ্রণালীতে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা' প্রাপ্ত ছাত্রমন্ডলী তৈরি করা সম্ভব।

লক্ষণীয় যে, 'exact knowledge', বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও 'intellectual discipline'-এর সাহায্যে গবেষণার জন্য উপযুক্ত ছাত্র তৈরি করাই যদুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন : "একমাত্র তরুণ বয়স এবং কলেজের শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাই এই অভ্যাস এই মনের ঝোঁক দিতে পারে। বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে পরে ইহা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রগণ রিসার্চ ক্লাসে

উঠিয়া মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে (ভাসাভাসা synthesis বাদে) কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না, অন্তত তাহাদের এমনকি সর্বোচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য হইবে না।" (পৃ: ৯-১০)। এই ভাবনা থেকেই যদুনাথ 'বোলপুরের বায়ু'র প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল : "...বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge কে, intellectual discipline কে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্কমস্তিষ্ক, 'বিশ্বমানবের' শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে।" (পৃ: ৪)। এই অভিযোগের অনেকটাই নিশ্চয়ই অত্যুক্তি, কিন্তু একেবারে ভিত্তিহীন বলে মনে হয় না।

এই সূত্রেই যদুনাথ ইয়োরোপিয় বৈজ্ঞানিকের বিমান আবিষ্কার, জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা এবং 'পালী ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ সংস্করণ' প্রস্তুতকারক পন্ডিতদের কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশীলন ও নিরলস সাধনার ইতিহাসকে 'বোলপুরের বায়ু'তে হৃদয়জাত 'synthesis of knowledge'-এর বিরুদ্ধে স্থাপন করেছেন তাঁর দীর্ঘ চিঠিতে। শুধু তাই নয়, এই সূত্র ধরেই তিনি খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই রবি বর্মা ও 'নব্য ইন্ডিয়ান আর্ট'-এর প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন : "আমরা বলি যে রবি বর্মার ছবিতে ভাব নাই, তাহা Nature-এর দাসোপযোগী নকল। এই মত প্রচারের ফলে, অবনীবাবু ও নন্দলাল ভিন্ন আর সব নব্য ইন্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা কাজটি ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নাই, শরীর বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্বে নানা পরীক্ষা (studies বা sketches) করিয়া চিত্রের উপযোগী ঠিক অঙ্গভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই; এক লাফে ভাবের ছবি আঁকিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এসব ছবির মধ্যে যাহা ভাল তাহাকে অজন্তার বা মুঘল চিত্রের নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না। অপরগুলির সব কাঁচা ও খারাপ, ঠিক শিশুর আঁকা বা cavemen এর আঁকা ছবির মত, শুধু রংগুলি তার চেয়ে ভাল। ... ইন্ডিয়ান আর্টের চরম আকাঙ্ক্ষা এই কি যে সাহেবেরা বলিবে How truly Indian! অর্থাৎ বিশ্বজগতের সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে না, কালা আদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন standard আছে তাহা দিয়া ইহার বিচার করা হইবে? ... ইহার ফলে ইন্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষানবীশের হাত ঠিক করিতে যে পরিশ্রম যে প্রকৃতি অনুসরণ আবশ্যক তাহা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহঙ্কারে ত্যাগ করিয়া একেবারে ভাব-প্রকাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন— ফল প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি। সেইমত বোলপুরের ছাত্রেরা exact knowledge কে ঘৃণা করিয়া এক লাফে synthesis এবং ভাবপ্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিয়াছে।" (পৃ: ১০-১৩)।

যদুনাথের এই সমালোচনার সরাসরি কোনো প্রতিবাদ করেন নি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ২ জুন, ১৯২২-এর পত্রোত্তরে। প্রসঙ্গটি খানিকটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন : "আপনার পত্রে বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে যে উগ্রতা আছে তাহাতে সন্দেহ হয় তাঁহাদের সঙ্গে হয়ত আপনার বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। আমি তাহা জানিও না এবং তাঁহাদের আলোচনায় ঘরের কোণেও কোনোদিন যোগ দিই না— যদিও একথা স্বীকার করা কর্তব্য বোধ করি যে, বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে ও আর্টসাধনা সম্বন্ধে

আপনি যে মত যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি মিলিনা।"[১৪০]

আর একটি প্রনিধানযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যদুনাথ তাঁর চিঠিতে। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, বিশ্বভারতীর সূচনার তিন বছর পরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়োরোপিয় বিদ্যাচর্চার কোনো অয়োজন করা হয় নি, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব ও পশ্চিম সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র স্থাপনার পরিকল্পনা সত্ত্বেও। এক দিকে ভারতবিদ্যাচর্চার কেন্দ্রীভূত আয়োজন, অন্যদিকে ইয়োরোপিয় বিদ্যাচর্চার অনুপস্থিতি— এই দুই বিশদৃশ অবস্থানকে যদুনাথের মনে হয়েছিল আধুনিক বিদ্যাসমবায়ের পরিপন্থী। অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : "আমি এখনও মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নব্যন্যায়ের কচকচি, কেঁথা সেলাই-এর প্যাটার্ন, এবং আলিপনার নক্‌সা, অথবা মুঘলচিত্রের সাত-নকলের খাস্ত নকল। ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতেও জগতকে exact knowledge দিতে পারে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের scientific history রচনা করিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি (re-chauffe) বা অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া 'জগৎ সভার মাঝে' গ্রহণীয় নতুন জ্ঞানভান্ডার সৃষ্টি করিতে পারে— এ বিশ্বাসটা জীবনের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহিনা।" (পৃ: ৭)।

মনে রাখা দরকার যে, যদুনাথ যখন এই চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, তার দুবছর আগে স্যর মাইকেল স্যাডলার (M.E. Sadler)-এর সভাপতিত্বে কার্যরত Calcutta University Commission, 1917-1919-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে বলা হলো : "The University of London, the model on which all the Indian Universities had been formed, was in the throes of reconstruction. *Since 1884 there had been a growing opinion that the University ought to undertake teaching functions and that it was no true university unless it did so.*"[১৪১] (বক্ররেখ আমার)। কমিশনের সুপারিশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুখ্যত একটি 'teaching univeristy'তে রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছিল এবং সেই সূত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপর : "No satisfactory reorganisation of the university system of Bengal will be possible unless and until a radical reorganisation of Secondary education, upon which University work depends, is carried into effect."[১৪২] রিপোর্টের ৩৪তম অধ্যায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রধানত শিক্ষা বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে কলেজ স্তরে সুপরিকল্পিতভাবে 'tutorial work' শুরু করার কথা বলা হল এবং এ-কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হলো যে : "It [tutorial work] demands able men, and the best lecturers should take part in it."[১৪৩] কমিশনের রিপোর্টে স্নাতকোত্তর স্তরে গবেষণা কার্যের উল্লেখ থাকলেও কোনো বিশদ আলোচনা ছিল না।

সহজেই অনুমান করা যায় যে, কমিশনের উল্লিখিত সুপারিশগুলির সঙ্গে যদুনাথ সম্পূর্ণভাবে সহমত ছিলেন। ১৯২২-এ লিখিত একটি প্রবন্ধে স্যাডলার কমিশন রিপোর্টের প্রায় প্রতিধ্বনি করে যদুনাথ লিখেছিলেন : "The most crying need of Bengal today is the improvement of Secondary education. It is the key-stone of our educational arch, and the entire system, Primary and University, depends upon it."[১৪৪] মাস দুয়েক আগে লেখা অন্য আর একটি প্রবন্ধে যদুনাথ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের অনিয়ন্ত্রিত অবাধ প্রসার ও মাধ্যমিক এবং উত্তর-মাধ্যমিক পর্যায়ের দুরবস্থা লক্ষ করে বলেছিলেন: "And yet Sir Ashutosh Mukherji has been making our whole educational system top-heavy by a boundless expansion of the post-graduate classes and the rapid creation of new departments and their infinite subdivision into branches."[১৪৫] বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অসমঞ্জস বৃদ্ধিকে তাঁর মনে হয়েছিল মাইকেল স্যাডলার প্রস্তাবিত শিক্ষাদর্শের পরিপন্থী। যদুনাথ লিখেছেন : "The method of the Calcutta University is, therefore, diametricaly opposed to the principles laid down by Sir Michael Sadler, who says, 'the chief problems of Universities today are... *how to lessen the prevalence of lectures* and to substitute courses of guided self-training in library and laboratory, without leaving the idle without discipline and the inert without stimulus.'"[১৪৬] (বক্ররেখ মূলে)।

এইসব সাক্ষ্য থেকে অবশ্য প্রমাণিত হয় না যে গবেষণার মূল্য সম্পর্কে যদুনাথ অনবহিত ছিলেন। মুঘলযুগ সম্পর্কে তাঁর বিপুল ও বিস্ময়কর গবেষণাকর্ম ও ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির কথা স্মরণে রাখলে এ-কথা বলার ধৃষ্টতা আশাকরি কারোরই হবে না। যেটা প্রমাণিত হয় সেটা এই যে, 'বিদ্যার উৎপাদন' কে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বলে মনে করেন নি। তাঁর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল বিদ্যার সুশৃঙ্খল বিতরণ। বিদ্যার উৎপাদন বা গবেষণার কাজকে তিনি কখনও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, উচ্চতর জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক ও অপরিহার্য শর্ত হিসেবে কঠিন, শ্রমসাধ্য ও প্রগাঢ় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং সেটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই প্রস্তুতি ভিন্ন গবেষণার কাজ অর্থহীন। একাধিক প্রবন্ধ ও ভাষণে যদুনাথ এই প্রস্তুতি ও ঐতিহাসিক গবেষণার মেথডলজি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।[১৪৭] তাঁর ক্লান্তিহীন ও প্রায় অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও গবেষণাকর্মের কথা সম্প্রতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী।[১৪৮]

বিদ্যাচর্চার সর্বস্তরে যদুনাথ 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' অনুসরণ করার পরামর্শ

দিয়েছেন ছাত্র ও গবেষকদের এবং এই 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' যে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার অবদান তা স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইয়োরোপ থেকে আহৃত এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা মৌলিক গবেষণায় ব্রতী হতে পারি। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন : "India cannot afford to remain for ever an intellectual pariah, a beggar for crumbs at the doors of Oxford and Cambridge, Paris or Vienna. She must create within herself a source of the highest original research and assume her righful place as the School of Asia, even as Periclean Athens made herself the School of Hellas."[১৪৯] বলাই বাহুল্য, যদুনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কখনই ভিন্নমত হতেন না।

এই বক্তব্যের যুক্তিতেই যদুনাথ স্বাধীন ভারতে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন : "Hence, there must be created and vigorously worked a fountian-head of original research on the Indian soil, if free India is to justify her name." কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে : "Our purpose will not be served if we merely create small institutes of specialised research manned by a few savants buried in their laboratory. *Research and teaching must go hand in hand for the benefit of both; they languish if mutually isolated.*"[১৫০] (বক্ররেখ আমার)। এই উদ্ধৃতিতেই যদুনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের বৈপরীত্য ও মত-সমাবেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৮.

দার্শনিক ও রাষ্ট্রদর্শনবেত্তা জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে জ্ঞানতপস্বীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন্ : "It is highly desirable...that there should be a mode of insuring to the public the services of scientific discoverers, and perhaps of some other classes of savants, by affording them the means of support consistently with devoting a sufficient portion of time to their peculiar pursuits. The fellowships of the Universities are an institution excellently adapted for such a purpose; but are hardly ever applied to it, being bestowed, at the best, as a reward for past proficiency, in committing to memory what has been done by others, and not as the salary of future labours in the advancement of knowledge."[১৫১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে মিল এই প্রস্তাব করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসীমার বাইরে থেকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে তখনো এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ ছিল ইংলন্ডে। ১৮৫০-এর পর থেকে অবশ্য প্রশ্নটি নানা কমিশনের মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় বিতর্কের রূপ নেবে। মিল-উত্থাপিত প্রসঙ্গের ছেচল্লিশ বছর পরে, আমেরিকার বালটিমোরে, জনস্ হপকিনস্ (Johns Hopkins) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে টি.এইচ.হাকস্‌লিও (T.H. Huxley) প্রশ্নটি তুললেন আর একবার : "...it is of vital importance to the welfare to the community that those who are relieved from the need of making a livelihood, and still more, those who are stirred by the divine impulses of intellectual thirst or artistic genius, should be enabled to devote themselves to the higher service of their kind, as centres of intelligence, interpreters of Nature, or creators of new forms of beauty. And it is the function of a university to furnish such with means of becoming that which it is their privilege and duty to be."[১৫২] ইংলন্ডে ততদিনে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকে ঘিরে প্রসঙ্গটি স্পষ্ট দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে : বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়িত্ব কি— বিদ্যার উৎপাদন নাকি বিদ্যার বিতরণ?

আমরা দেখেছি যে, পরাধীন ভারতবর্ষে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নটিকে আবার তুলেছিলেন; অবশ্য প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উক্তিগুলি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি; তাদের দু-একটির পুনরুক্তি এক্ষেত্রে হয়তো বাহুল্য হবে না। ১৮ আষাঢ়, ১৩২৬ (১৯১৯)-এর একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন : "তারপর তাঁকে [বিধুশেখর শাস্ত্রী] পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল; এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য।"[১৫৩] চার বছর পরে, ১৯২৩ সালে, বিধুশেখর শাস্ত্রীকে পাঠানো একটি নির্দেশলিপিতেও জানিয়েছিলেন : "বিশ্বভারতী যাঁহাদিগকে আচার্যরূপে বরণ করিয়া লইবেন সংসার ভাবনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিমাসে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিবেন। তাঁহারা আশ্রমে বাসস্থান পাইবেন এবং সেখানে যে গ্রন্থাগার আছে তাহা ব্যবহার করিতে তাঁহাদের বাধা থাকিবে না।"[১৫৪] ইংলন্ডে বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কার প্রসঙ্গে উত্থাপিত এই বিতর্কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার অপরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না; এবং রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মতো আরও অনেক সমসাময়িক বাঙালি মণীষীই যে এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের আগে কেউই আমাদের দেশে বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করেন নি। জাতীয় স্তরে বিষয়টি কখনো আলোচিতও হয় নি। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টেও এই বিতর্কের

কোনো প্রতিফলন নেই। সেই কারণেই ইংলন্ডে এই বিতর্কের মূল প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

১৮৫০ থেকে ১৮৮০-এর মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য গঠিত ছয়টি কমিশনের বিপুল প্রতিবেদন আলোচনার কোনো অবকাশ এখানে নেই, কোনো প্রয়োজনও নেই। আমাদের পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক তা হল ১৮৫০-এর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চার্চ অভ ইংলন্ডের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের রূপ পেল। সেই সঙ্গে, শুধু কমিশনের সাক্ষ্যে নয়, জাতীয় স্তরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গে বিতর্কের সূত্রপাত হল। অবশ্য প্রশ্নটি শুধু দায়বদ্ধতার নয়, প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায্যতারও। কিভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সমাজজীবনে তার অস্তিত্বের বৈধতাকে প্রতিষ্ঠা করবে? এই বিতর্কে আমরা দুটি ভিন্ন ও প্রতিযোগী চিন্তাসূত্রের দ্বন্দ্ব লক্ষ করবো : "This change in the intellectual atmosphere naturaly affected the general conception of the role of the universities in society. Were they to be a kind of higher schools preparing men for the professions and the service of the state, or were they to be primarily institutes of research and the higher culture of the mind? Were they to be places of education or places of learning?"[১৫৫]

লর্ড জন রাসেল (Lord John Russell)-এর নেতৃত্বে ১৮৫০ সালে গঠিত প্রথম রয়্যাল কমিশনের বিতর্কের সময়,[১৫৬] হেনরি হ্যালফোর্ড ভন (Henry Halford Vaughan, the Regius Protestor of Modern History at Oxford) অক্সফোর্ডকে 'tutorial system' থেকে মুক্ত করে 'professorial system'-এর সাহায্যে একটি গবেষণা-প্রধান বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৫৭] অপর প্রান্তে ছিলেন 'tutorial system'-এর আপোষহীন সমর্থক, ব্যালিয়ল কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রখ্যাত দার্শনিক বেঞ্জামিন জাওয়েট (Benjamin Jowett)। প্রায় একই সময়ে জন হেনরি নিউম্যান (John Henry Newman), তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ *The idea of a University*-এর ভূমিকায় লিখলেন যে (১৮৫২), বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য : "... is the diffusion and extension of knowledge rather than the advancement."[১৫৮] কৌতুকের কথা এই যে, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে professorial system ও গবেষণা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মুখর প্রবক্তা, লিংকন কলেজের রেক্টর, মার্ক প্যাটিসন (Mark Pattison) কিন্তু প্রথম জীবনে টিউটোরিয়াল ব্যবস্থার স্বপক্ষে ছিলেন। তিনি তখন লিংকন কলেজের টিউটর। কলেজের কাজ থেকে পদত্যাগ করে প্যাটিসন ১৮৫৬ সালে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ পাঠ নিতে আরম্ভ করেন। এই অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্পর্কে প্যাটিসনের পূর্বতন ধারণাকে আমূল পালটে দেয়। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *Suggestions*

on Academical Organization এবং ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত *Essays on the Endowment of Research* নামক সংকলনে তাঁর সংযোজিত অধ্যায়ে প্যাটিসনের এই পরিবর্তিত ও নতুন অবস্থানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।[১৫৯]

বস্তুত, টিউটোরিয়াল ও 'বিদ্যার বিতরণ' ব্যবস্থার সমর্থকেরা বরাবরই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য ও আদর্শকে, এবং ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর তাদের প্রভাবকে, সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ১৮৪৭-এ বেঞ্জামিন জাওয়েট লিখেছিলেন : "There is nothing I less wish than to see Oxford turned into a German or a London University. On the other hand, is it at all probable that we shall be allowed to remain as we were for twenty years longer, in one solitary, exclusive, unnational corporation... our enormous wealth without any manifest utilitarian purpose..."[১৬০] অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার প্রসঙ্গে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা— যা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শের ইতিবৃত্ত— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই বিতর্ক জাতীয় স্তরে হাউস অভ কমনস্কে আন্দোলিত করেছিল। লর্ড জন রাসেল ও গ্লাডস্টোন সংস্কারের স্বপক্ষে— অর্থাৎ, গবেষণা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনে— মত প্রকাশ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, ডিজরেইলি ও লর্ড রবার্ট সেসিল চেয়েছিলেন প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রিক (tutorial system) বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৪ সালে হাউস অভ কমনস্-এ ডিজরেইলি বলেছিলেন : "If we have not these profound professors in England, it is because the character of the country is different; the character of our life is contrary to it. We are a nation of action, and you may depend upon it that... men will look to the House of Commons, and not to the professors' chairs in the universities."[১৬১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৮৫০-এর অক্সফোর্ড কমিশন কিন্তু তাদের রিপোর্টে (১৮৫২) গবেষণা-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলেই মত দিয়েছিল। কমিশনের মতে অক্সফোর্ডের প্রয়োজন একটি "...centralised university run predominantly by professors and factulties, with a much higher emphasis on research, on the Scottish/German model."[১৬২] ১৮৫৪, ১৮৫৬, ১৮৭২ এবং ১৮৭৭-এ গঠিত বিভিন্ন কমিশনে গৃহীত প্রস্তাবের পরেও অবশ্য এই বিতর্কের অবসান হয় নি। গবেষণা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থকেরা স্পষ্টতই এই বিতর্কে সংখ্যালঘু ছিলেন। কিন্তু অক্সফোর্ড— এই বিতর্ক সত্ত্বেও— ধীরে ধীরে 'বিদ্যার উৎপাদন' ও 'বিদ্যার বিতরণ' ব্যবস্থার মধ্যে এক আপোষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

গবেষণা-ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরলস প্রবক্তা, মার্ক প্যাটিসন কিন্তু ১৮৫৩-এর পর কখনও এই আপোষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি। মানবিক বিদ্যার মূল্য ও

উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি অক্সফোর্ড কমিশনের কাছে বলেছিলেন : "[The ideal of liberal education] is one which, *as it originated in a profound study of the nature of the mind, can only be appreciated by the maintenance of that study and knowledge.* It needs protection therefore... Remove restrictions on the Universities, and they will contribute their share towards popular education. But this is not their proper business, and has never been regarded so among us."[১৬৩] (বক্ররেখ আমার)। উদ্ধৃতির বক্ররেখ-যুক্ত বাক্যাংশটি প্রায় অনিবার্যভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেবে সত্তর বছর পরে, ১৯২১ সালে গৃহীত বিশ্বভারতীর সংবিধানের 'Aims and Objectives'-এর প্রথম অনুচ্ছেদ : "To study the miind of Man in its realization of different aspects of truth from different points of view." ষোলো বছর পরে, ১৮৬৮-তে প্রকাশিত *Suggestions on Academical Organization* গ্রন্থে, প্যাটিসন তাঁর বক্তব্যকে আরও বিশদ করে, প্রায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললেন যে, পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা কোনো সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হতে পারে না; বস্তুত, এই ব্যবস্থাগুলি শুধু যে বিদ্যাচর্চার পরিপন্থী তাই নয়, জ্ঞান সাধনার পক্ষে অনিষ্টকর। তাই : "The object of these 'Suggestions' has been to insist that the university shall be no longer a class-school, nor mainly a school for youth at all. It is a national institute for the preservation and tradition of useful knowledge. It is the common interest of the whole community that such knowleddge should exist, should be guarded, treasured, cultivated, disseminated, expounded."[১৬৪]

প্যাটিসন অবশ্য এই বিতর্কে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। অক্সফোর্ডে আধুনিক ইতিহাসের রেজিয়াস প্রোফেসর, হেনরি হ্যালফোর্ড ভন-এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ১৮৫০-এ গঠিত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময়ে তিনি বলেছিলেন : "The great want of Oxford hitherto has not been merely or chiefly that the Professors have not been sufficiently active in teaching, but that the system has disfavoured the existence, and missed the general effects of Professorial learning." অক্সফোর্ডের প্রয়োজন— "Men whose investigations could perpetually be adding to knowledge, not as mere conduits to convey it, but as fountains to augment its scantiness, and freshen its sleeping waters. Of such men we desire more than we have had. The first care must be to promote the creation of such." এই বিদ্বজ্জন গোষ্ঠী— রবীন্দ্রনাথ যাঁদের 'আচার্য' বলে অভিহিত করেছিলেন— তাঁদের ইচ্ছানুসারে বিদ্যা বিতরণের কাজেও নিজেদের সময় দিতে পারেন; কিন্তু তাঁদের

প্রকৃত সাধনা হলো : "They will investigate, reflect and write, even if they do not very actively lecture : they will address the world if not the students of the academy, and their words will come back to the University in some form, 'after many days'. They may not irrigate the ground immediately beside them, but the abundance of their springheads and the larger volume of their pent-up waters must go forward to feed and cleanse the cities of the earth or to move the vaster wheels of European literature, or to deepen the main sea of the world's knowledge."[১৬৫] রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে এই উদ্ধৃতির সাদৃশ্য আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শকে ঘিরে এই যে দীর্ঘ বিতর্ক— উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ইংলন্ডে যার এক দিকে ছিলেন জন হেনরি নিউম্যান, বেঞ্জামিন জাওয়েট ও টি.এইচ.গ্রিন এবং অপর পক্ষে ছিলেন, টি.এইচ.হাক্সলি, হেনরি হ্যালফোর্ড ভন এবং মার্ক প্যাটিসন, আর ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, যদুনাথ সরকার ও ভিন্ন প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— তার প্রাসঙ্গিকতা আজও ফুরিয়ে যায় নি। ইংলন্ডের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সম্বন্ধে বেন নাইটস (Ben Knights) বলেছেন : "Needless to say, these are ideal types, and few if any could hold either view unmixed with the other. Both in any case have in common the belief that the university needs justifying in terms of social value, however indirect."[১৬৬] যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধেও এ-কথা সমভাবে সত্য।

সূত্রনির্দেশ

১. 'চিঠিপত্র ১৫', বিশ্বভারতী, ১৯৯৫; পৃ. ২১।
২. 'চিঠিপত্র ১৫'তে উদ্ধৃত। পৃ. ১৬২।
৩. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী ৮', কলকাতা, ২০০১; পৃ. ১৭০।
৪. 'চিঠিপত্র ১৫'; পৃ. ২৮-২৯।
৫. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত' : রবীন্দ্রনাথ-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পত্রবিনিময়, সম্পাদনা : প্রশান্তকুমার পাল, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫; পৃ. ২৬।
৬. তদেব; পৃ. ২৭।
৭. দ্র. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ, ১৫ অক্টোবর, ১৯২৬; ২ জুলাই, ১৯২৭ ও ৭ অক্টোবর, ১৯২৮। 'চিঠিপত্র ১২', বিশ্বভারতী, ১৯৮৬।
৮. 'রবিজীবনী ৮'; পৃ. ২০৫।
৯. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ২১২।
১০. Visva-Bharati Samsad Proceedings, 1922-23; রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।

১১. তদেব।
১২. Visva-Bharati Varshika Parishat Proceedings, 1922; রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
১৩. Visva-Bharati Samsad Proceedings, 1922-23; রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
১৪. বিকাশ চক্রবর্তী, "ব্যাহত সখ্য : রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকার", 'কালপ্রতিমা', জুলাই, ২০০৭; পৃ. ৯১-১১৮।
১৫. তদেব; পৃ. ১০৭।
১৬. 'চিঠিপত্র ২', বিশ্বভারতী, ১৯৪২, পত্র ২৬; পৃ. ৭৫-৭৬।
১৭. 'রবিজীবনী ৭', কলকাতা, ১৯৯৭-এ উদ্ধৃত; পৃ. ৪১১।
১৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
১৯. দ্র. 'বিশ্বভারতী' ৫, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৭, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪; পৃ. ৩৪১-৪২৮। পরবর্তী উল্লেখে রর ও খন্ড সংখ্যা।
২০. 'দেশ', ৬ আগষ্ট, ১৯৭৭; পৃ. ১৭।
২১. 'শারদীয় বারোমাস', ২০০৭; পৃ. ২৪৩।
২২. Rathindranath Tagore, *Diary.* Rabindra-Bhavana Collection.
২৩. দ্র. Bikash Chakravarty, ed., *Poets to a Poet,* Visva-Bharati, 1998; pp. 67-68; 77-78.
২৪. *On the Edges of Time,* Visva-Bharati, 1981; pp. 113-14.
২৫. Mary Lago, ed., *Imperfect Encounter : Letters of William Rothenstein and Rabindranath Tagore, 1911-1941*, Cam. Mass : Harvard UP, 1972; p. 279.
২৬. fn. 2, Letter 142, *Ibid;* p. 280.
২৭. *Letters from Abroad,* Madras :'S. Ganesan 1924; p. 108.
২৮. 'রবিজীবনী ৮'-এ উদ্ধৃত; পৃ. ৯৪।
২৯. *Imperfect Encounter*; pp. 280-281.
৩০. Letter 144, *Ibid*; pp. 283-84.
৩১. Letter 145, *Ibid*; pp. 284-85.
৩২. দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', ৩য় খন্ড (১৩৫৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৬; পৃ. ১৫৮।
৩৩. Letter 148, *Op Cit*; p. 290.
৩৪. Letter 149, *Ibid*; p. 292.
৩৫. 'পুণ্যস্মৃতি' (১৩৪৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৭; পৃ. ১৮০।
৩৬. 'রবিজীবনী ৮'; পৃ. ১৩০।
৩৭. Tagore to Thomas Sturge Moore, 20 October, 1921, Photocopy. Rabindra-Bhavana Collection.
৩৮. 'আত্মস্মৃতি', কলকাতা : প্রমথনাথ পাবলিশিং সংস্করণ, ১৯৯৬; পৃ. ৪৮।
৩৯. 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'; পৃ. ৮৮।

৪০. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', চৈত্র, ১৩৭৬; পৃ. ২৮৪।
৪১. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' (১৩৬৯), বিশ্বভারতী, ১৪০৭; পৃ. ১০৬।
৪২. *Letters to a Friend,* New York : The Macmillan Co., 1929; p. 102.
৪৩. *The Ordeal of Love : C.F. Andrews and India,* Delhi:OUP, 1979; p. 186.
৪৪. Cited in *Ibid*; pp. 186-87.
৪৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১০৬-১০৭।
৪৬. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬; পৃ. ২৮৭-৮৮।
৪৭. 'রবিজীবনী ৮'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ৬৯।
৪৮. 'প্রবাসী', আষাঢ়, ১২৩৮; পৃ. ৪৩০।
৪৯. See, Sabyasachi Bhattacharya, ed., *The Mahatma and the Poet : Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941,* National Book Trust, 1999; pp. 63, 64.
৫০. *Ibid,* p. 65.
৫১. 'রবিজীবনী ৮'এ উদ্ধৃত। পৃ. ১১২।
৫২. 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'; পৃ. ১১১।
৫৩. দ্র. "শিক্ষার মিলন", রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খন্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮; পৃ. ৬৬৪-৭৮।
৫৪. দ্র. সুকুমার সেন সম্পাদিত 'সুলভ শরৎসমগ্র ২', কলকাতা, ১৯৯৫; পৃ. ১৯৬২-৬৯।
৫৫. দ্র. রর ২৪; পৃ. ৩২০-৪০।
৫৬. *The Mohatma and the Poet*; p. 44.
৫৭. 'আত্মজীবনী'; পৃ. ৪৭-৪৮।
৫৮. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৫; পৃ. ২৬৩।
৫৯. 'বিশ্বভারতী ৩', রর ২৭; পৃ. ৩৫৩।
৬০. 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩২৯; পৃ. ৭৬৩।
৬১. 'রবিজীবনী ৮'; পৃ. ২২০।
৬২. 'চিঠিপত্র ১২'; পৃ. ২৮৯-৯০।
৬৩. Tagore to Andrews, S. S. Rhyndam [undated], *Letters from Abroad*; p.100.
৬৪. Photocopy. Rabindra-Bhavana Collection.
৬৫. 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ১৪২।
৬৬. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ৬৫, ৬৮।
৬৭. তদেব; পৃ. ১২৯।
৬৮. "মার্ক্সের দিকে", 'টীকাটিপ্পনী', কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৮; পৃ. ১৯৮।
৬৯. 'শান্তিনিকেতন - বিশ্বভারতী'; পৃ. ৮৬।

৭০. 'রবিজীবনী ৭', পৃ. ৩৭৩।
৭১. দ্র. 'বিশ্বভারতী ১', রর ২৭; পৃ. ৩৪৬।
৭২. Rathindranath Tagore to Mayce Seymour, Letter 38, 'রবীন্দ্রবীক্ষা ৪৮', শ্রাবণ, ১৪১৫, পৃ. ৩৫।
৭৩. 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'; পৃ. ৯।
৭৪. 'পূণ্যস্মৃতি'; পৃ. ১৬৫।
৭৫. *The Centre of Indian Culture* (1919), Visva-Bharati, 2001; pp. 2; 21-22; 26; 34; 35.
৭৬. 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩২৬ পৃ: ১-৩। দ্রঃ 'বিশ্বভারতী ২', রর ২৭; পৃ. ৩৫০।
৭৭. রর ২৭; পৃ. ৩৫০।
৭৮. 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'; পৃ. ২৫-২৬।
৭৯. তদেব; পৃ. ২৭-২৮।
৮০. 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (১৩৫১), বিশ্বভারতী, ১৪১৫; পৃ. ১২৩-২৪।
৮১. তদেব; পৃ. ১২৫-২৭।
৮২. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১০০।
৮৩. তদেব; পৃ. ১০১।
৮৪. দ্র. ''বিদ্যাসমবায়'', রবীন্দ্র রচনাবলী ১১, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮; পৃ. ৬৬৩।
৮৫. প্রতিলিপি। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৮৬. 'রবিজীবনী ৭'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ৪৫৫।
৮৭. গ্রন্থপরিচয়, 'ইতিহাস' (১৩৬২), বিশ্বভারতী, ১৩৯৫; পৃ. ১৭০।
৮৮. 'রবীন্দ্রবীক্ষা ৪৮'; পৃ. ৪০।
৮৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৯০. 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'; পৃ. ৯০।
৯১. 'রবিজীবনী ৮'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ৮৫।
৯২. 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭২; পৃ. ১-২।
৯৩. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১০৬।
৯৪. Cited in Benarasidas Chaturvedi and Marjorie Sykes, *Charles Freer Andrews : A Narrative,* London : George Allen and Unwin, 1949; p. 161.
৯৫. Ashok Rudra, *Prasanta Chandra Mohalanobis : A Biography*, New Delhi : OUP, 1996; p. 79.
৯৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৯৭. 'রবিজীবনী ৮'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ১৬৩।
৯৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।

৯৯. দ্র. L.144, Tagore to Rothenstein, April 24, 1921. *Imperfect Encounter;* p. 284.
১০০. See, *Letters from Abroad*; p. 100
১০১. পত্র ৭, 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত'; পৃ. ২১১।
১০২. 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৮২; পৃ. ৬।
১০৩. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১০৮ - ১০৯।
১০৪. তদেব; পৃ. ১০৯।
১০৫. 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'; পৃ. ১৩২।
১০৬. ''বিশ্বভারতী'', 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' (১৩৮৮), কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২; পৃ. ৭০-৭১।
১০৭. 'শান্তিনিকেতন' পৌষ, ১৩২৯। দ্রঃ ''বিশ্বভারতী ৫'', রর ২৭; পৃ. ৩৫৯।
১০৮. দ্র. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১১৩।
১০৯. 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬১; পৃ. ৯।
১১০. 'রবিজীবনী ৯', কলকাতা : আনন্দ, ২০০৪; পৃ. ৩৮।
১১১. 'শারদীয় দেশ', ১৩৬০; পৃ. ৬।
১১২. তদেব; ৬-৭।
১১৩. তদেব; ৭।
১১৪. 'রবিজীবনী ৯'; পৃ. ৩৫।
১১৫. 'দেশ', ১২ আগস্ট, ১৯৭৮; ৫১-৫২।
১১৬. তদেব; ৫১-৫২।
১১৭. তদেব; ৫২।
১১৮. তদেব; ৫২।
১১৯. 'রবিজীবনী ৯'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ৮৭।
১২০. 'কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত', পত্র ১৩৭; পৃ. ১২৯।
১২১. 'রবিজীবনী ৯'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ৮৭।
১২২. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১২৫, পাদটীকা।
১২৩. দ্র. 'বিশ্বভারতী ১২', রর ২৭; পৃ. ৩৯২-৯৩।
১২৪. 'শারদীয় দেশ', ১৩৬০; পৃ. ৬।
১২৫. 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১১৬-১৭।
১২৬. 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন'; পৃ. ১৬০।
১২৭. দ্র. সুকুমার সেন, 'দিনের পরে দিন যে গেল', ১ম খন্ড (১৯৮২), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০; পৃ. ১২৪।
১২৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'; পৃ. ১১৬।
১২৯. দ্র. রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ, শান্তিনিকেতন, ২২ আগস্ট, ১৯২৫। 'চিঠিপত্র ১৫'; পৃ. ৩৬৩-৬৪।
১৩০. দ্র. সনৎকুমার বাগচী, ''রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী : একটি দলিল'', 'রবীন্দ্রনাথ ও

কয়েকজন রাজপুরুষ', কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৩৯৪; পৃ. ৯৫। অনুবাদ লেখকের।

১৩১. তদেব। পৃ. ৯৭।

১৩২. পরিশিষ্ট ৫, তদেব; পৃ. ১১৭-১১৮।

১৩৩. 'রবিজীবনী ৯'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ২৬৮।

১৩৪. 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'; পৃ. ৪১৪, পাদটীকা ২।

১৩৫. 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮; পৃ. ১৭৪। 'রবীন্দ্রজীবনী ৩'-এ উদ্ধৃত। পৃ. ৫২১।

১৩৬. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল চিঠি; পৃ. ৩। একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, যদুনাথের আলোচ্য পত্র থেকে পরবর্তী সমস্ত উদ্ধৃতি রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির পাঠ থেকে গৃহীত এবং উদ্ধৃতির সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে পাণ্ডুলিপি-ধৃত পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হবে।

১৩৭. পত্র ২, চারুচন্দ্র দত্তকে রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬। দ্র. অভীক কুমার দে, "রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র দত্ত: কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে", 'চতুরঙ্গ', কার্তিক - চৈত্র, ১৪১৪; পৃ. ১৪-১৫।

১৩৮. 'প্রবাসী', চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত পাঠ। (এই উদ্ধৃতির উন-শেষ বাক্যটি পাণ্ডুলিপিতে নেই।) পৃ. ৪৮৫।

১৩৯. দ্র. *The Modern Review,* January, 1918; pp. 2-7 and December, 1915; p. 663.

১৪০. যদুনাথকে রবীন্দ্রনাথ, ২ জুন, ১৯২২; 'চিঠিপত্র ১৫'; পৃ. ২৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯২০-২২-এ, যদুনাথ ছাড়াও বেঙ্গল স্কুলের তীব্র সমালোচনা করতেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও রিয়ালিজম ঘরানার প্রখ্যাত চিত্রকর, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। হেমেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "কিছুকাল ধরিয়া বাংলাদেশের একশ্রেণীর শিল্পীদের প্রতিভা চিত্রাঙ্কন ছাড়িয়া নিজ অধিকার স্থাপনের চেষ্টাতেই অত্যধিক ব্যয়িত হইতেছে। ইহা একপ্রকার ব্যাধিই— ইঁহাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে শুধু ঐ পদ্ধতি প্রসূত আলেখ্যগুলিই আদর্শ 'ভারতীয় কলা'। ... তাঁহারা চিত্রবিদ্যার প্রকৃত চর্চা কখনো করেন নাই, সুতরাং উন্নত প্রণালীর চিত্র নির্মাণ ইঁহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাল-লয়হীন সংগীতের ন্যায় এই সব চিত্রের কোন পর্যায় নাই, আদর্শ নাই, বিচারের মাপকাঠিও নাই... যেহেতু ইঁহারা প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না বা রাখিবার শক্তি নাই। ... বালক ধ্রুব অঙ্কনে হাতখানা হয়ত বৃদ্ধের মত হইল, তাহাতে আপত্তি নাই— ভাব থাকিলেই চলে। শিল্পীর অঙ্কন নৈপুণ্যে বনমালী শেষে রক্ষাকালীতে পর্যবসিত হইলেন তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। ... কিন্তু এই 'ভাব'টি কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করিলেই বিপদ। তখন অহঙ্কারের ঝোলা হইতে একটি বাক্য মিলিবে— এ অর্থ এত সহজ নয়, এর জন্য পৃথক চক্ষু চাই।" দ্র. গৌতম সেনগুপ্ত, "শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আগে ও পরে", 'সন্ধিৎসা', ২৪ নভেম্বর, ২০০৮; পৃ. ৬০-এ উদ্ধৃত।

১৪১. দ্র. *Selected Chapters of the Report of the Calcutta University Commission,* Part II, Vol. IV, Chapter III, Calcutta : Superintendent Governement Printing Press, 1919; pp. 116-17.

১৪২. *Ibid*; p. 155.

১৪৩. *Ibid*; p. 52.

১৪৪. "An Educational Programme for Bengal", *The Modern Review*, July, 1922; p. 71.

১৪৫. "Present Condition of the Calcutta University", *The Modern Review*, April,, 1922; p. 462.

১৪৬. *Ibid*; p. 464.

১৪৭. দ্র. "ইতিহাস চর্চার প্রণালী" [বর্ধমান সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ], 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩২২; পৃ. ২৫-৩০। "গবেষণার প্রণালী" [শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘে সভাপতির অভিভাষণ], 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩৫২; পৃ. ৩৫৪। "বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা" [বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষদ্ কর্তৃক অর্ঘ্যদান উপলক্ষে আচার্যের অভিভাষণ], 'প্রবাসী', পৌষ, ১৩৫৭; পৃ. ২৬০-৬২। "Progress of Historical Research in India," *The Modern Review,* January 1951; pp. 35-36. "Word to Research Workers in Indian History", *Bengal Past and Present,* vol. 76, 1957; pp. 1-5 ইত্যাদি।

১৪৮. "স্যার যদুনাথের সান্নিধ্যে, গ্রন্থাগারে", 'শারদীয় বারোমাস', ২০০৬; পৃ. ৫৬-৬৩।

১৪৯. দ্র. শ্রী যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী। 'যদুনাথ সরকার', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৮৯; পৃ. ২২-এ উদ্ধৃত। See, *Presidency College Centenary Volume,* Calcutta, 1955; p. 324.

১৫০. "An Old Man's Hope", *The Modern Review,* August, 1951; p. 142.

১৫১. *Principles of Political Economy* (1848), Bk V, XI, para, 15.

১৫২. T. H. Huxley, *Collected Works* [9 vols. 1894], vol. 111; p. 239.

১৫৩. দ্র. টীকা ৭৮।

১৫৪. দ্র. টীকা ১১৭-১৮।

১৫৫. J.P.C. Roach, "Victorian Universities and the National Intelligentsia", *Victorian Studies,* December, 1959; pp. 147-48.

১৫৬. এই কমিশনের প্রতিবেদন, *Report of Her Majesty's Commissioners appointed to enquire into the State, Discipline, Studies, and Revenues of the University and Colleges of Oxford; together with the Evidence, and an Appendix* নামে ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়। কমিশনটি Oxford Commission, 1850 নামে সমধিক পরিচিত।

১৫৭. দ্র. Ben Knights, "The Idea of a University", *The idea of the Clerisy in the Nineteenth Centruy,* London : Cambridge Univ. P. 1978; p. 187.

১৫৮. 'Preface' *The Idea of a University Defined and Illustrated,* ed. I. T. Ker, Oxford, 1976; p. 5. ডাবলিনে প্রস্তাবিত ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত প্রথম পাঁচটি (May-June 1852) বক্তৃতার সংকলন।

১৫৯. দ্র. John Sparrow, *Mark Pattison and the Idea of a University*, Cambridge : Cambridge UP. 1967.

১৬০. Cited in Geoffrey Faber, *Jowett : A Portrait with Background*, London, 1957; p. 197.

১৬১. *Hansard's Parliamentary Debates*, 3rd series, CXXXIV, 22 June, 1854; p. 518. Cited in Lawrence Goldman, "Oxford and the Idea of a University in nineteenth century Britain", *Oxford Review of Education*, December, 2004; p. 586.

১৬২. Cited in Colin Matthew, "Gladstone and the University of Oxford", *Oxford Magazine*, 2nd Week, Michaelmas Term, 1999; p. 4.

১৬৩. 'Evidence', *Oxford University Commission*, 1852; p. 45.

১৬৪. *Suggestions on Academical Organisation*, Edinburgh, 1868; pp. 325-261.

১৬৫. Cited in Ben Knights, *The Idea of the Clerisy;* pp. 201-202.

১৬৬. "The Idea of a University", *ibid*; p. 188.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা যদুনাথ সরকারের চিঠি

Sarkar-abas,
Darjiling, 31 May 1922

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমি মে ও জুন মাসের জন্য এখানে আসিয়াছি — সুতরাং আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠের রেজিষ্টারি পত্র কটক ঘুরিয়া এখানে পৌঁছিতে দেরি হইল। বিশ্বভারতীর গবর্নিং বডির সদস্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও দুইটি গুরুতর কারণে ঐ পদ অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, তজ্জন্য মার্জনা করিবেন।

প্রথমতঃ, আমি এতদূরে থাকি, এবং আর কয়েক বৎসর পরে পেন্সন লইয়া নিম্নবঙ্গে বাস না করিবার ইচ্ছা। সুতরাং শান্তিনিকেতনের কার্যের তত্ত্বাবধান করা, নূতন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব। বৎসরে একবার মাত্র বার্ষিক অধিবেশনে দেখা দিলে কর্তব্য পালন হইবে না। যেখানে কাজ করিতে পারিব না, সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা আমি নিজের পক্ষে লজ্জাকর ব্যবহার এবং ঐ সংস্থানের প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করি। এই যেমন, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলে বাহিরের ও দূরের সদস্য এত অধিক যে ৩০ জন সদস্যের মধ্যে বসিলে অধিবেশনে ৭ জন জোটে না, অধিবেশন পণ্ড হয়।

এলাহাবাদের উকীলগণ না আসিলে কোরম্ হয় না। যেখানে স্থানীয় পণ্ডিত ও কার্য্যদক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নাই, সেখানে স্বাধীন আত্মনির্ভর ইউনিভার্সিটি হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি তাহা স্কুলমাত্র ছিল। এখানে ছাত্রদের চরিত্র দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুষ্ঠুরূপে গঠিত হইয়া, পরে তাহারা মামুলী কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্কটা সংসারের উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত। অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার অভাব বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে বোলপুরের কাজটা যে কাঁচা হইতেছে তাহা আপনিই আমাকে বলিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতিবৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই — (১) প্রতি বিভাগে সর্ব্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং গবেষণাগারে কাজ করিবার উপযোগী শিক্ষা, intellectual discipline and exact Knowledge, পূর্ব্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্র-মণ্ডলী, এবং (৩) শিক্ষায় পরিপক্ক চরিত্রবান একনিষ্ঠ নেতা একজন। এই তিনটি থাকিলে

টাকা বা জিনিষের অভাব বাধা হয় না, এবং এ-অভাব ও বেশী দিন থাকে না।

আমাদের মামুলী কলেজের I.A. ও B.A. শ্রেণী চারিটি প্রকৃতপক্ষে বিলাতের ভাল সেকেণ্ডারী স্কুলের কাজ করে; আর এদেশে প্রকৃত কলেজের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এম্‌ এ ক্লাস হইতে আরম্ভ হয়। ঐ I.A. ও B.A. ক্লাসে ৪ বৎসর খাটিয়া তবে আমাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার ও নিজে কাজ করিবার উপযুক্ত হয়। বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাই স্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ পণ্ডিত ও মনীষি সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে ৩য় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ) ও বেশ কার্য্যকর হইবে — যদি ছাত্র আসে। কিন্তু ২য় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের ৪টি শ্রেণী) ওখানে একে বারে নাই। যে ছাত্র আগাগোড়া বোলপুরে শিক্ষিত হইয়াছে সে কিরূপে রিসার্চ-অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে, তাঁহার নির্দেশমত কাজ করিতে পারিবে, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি, অর্থাৎ উচ্চ general Knowledge এবং ২ বা ৩ বিষয়ের সুষ্ঠু শৃঙ্খলায়,

পাই— তাহাদের ছাপে নাই। তাহাদের মধ্য ভাগটা কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, যে এম্.এ.র ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায় তাহার পক্ষে পূর্ব্বেই B.A. তে Economics ও Political Science এবং একটা ভাষা রিসার্চ-বর্জ্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্যক। ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত জানিলে চলিবে না, গ্রীসীয় ইতিহাস, মিসর ব্যাবিলনের ইতিহাস, Political Philosophy তে আগে B.A. পাশ করা আবশ্যক, নচেৎ মনটা সংকীর্ণ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ exact Knowledge, পরের অর্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া, তাহার পরে এবং উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌঁছিতে পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (grind বলিতে পারেন) মামুলী কলেজে হয়, বোলপুরে হয় না।

তাহার উপর, বোলপুরের ছাত্রগণ exact Knowledge কে, intellectual discipline কে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্কমস্তিষ্ক, "বিশ্বমানবের" শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে। তাহারা শুধু ভাবের (emotion)

দিকে, synthesis of Knowledge এর দিকে তাকায়। কিন্তু এই synthesis এর অত্যাবশ্যক ভিত্তি যে exact Knowledge তাহা শেখে না, বরং শেখা অনুচিত, কুশিক্ষা, বলিয়া মনে করে। এই যেমন আকাশে এরোপ্লেন উড়িতেছে দেখিয়া আমাদের মনে হয় "আহা! কি সুন্দর, এইরূপ উড়াই মানবমস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ কাজ ও সুখ।" কিন্তু কত শ্রমের কত শুষ্ক তপস্যার কত exact Knowledge এর ফলে এরোপ্লেনের সৃষ্টি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাবি না। ইহার আবিষ্কারের পূর্ব্বে অসংখ্য পতঙ্গ ও পক্ষীর দেহ ছুরী ও অণুবীক্ষণ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া পক্ষ ও দেহের আনুপাতিক ওজন এবং আয়তন, পক্ষের ভিতর দিয়া শক্তিবাহক রগের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শুষ্ক exact Knowledge এর পুঁজী সংগ্রহ করা, পরীক্ষার পর পরীক্ষা প্রাণত্যাগের পর প্রাণত্যাগ, আবশ্যক হইয়াছিল। এরোপ্লেন আনন্দে সৃষ্ট হয় নাই।

তেমনি আচার্য্য বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব উদ্ভিদ ও জড়পদার্থ সকলেরই প্রাণ ও মৃত্যু উত্তেজনা ও ক্লান্তি আছে। আমরা অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠি "বাঃ ইহাই ভারতের নিজস্ব মানসিক সম্পদ!

আমাদের উপনিষদ যুগের পিতামহগণ ইতে
বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণিগণ প্রাণ
আছে।" আমরা বুঝিনা যে প্রাচীন ঋষিরা
ভাবের উন্মেষে ঐ কথা বলেন, কিন্তু আধুনিক
বসু প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, জীবন শুদ্ধ; তিনি
exact Knowledge এর সাহায্যে, বিজ্ঞানাগারে
পদে পদে পরীক্ষা করিয়া, সেই পরীক্ষার ফল
লক্ষ্য করিয়া, একইরূপে কোটি ভাবে বিভক্ত
করিয়া, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।
অবিশ্বাসীর হাত দিয়া সেই পরীক্ষা করাইয়া
তাহাকে নিজমতে দীক্ষিত করিতে পারেন।

তেমনি পালী ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থ-
গুলির বিশুদ্ধ সংস্করণের পশ্চাতে কি অগাধ শুদ্ধ
পরিশ্রম রহিয়াছে! এই সব সংস্করণের সম্পাদক
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতগণ গণিয়া ঠিক করিয়াছেন যে লক্ষিত
বিস্তারে দ্বিতীয়ার এক বচন কোথায় এবং কত বার
ব্যবহৃত হইয়াছে, বৃহদ্দেবতায় দেবগণের উপাধি
ও গুণগুলির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। আর
আমরা আর্য্যসন্তান এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ হাতে
করিয়া আত্মম্ভরিতার সহিত 'উপর চালাকি'
করিতেছি, ভাবগদগদ হইয়া general remarks
ঝাড়িতেছি, আর লিউম্যান ও ম্যাকডোনেলের
শুষ্ক শ্রমের প্রতি exact Knowledge এর প্রতি
ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি।

আমি এখনও মানিতে প্রস্তুত নই যে
বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব
যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের শেষ্য তস্যভাষ্য,
নব্য ন্যায়ের কচকচি, কাঁথা সেলাইএর প্যাটার্ন,
এবং আলিপনার নক্সা, অথবা মুঘলচিত্রের
সাতনকলের খাস্তা নকল। ভারতবর্ষ যে বিংশ
শতাব্দীতে ও জগৎকে exact Knowledge দিতে
পারে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের scientific history
রচনা করিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি (re-
chauffé) বা অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া 'জগৎ-
সভার মাঝে' গ্রহণীয় নূতন জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি
করিতে পারে, — এ বিশ্বাসটা জীবনের শেষ
পর্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহি না।

বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে।
সেখানে যে বায়ু সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এই
scientific method এবং exact Knowledge
এর বিরোধী। যেমন বৈষ্ণবেরা ভক্তিবিগলিত
অশ্রু হইয়া সব জিনিষই অস্পষ্ট দেখে, তেমনি
বোলপুরের ছাত্রগণ শেখে ভাবের (emotion)
বাষ্পের আবরণ দিয়া জগতের দিকে তাকাইতে,
প্রথম হইতেই "বসুধৈব কুটুম্বকং" বলিয়া
তাহারা অনুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দূর-
বীক্ষণ ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে
অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কোনটাকেই ছাড়িলে

পূর্ণতা লাভ করা যায় না।

আপনি দেখিতেছেন আমি কি প্রকার দুরারোগ্য ফিলিষ্টাইন। তাই হইতেছে। আমি পেশাদার গুরুমহাশয় (মস্তিষ্কের, হৃদয়ের নহে); পণ্ডিত তৈয়ার করিবার চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদের আবির্ভাব বা নূতন প্রণালীর কথা শুনি সেখানেই দেখিতে যাই। পুরাতন ন্যাশনাল কলেজ দুবার, বোলপুর ৩ বার, গুরুকুল একবার পর্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্বাঙ্গীন গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনি যখন পদ্যে, ধর্মব্যাখ্যানে, বা গদ্যে বেদান্তের নির্যাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আমি তাহা পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লই, কারণ আপনার যুক্তি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট, ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়; আর আমি জানি যে আপনি নিজজীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু যখন বোলপুরের দশবারো বছরের ছেলে — আঠার বিশ ই হউক না কেন — "বিশ্বমানব" "অব্যক্ত মর্মবেদনা" প্রভৃতি কথা

আওড়াইতে থাকে তখন ঝুঁটি মাছের মুখে শিস মাছের গলার আওয়াজের মত এগুলি অসঙ্গত শুনায়। আমাদের মামুলী কলেজে পাশকরা ছেলেরা যে রাজনৈতিক মঞ্চে নৃত্য করিতে করিতে 'ডেমক্রেসি' 'কনষ্টিটুশন' 'সেল্ফ ডিটারমিনেশন' প্রভৃতি বুলী আওড়ায় তাহাও ঠিক এইরূপ মূল্যের জিনিষ।

কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। মামুলী কলেজে আমরা পেশাদার গুরুমহাশয়েরা ছাত্রের হৃদয়টার দিকে তাকাই না, শুধু মস্তিষ্কটায় শানাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই প্রভাবশালী বাহিরের গুরুমহাশয় — সংসার হউক, শাসনার কার্য হউক, প্রকৃতির দৃশ্য হউক, — পরে পূরণ করিয়া দেয়, কারণ হৃদয়টা শূন্য থাকিতে পারে না — যেমন Palace of Art এ টেনিসন সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন। বোলপুরের ছাত্রেরা যে আমাদের ছেলেদের মত প্রাণপণে মস্তিষ্ক শানায় না, exact Knowledge, বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellectual discipline শেখে না, [illegible] মনে করে, — [illegible] বাহির হইতে [illegible] পারেন; একমাত্র

তরুণ বয়স এবং কলেজের শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাই এই অভ্যাস এই মনের ঝোঁক দিতে পারে। বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে পরে ইহা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রগণ রিসার্চ ক্লাসে উঠিয়া মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে (ভাসা ভাসা synthesis বাদে) কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না, অন্ততঃ তাহাদের শ্রমফল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য হইবে না। শুধু সংস্কৃত পড়িয়া যাঁহারা পণ্ডিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপীয় দর্শন অভ্যাস করিয়া তাহার সঙ্গে বা পরে সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়াছেন, — এই দুই শ্রেণীর মনের দৌড় ও ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ শেষোক্ত পণ্ডিতেরাই প্রকৃত মূল্যবান গবেষণা করিতে পারেন।

আর একটি উপমা দিলেই আমার মনের ভাব পরিষ্কার হইবে, — এবং আমি যে কি ভীষণ ফিলিষ্টাইন সে সম্বন্ধে পূর্ব্বশ্লেষবশতঃ আপনার যদি দু একটা সন্দেহ থাকে তবে তাহাও লোপ পাইবে। "ইণ্ডিয়ান আর্ট ভারতের নিজস্ব জিনিষ, ইহা জগৎ সভার হাতে ভারতের অমূল্য অনন্য-অপ্রাপ্য দান" বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি। আমরা

বলিবে রবিবর্ম্মার ছবিতে ভাব নাই, তাহা Nature এর দাসোপযোগী নকল। এই মত প্রচারের ফলে, অবনীবাবু ও নন্দলাল ভিন্ন আর সব নব্য ইণ্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা কাজটা ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নাই, শরীর-বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে নানা পরীক্ষা (studies বা sketches) করিয়া চিত্রের উপযোগী ঠিক অঙ্গভঙ্গী আবিষ্কার করা নাই; এক লাফে ভাবের ছবি আঁকিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এসব ছবির মধ্যে যাহা ভাল তাহাকে অজন্তার বা মুঘল চিত্রের নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না। অপর গুলির সব কাঁচা ও খারাপ, ঠিক শিশুর আঁকা বা Cavemen এর আঁকা ছবির মত, শুধু রংগুলি তার চেয়ে ভাল। কিপলিং এর একটা গল্পে আছে যে একজন বিলাতী ভদ্রলোক এদেশে এসে প্রথম এক্কা দেখে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠেন "Oh, How thruly Oriental!" ইণ্ডিয়ান আর্টের চরম আকাঙ্ক্ষা এই কি যে সাহেবেরা বলিবে How truly oriental! অর্থাৎ বিশ্ব-

জগতের সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে না, কালা আদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন standard আছে তাহা দিয়া ইহার বিচার করা হইবে? কই রুইজডেল বা কুইপ এর landscape দেখিয়া কেহ ত বলেন না Oh! How truly Dutch? টার্নার দেখিয়া কেহত বলেন না Oh! How truly English?

রবি বর্ম্মাতে ভাব নাই সত্য, কিন্তু রবি বর্ম্মাই কি ইউরোপীয় চিত্র পদ্ধতির দৃষ্টান্ত? র‍্যাফেল, লীটন, টার্নার এত কেহ ভাবের অভাব, দাসোচিত অনুকরণ দেখেন নাই; অথচ তাঁহাদের কীর্ত্তির পশ্চাতে কত anatomy, observation of Nature, "studies" (অর্থাৎ মসোড়া) আছে, তবে তাঁহাদের হাত ঠিক হইয়াছে। Sir Frederick Leighton তাঁহার Flaming June নামক চিত্রের রমণীর মাথার নীচে দেওয়া হাতের ভঙ্গির জন্য ১৬/১৭টা sketch করেন, পরে তাহার একটি বাছিয়া লন ও ছবিতে বসান। সেইমত র‍্যাফেলের স্কেচ (Cartoons) আছে।

অথচ আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্টের এক

হইতে নবীনতম শাগরেদ পর্য্যন্ত "Art is not photography", "The imitation of Nature is a slavish practice unworthy of a true artist", "Expression is higher than fidelity to life" এই সব বুলী আওড়ায় এবং ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতিকে জঘন্য* গালাগালি দেয়। ইহার ফলে ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষানবীশের হাত ঠিক করিতে যে পরিশ্রম যে প্রকৃতির অনুসরণ আবশ্যক তাহা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহঙ্কারে ত্যাগ করিয়া একেবারে ভাব-প্রকাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন — ফল, প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি। সেইমত বোলহুবের হাবেরা exact Knowledge কে হেয় করিয়া এক লাফে synthesis এবং ভাবপ্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিতেছে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান আর্ট এবং সিন্থেসিস্-বাদ এ দুটাই plea for laziness হইয়াছে। মামুলী কলেজের ছাত্রগণ অলস হইলে, ঢিলে কাজ করিলে লজ্জা বোধ করে, আর ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ

---

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় এতি লক্ষ্য করিয়া "Times Lit. Suppl." এই মত লিখিয়াছেন।

এরূপ করা গৌরবের বিষয়, মানসিক স্বাধীনতার চিহ্ন বলিয়া গর্ব্ব করে। ইহার প্রকৃত ফল জগৎসভা কতদিন গ্রহণ করিবেন দেখা যাউক।

আমি যে কেন ফিলিষ্টাইন হইয়াছি *তাহা বলিতেছি। যদি বোলপুরের ছাত্রগণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি বা চিত্রকর হইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান হইতাম না। কিন্তু দেড়শত বৎসর ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে বঙ্গমাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন; আর দুই শত বৎসরেও তাঁহার দ্বিতীয় আসিবেন না, আমার বিশ্বাস। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রদিগকে এই আমাদের কলেজের ছাত্রদের মত সাধারণ সাংসারিক লোক বলিয়া বিচার করিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে। তাহারা অলস parasite class বা intellectual aristocracy হইবার ন্যায্য দাবী করিতে পারে না। The winds of genius blow where they list. মামুলী কলেজ

তাঁহাদের সৃষ্টি করিতে পারে না, বোলপুরও পারিবে না। তবে সেই প্রচ্ছন্নজ্যোতি ক্ষণজন্মা কবি বা শিল্পী মামুলী কলেজে নাম লিখাইলে আমরা তাঁহাকে steam roller এর চাপে পিষিয়া ফেলি, বোলপুরে তাহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ঐ ক্ষণজন্মা পুরুষ নয় তাহাদের জন্য বোলপুর কি করিবে?

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না এজন্য যে কত কষ্ট পাইতেছি তাহা আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মী-সমাজে এই বিশ্বভারতীর সহিত আপনার খ্যাতি জড়িত থাকিবে। আমি ২৭ বৎসর কলেজে পড়াইয়াছি এবং শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের অবস্থা (মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়িয়া দিন) প্রভৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি। এখন যদি আপনাকে প্রস্তাবিত পন্থার বিপদ না বলিয়া দিই তবে আপনাকে প্রতারিত করিব।

যদি ইচ্ছা করেন এবং অন্য বন্দোবস্তের মধ্যে এরূপ দূরের জায়গা হইতে পারে তবে বড়দিনের সময় ৩।৪ টা বক্তৃতা বা ইতিহাসের রিসার্চ স্টুডেন্ট দিগকে উপদেশ দিবার জন্য বোলপুরে যাইতে পারি। গ্রীষ্মে ও পূজায় আপনাদের ও আমাদের এক সময়েই ছুটী থাকে। এবার কি এ অঞ্চলে আসিবেন না?

বিনীত

শ্রী যদুনাথ সরকার

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে কোনো কারণে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সে জন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়াছি এবং সেই জন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সভাপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম।

আমার কাজের বিরুদ্ধে আমার দেশের লোকের একটা প্রতিকূল মনোভাব আছে, ইহা আমার পক্ষে বিষম বাধা। কিন্তু আপনার মধ্যে সেই বিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে, আমার চিঠির মর্ম এখনো স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। বিশেষতঃ আপনি অনেকবার এখানে আসিয়াছেন, সকল প্রকার অভাব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এখানকার প্রতি স্নিগ্ধভাব রক্ষা করিয়াছেন; আপনি যে এখানকার আবহাওয়া বা কার্যপ্রণালীকে বিজাতীয় বলিয়া মনে করেন এমন আভাস তখন আপনার নিকট হইতে এক বারও পাই নাই।

আপনি বলিয়াছেন, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge কে ঘৃণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ জ্ঞানের শিক্ষক ও সাধকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্ক মস্তিষ্ক, "বিশ্বমানবের" শত্রু বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয়। এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমার

এই বিদ্যালয় কেবল বিফল তাহা নহে ইহার ফল বিষময়। এ কথার আপনি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

এতকাল পর্যন্ত এখানে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। এখানে বেশির ভাগ কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প কিছু বিজ্ঞান। যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্তি হইয়াছে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেশে ত হাইস্কুল যথেষ্ট আছে তাহার উপর আর একটা বোঝার গুরুত্বের প্রয়োজন কি ছিল। তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য এই যে এ দেশে হাইস্কুলে ছাত্রেরা যেটুকু শেখে এখানকার ছাত্রেরা অন্তত সেইটুকুই শিখিত। আপনি কি কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্কুলপাঠ্য শিক্ষার মধ্যেই accurate knowledgeকে উপহাস করিতে দীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটা মত দাঁড়াইয়া গেছে যে, প্রমাণসঙ্গত প্রণালীতে যে মনস্বীরা ভাবের চিন্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা "বিশ্বমানবের" শত্রু?

এ কথা আপনার জানা আছে যে, যথোচিত পদ্ধতিতে আমি নিজে শিক্ষা লাভ করি নাই। মনে করিতে পারেন সেই অভিমান-বশতই জ্ঞানান্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি অশ্রদ্ধা করি এবং সেই অশ্রদ্ধা আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন তবে আমাকে আপনি জানেন না ইহার বেশি আর কিছু বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে লজ্জা হইলেও, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, সত্যের

তবে তাহা আমার পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের চতুর্দিকে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে কৃষি বিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কখনো আপনি দেখিতে আসেন তবে দেখিতে পাইবেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমনি কার্যোপযোগী, তাহার পরীক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালী তদুপযোগিক। গ্রামপল্লীর দেশের রোগ ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য উপযোগী একটা শিক্ষাবিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীঘ্রই ছোট আকারে তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে দুজনে ... সমবায়ের কাজ, টাকাকড়ি সংগ্রহ করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে বিজ্ঞানবর্জিত বলা হয় বলিয়া এখানকার কেহই মনে করে না। কিন্তু আপনারা কি বলেন যে, ভাবুকতার কোনো স্পর্শ না লাগিয়া কেবল বিজ্ঞান ও এই প্রকার কাজ শিখাইলেই exact knowledge-এর সাহায্যে ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে?

আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে "দুর্বলচিত্ত ... বোরের নূতন তত্ত্ব ভাব/ভাষা, নব্যপন্থীর ..., কোয়ান্টাম থিয়োরী এবং আইনস্টাইনের নক্ষত্র" উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি বোধ হয় মনে করেন যে কি কেবল এই সকল বিষয়েরই উপাসনী? বোরের নূতন তত্ত্ব ও সংখ্যাকে বিদ্রূপ করিতে পারি এতটুকু অজ্ঞতাও আমার নাই। কিন্তু কোয়ান্টাম থিয়োরী ও আইনস্টাইনের নক্ষত্র সম্বন্ধে যুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বই ও প্রবন্ধের মধ্যে আমার আলাপ হইয়াছে — দেখিয়াছি সকল প্রকার ভাব ও ভাবপ্রবণতার প্রতি তাঁহাদের মানসিক বায়ু পরিশুদ্ধ বলিয়াই এগুলিকে তাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন, আমার ইচ্ছা যে, আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিশুদ্ধ হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে আকস্মিকের বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে এবং সেই সঙ্গেই মানব-সার্বভৌম বিজ্ঞানের যে স্থান আছে তাহাকেও সকলে সম্মান করিতে শেখে।

আপনার চিঠির ভাষা হইতে বুঝিলাম "বিশ্বমানব" "বসুধৈব কুটুম্বকম্" প্রভৃতি ভাষা ও ভাবের প্রতি আপনি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। অসংযত ভাবে এই সকল শব্দের অতিব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। আমার দ্বারা হয়ত তাহা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু আমার বর্তমান ও পূর্বতন ছাত্রদের মধ্যে আমি একজনকেও জানি না যে ব্যক্তি বিশ্বমানব বা বসুধৈব কুটুম্বকং লইয়া প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা বা বক্তৃতায় কোনো আলোচনা করিয়াছে। আমি কেবল একটিমাত্র ছাত্রকে

সেইজন্যই দিনে আমি জানিবেন যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয়সম্বন্ধে প্রমাণ-সাপেক্ষ অনুসন্ধানপ্রণালীর প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা আছে; আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, এমন কি, হাল আমলের শিক্ষিত সমাজেরও মধ্যেও প্রামাণিক পদ্ধতির চর্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি। আপনার প্রতি দিনদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তিগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা জাত্যভিমানের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্যানুসন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। আমাদের দেশের অনেকে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য তাঁহাদের সাধনা এরূপ বিশুদ্ধ নহে। আপনার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই এখানকার কাজে আপনার সহায়তা পাইবার জন্য এমন আগ্রহের সহিত [illegible] ইচ্ছা করিয়াছি। আপনাকে যদি "বিশ্বাসবাদের" পক্ষে বলিয়া মনে করিতাম তবে আপনার সহযোগ এমন করিয়া কামনা করিতাম না।

আচার্যমহাশয় অনুসন্ধানবদ্ধ, ঐতিহাসিকে দেশের যে-একদল লোক প্রাচীন ঋষিদিগের বাণী মধ্যে গুপ্ত আছে বলিয়া কল্পনা করেন আপনার পত্রে আপনি তাঁহাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আপনার মত, আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি না। পুরাকালের পণ্ডিতেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুরাতন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীকে যাঁহারা অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করেন আপনি তাঁহাদের কথাও লিখিয়াছেন। আমি যে সে দলের নহি আপনি যদি তাহার প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা আলোচনা করিবেন, আমি তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া, প্রামাণিক প্রণালী অনুসারে শাস্ত্র আলোচনা উদ্ধার করিবার জন্য, যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি, এখানকার লাইব্রেরিতে তাহার প্রমাণ আছে।

আমার এখানে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ বৈজ্ঞানিক সহানুভূতি স্ফুর্ত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোন কোন বন্ধুমহলে প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি — কিন্তু তাঁহারা এখানকার কাজ [illegible] হইতে দেখেন নাই এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কারবশত তাঁহাদের দৃষ্টি নির্মল নহে, কিন্তু আপনার মতো এইরূপ প্রতিকূলতা যদি এমন প্রবল আবেগে উগ্র হইয়া উঠে তাহা সত্যপর হয়

জানি তাহার সব ভারতীয়দিগের অভিপ্রেত। কিন্তু দরবারদিগের বৈচিত্র্যসাধনে প্রবৃত্তি দেবীর দিকে কি কোন হাত নাই, আমাদের আশ্রমের শান্তিনিকেতনের মধ্যে অপ্রতিভাতেই কি সব তৈরি হইয়া উঠে? এখানকার একটি ছাত্র চুরি করিয়াছে সেজন্য কি এখানকারই দায় বেশী? বৈজ্ঞানিক যুক্তে কোনো বিচার করিতে চাই না?

আমার যুক্তিগুলি প্রত্যেকটাই হয়ত আপনি খণ্ডন দিতে চান। সে সম্বন্ধে আমার দুটি মাত্র কথা বলিবার আছে। আমার জীবনে ও আমি ভারতবর্ষের যাহা চর্চা করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কি ভাবাকুল হইয়া কেবলি রসবিলাসে দিন কাটাইলাম? আমি কি কাজের জন্য কোন উদ্যোগ কোন ত্যাগ কোন সাধন করি নাই। সেই সাধনায় কি কাঠিন্য নাই? চিন্তাকে কাজে প্রকাশ করাতেই কি কোন কর্ম নাই। যথাযথের প্রয়োজন, কাজে প্রকাশ করিতে কি বৈচিত্র্য ত্যাগ ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না? অতএব আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে কেবল ভাবাবেগে গড়িয়া আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে আমি সর্বদাই এবং দেশের লোকের প্রতি ও সংস্কারের অভাবের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া একটি বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলাম সেই সত্যটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, আর সেই কঠিন সাধনার কোন প্রভাবই তাহাদের উপর কাজ করিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের অবকাশ কি কেবল ভাবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল আকাশেই সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে সহিষ্ণুতা নাই, চিন্তা নাই, পরীক্ষা নাই, দুঃখ নাই? এখানকার ছাত্রেরা কি শিখিতে পায় না?

দ্বিতীয় কথা, আমার শিক্ষা, আমার মত এবং চরিত্র যাহা করিতে পারে তাহা বেশি কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার সাধ্যমত অসম্পূর্ণতা [illegible] বলিয়াই আপনাদের মত লোকের সহায়তাকে চাহিয়াছিলাম। যদি পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনাপ্রণালী স্বীকার করিয়া লইতাম। এখানে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা আমার পুতুলের মত চলেন না — তাঁহারা নিজেরা পরামর্শ করিয়া কাজ করেন। আমার বিবেকবুদ্ধি সম্বন্ধে যদি আমার অভিমান থাকিত তবে আমি নিজেই সর্বময় হইতাম। এখানকার সব একমাত্র আমার ভাবাবেশের দ্বারা কলুষিত হইয়া সত্যপর নহে, কারণ আপনি যদি সন্ধান করিতেন তবে জানিতেন আমার ভাবের সঙ্গে এখানকার অনেক অধ্যাপকের ভাবের মিল নাই, আর এখানকার ছাত্রদের পনেরো আনা রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমার ভাবের প্রতি আস্থা রাখে না। তাঁহাদের এই স্বাতন্ত্র্যকে আমি বাধা দিই না, ইহাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়া আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, আপনার মনে আমি কি কোনো আঘাত লাগাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার এরূপ বিরুদ্ধতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম

আপনি লিখিয়াছেন, আমাদের দেশ ও সম্প্রদায়ী বিশ্বমানবের মৈত্রী
এমন কথা আমি কোনোদিন প্রকাশ্যে বা গোপনে আভাসেও প্রকাশ
করি নাই যাহা হইতে আমার চিত্তেরও আভাসিত পারেনা। আপনার
পত্রে ইংরেজ আমাদিগের সম্বন্ধে যে উক্তি আছে তাহাতে সত্যই হয় তাঁহা-
দের সাথে বা ও আমার দেশবাসীদের মিলন থাকিবে। আমি তাহা কাহারো
এবং তাঁহাদের আলোচনায় এক অক্ষর কোনো কোনদিন যোগ দিই নাই।
যদিও একথা স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি যে, ইংরেজ আমাদিগের সম্বন্ধে
ও রাষ্ট্র-সাধনা সম্বন্ধে আপনি যে মত যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার
সঙ্গে আমি মিলি না।

আমাদের দেশে এমন যে কয়জন সাহেবের প্রতি আমার গভীরতম
শ্রদ্ধা রহিয়াছে আপনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই কারণে আমার
প্রতি আপনার এমন অযথা অভিযুক্ত অশ্রদ্ধার উদ্রেকে আমি বিশেষভাবে
ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের এখানে ত্রুটির অভাব নাই, ত্রুটি অনেক
আছে, কিন্তু যথার্থহিতকল্পে আপনি কি তাহার সন্ধান ও যথার্থতত্ত্ব
তাহা নির্দেশ করিয়াছেন? বিশ্বভারতীর সংকল্প মনে লইয়া
ভারতবর্ষে যখন খৃষ্টানদের উপর সহায়তার জন্য সর্বপ্রথমে আপনারই
সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম
আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব। তথাপি
ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সত্যসাধক বলিয়া
শেষ পর্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব। ইতি ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

বিনীত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Recd. Darjiling, 6 June 1922.